মন্বন্তর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি

—সাড়ে চার টাকা—

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৪৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৪৪
তৃতীয় সংস্করণ—মে, ১৯৪৫

১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
লিকাতা হইতে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শীল

প্রকাশিত হ'ল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পটভূমিতে বাঙালীর এ যুগের নতুন
অনুপ্রাণিত ছেলেমেয়ের জীবন নিয়ে বই লিখবার কল্পনা আমার ছিল। কিন্তু
ল্পনা এত শীঘ্র কর্ম্মে রূপান্তরিত হবে এ ভাবি নি। একটি আলোচনা বাসরের
থেকে মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং মন্বন্তর লিখতে আরম্ভ করি। পূজা সংখ্যা
বাজার প্রকাশ করবার জন্য তখন এর রূপ ছিল অন্যরূপ। স্থান সংকুলানের জন্য
প্ত করতে হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশ করবার সময়—যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি
াবে বলবার, উপন্যাসের লম্বিত তালে সুর বাঁধবার চেষ্টা করেছি।

আর একটি কথা বলবার আছে। সেটি মন্বন্তরের ভাষা সম্পর্কিত. এর পূর্বে
আমি পূর্ব্বচলিত সাধু ভাষাতেই লিখে এসেছি; মন্বন্তর লিখেছি চল
এর অর্থ এ নয় যে আমি বর্ত্তমান উপলব্ধিতে চলতি ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ ম
তবে বিষয়বস্তুর বাহন হিসাবে এ ক্ষেত্রে এই ভাষাকেই গ্রহণ করবি
চলতি ভাষায় মন্বন্তর আমার প্রথম রচনা। বহুপূর্ব্বে
অবশ্য চলতি ভাষায় লিখেছিলাম। কিন্তু তাকে ঠিক গ

পরে
আর একটি কথা। সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছুকাল থেকে
গ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আজ পর্য্যন্ত দু'খানি
নের 'নাী মানবী'। ডি-এম লাইব্রেরী তার প্রকা
ায়ই আমাকে বিব্রত করে তুলছে। আমি সাহিত
াকে আমাকে ধরে; অনেক লাইব্রেরীতে
ইগুলির নামও লিখিত রয়েছে। শুনেছি কলকাতা
নামক বইখানি নিয়ে, নামের মানের জন্য আ
গণদেবতার ভূমিকা দেখে তারা তাঁকে আমা-গে
এর জন্য পূর্ব্বে গণদেবতার ভূমিকায় জা
বইয়ের তালিকা এবং 'লাভপুর' 'বীরভূমের
া থেকেই ক পারা উচিত। কি

দৈনিক কাগজে তাঁর বই সমালোচনা করতে গিয়ে আমাকেই ধ'রে সমালোচক কালিন্দীর লেখক নিশ্চয় নূতন experiment করেছেন। এ ছাড়া মাসিক সাপ্তাহিক পত্রে 'লাভপুর' 'বীরভূম' দিয়ে নিজেকে চিহ্নিত করা যায় না। অথচ পূজোর সময়েও প্রবর্ত্তক, দীপালী, চিত্রিতা প্রভৃতি কাগজে তাঁর প্রকাশিত লেখার আমি পেয়েছি। ক্রমশই তাঁর কাছে আমার ঋণের বোঝা বাড়ছে। অনেক নাম বিভ্রাটে তাঁকেও গোলযোগে পড়তে হয় এমন শুনেছি। আমি প্রবর্ত্তক আ (তিনি প্রবর্ত্তকের কর্ম্মী শুনেছি) খোঁজ করেও তাঁর ঠিকানা পাই নি। দেন নি। তাঁর প্রকাশকের কাছেও পূর্ব্বে ঠিকানার জন্য গিয়ে পাইনি। মধ্যে লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু এই বিভ্রাটের নিরসনে কোন একটা চিহ্নের করবেন বলেছিলেন—কিন্তু তাও আজও কাযে পরিণত হয় নি। অগত্যা নি চিহ্নিত করবার ব্যবস্থার জন্য আমি নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বাদ দিলাম। শুধু তার ন্দ্যোপাধ্যায় নামেই আমার রচনা এর পর প্রকাশিত হবে। বইয়ে অবশ্য রভূম এবং বইয়ের তালিকার চিহ্ন অধিকন্তু থাকবেই। আশা করি শ্রী তঃপর শ্রী-যুক্ত হয়েই কীর্ত্তিমান হবেন।

ভূম

(এক)

বংশ শতাব্দীর বিয়াল্লিশ বছর পার হতে চলেছে ; পৃথিবীর কথা না-তোলাই ভাল, এই বাংলাদেশেই কত-না পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। কিন্তু শ বছর আগে চক্রবর্ত্তীরা জীবনদ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে কুস্তীর আ রত পালোয়ানের মত গায়ের ধূলোকাদা ধুয়ে, কানে আতর-মা তুলো গুঁজে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, সেই যে জীবনদ্বন্দ্ব শেষ ক'রে ঘরে পাট বন্ধ ক'রে শুয়েছে—আর বাইরে বের হয় নি। বাইরের হাওয়া রে ঢোকে নি, ওরাও বেরিয়ে সে হাওয়া গায়ে লাগায় নি। ফলে মাজ ওরা সেই মধ্যযুগের মানুষ। কুস্তীর চর্চ্চার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সে গ ক'রে শুধু বাদামের শরবত খেলে—হয় ডিসপেপসিয়া ধরে— ড়ি বাড়ে ; দুটো রোগই সমান মারাত্মক, শক্তির যারা চর্চ্চা করে পক্ষে। তেমনি ধনীর পক্ষেও মারাত্মক—ধনার্জ্জনের স কর্ম্ম গ ক'রে—সম্পদ সম্ভোগ ধর্ম্ম। এতে শুধু দোনলা চৌবাচ্চা জল গনের নল বন্ধ ক'রে নিগমের নলটা খুলে দেওয়ার বিপরীত ফলের ই শুধু ফলই শূন্য দাঁড়ায় না—চৌবাচ্চাটাতেও ফাট ধরে সেখানে বাসা ধে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থেকে বিছে সাপ পর্য্যন্ত, এবং শূন্য চৌব চাটার সর্ব্বাঙ্গ ধূলোর সঙ্গে নানা বীজাণুতেও অনুলিপ্ত হ'য়ে থাকে।

ময় চক্রবর্ত্তী সেকালে কর্ম্মশক্তিতে পালোয়ান ছিলেন। কলকাতা ভূত পঞ্চাশ বিঘে জমির ওপর বস্তী গ'ড়ে ভাড়াটে প্রজার রাজত্ব রেছিলেন, রামবাগান সোনাগাছি অঞ্চলে ভাড়াটে বাড়ীও

করেছিলেন পনেরোখানা : কাঠা দশেক জায়গার ওপর প্রকাণ্ড দোমহলা বাড়ী, এবং ব্যাঙ্কে লক্ষ কয়েক টাকা নিয়ে জীবনে তিনিই একদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে নবনির্ম্মিত বৈঠকখানায় আমিরী চালে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন—ব্যাস্ করো।

এর পরও তিনি অবশ্য ঘরের মধ্যেই দুচারটে ডন-বৈঠকের মত জুড়ি হাঁকিয়ে মিটিংয়ে যেতেন, মজলিসে যেতেন, দেশহিতকর কর্ম্মে চাঁদা দিতেন, গঙ্গায় ময়ূরপঙ্খি চড়তেন ; কিন্তু ছেলেরা তাও বর্জ্জন ক'রে কেবলই খেতে আরম্ভ করলে বাদামের শরবত। চক্রবর্ত্তী বংশ-রূপ প্[illegible]য়ানটির এই দ্বিতীয় পুরুষে প্রায় সর্ব্বদ্বন্দ্বতিরোহিত অবস্থা। [illegible]দেন' তাকে আত্মঘাতী বলা যেতে পারে : তিন ভাই-ই স্ত্রীকে [illegible]শাসন করত, তাস পাশা খেলত, রেসে যেত, মদ্যপান বাইরের বাড়ীতে নিয়মিত বাইজী আনত, আজ ঘোড়া কিনে বেচে পরদিন আবার নতুন কিনত। অন্দরের অবস্থাও ছিল অ[illegible] মেয়েরা গয়না ভেঙে গয়না গড়াত, আজকের শাড়ী ব[illegible] বাতিল ক'রে নতুন কিনত, আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী গিয়ে [illegible] [illegible]য়ে আসত, শনি-রবিবারে থিয়েটার দেখত, বাকী [illegible] প্রত্য[illegible], রাত্রি জেগে বসে ঢুলত। মধ্যে মধ্যে নূতনত্ব [illegible]দের আসত বৈকি ! আসত সন্তান-শোক। সুতিকাগৃহেই এ[illegible] সন্তানগুলির অধিকাংশই মারা যেত এবং এখনও যায়। তখন [illegible] দু-চার দিনের জন্য কাঁদত। দুঃখের মধ্যেই তখন অনুভব করত অতি গোপন আরাম। চক্রবর্ত্তী-বংশের সন্তানদের অবশ্য ভাল ; তাদের মুক্তি সুতিকাগৃহেই হয়। যাদের ভাগ্য মন্দ/[illegible] ক্রমে যারা বাঁচে, তাদের নিজেদের এবং তাদের পরি[illegible] মায়েদের জীবনের দুঃখ হয়ে উঠত এবং ওঠে দুর্ব্বিষহ [illegible] কুঞ্চিতলোলচর্ম্ম শিশু অহরহ শ্বাস টানে হাঁপানির রো[illegible]

থাকে মুখের দিকে চেয়ে, একটা দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, চক্রবর্ত্তী বংশের রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ওরই মধ্যে।

রোগ আজ এই বংশটির সর্ব্বদেহে সুপ্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাদামের শরবত হজম করবার সামর্থ্যও আজ চক্রবর্ত্তীদের নেই, বাদামও ফুরিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার আর অবশিষ্ট কিছুই নেই, পঞ্চাশ বিঘে বস্তী জমির ওপর বহু জনের পাকা বাড়ী উঠেছে, রামবাগান সোনাগাছির বাড়ীর মালিকানি অনেক দিন গেছে, দশ কাঠার ওপর পাকা দোমহলা বাড়ীটায় অন্তত পঁচিশটে বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে,—বৎসরে বৎসরে তাদের কাটা হয়—কিন্তু আবার গজায়, অর্থাৎ কাণ্ডে বৃহৎ না হ'লেও তাদের মূল-জাল বাড়ীটার পাঁজরায় পাঁজরায় বিস্তৃতি লাভ করেছে; ঝড়ের বেগে বাতাস বইলে গভীর রাত্রে মনে হয়—কারা যেন শিস্ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় পুরুষে—চক্রবর্ত্তীরা তিন ভাই, সুখময় চক্রবর্ত্তীর তিন ছেলে। তিনজনের মধ্যে মেজভাই মাত্র জীবিত। মেজবাবুর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি—এককালে রূপবান পুরুষ ছিলেন, এখন তাঁর মুখের এক দিকে প্যারালিসিস—দাঁত অনেকদিন প'ড়ে গেছে, দেহটা ব'সে-যাওয়া বাড়ীর মত বিকৃত হ'য়ে গেছে কোন রোগে, আজও তিনি বেঁচে আছেন। সে-আমলে থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন—বক্তৃতার ঢঙে কথা বলেন; হাতে একগোছা মাদুলী—নীলা-পলা-গোমেধ-লোহা-তামা। অহরহ দেবতাকে ডাকেন, কোন্ অপরাধ করলাম দেবাদিদেব, আশুতোষ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাল দেন—অধর্ম্মে পাপে ছেয়ে গেছে সব। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন—আসছেন, সমস্ত ধ্বংস করবার জন্যে তিনি আসছেন। ভগবান নিজে বলেছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। এখন নিত্যনিয়মিত একখানা

বহু পুরানো রেশমের নামাবলী গায়ে দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন; গী পড়েন, চণ্ডী পড়েন; সপ্তাহে একদিন ক'রে পুরোহিতের মুখে শো —আপদুদ্ধার মন্ত্র। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হ' অথবা দুরন্ত গরমে বাতাস না পেয়ে ষাট বছর বয়স্ক স্ত্রীকে কোন পাখার বাড়ি মারেন—কোনদিন ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের ক' দেন। ষাট বছরের মেজগিন্নীর কাছে এ এতটুকু অন্যায়ও নয়— অপমা নয়, অচঞ্চল মানসিকতার মধ্যেই বাতরোগাক্রান্ত পায়ে খোঁড়া খোঁড়াতে তিনি বিস্তীর্ণ বাড়ীটার একটা কোণ খুঁজে নিয়ে শুয়ে পড়ে ভোরে উঠে বিকৃত উচ্চারণে দেবতার স্তব আবৃত্তি করেন—যার তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, তবু তার মধ্যে আছে একটি আকুতি—সে আকুতি মূল প্রেরণা প্রার্থনা—ভগবান, মঙ্গল কর, অভাব ঘুচিয়ে দাও। তার আরম্ভ করেন স্বামীর সেবা। গরম জল, মাজন, জিভ-ছোলা, ওষু শিশি, আফিংয়ের কৌটো সাজিয়ে রাখেন; চা করেন; স্নানের স প্রায়-উলঙ্গ স্বামীকে তেল মাখিয়ে দেন। মেজবাবু খেয়ে-দেয়ে বেরি যান কাজে, তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন। মেজবাবু আগে নিজে গা কিনতেন, এখন কে গাড়ী কিনবে তারই খোঁজ ক'রে ফেরেন; গাড় দালালী করেন মেজবাবু। সে আমলের আর আছেন বিধবা ছোটগিন্নী মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত, জীবনে শুধু আপনাকে কেন্দ্র ক' তাঁর ঘোরা-ফেরা।

দ্বিতীয় পুরুষের তিন ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি—সাতটি ছেলে, চা মেয়ে। দ্বিতীয় পুরুষের মেজবাবুর অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই তৃতী পুরুষের কালই এখন চলেছে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে। ছেলেদে বউ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়েই এখন বর্ত্তমান সংসার বর্ত্তমানের রূপ অতীতের চেয়েও গতিহীন—দ্বন্দ্বহীন; বংশের প্রৌঢ় তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণ হ'য়ে চতুর্থ পুরুষে বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা ক্রমশ রূ

পরিগ্রহ করছে। তৃতীয় পুরুষের সাত ভাই ও চার বোনের মধ্যে পাঁচজন পাগল; বাকী কয়েকজনের জীবনের গতি—পাওনাদারের ভয়ে—খিড়কীর পথে, আঁকাবাঁকা গলির মধ্য দিয়ে সরীসৃপের মত; দিনে তাদের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না, প্রতিশোধে সন্ধ্যার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বাধে। আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের পৃথিবীর সকল ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে—অপূর্ব্ব শক্তি এবং গুণসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করবার জন্য নিষ্করুণ শাসনের এতটুকু শিথিলতা নেই। আদরেরও সীমা নেই। ফলে একটি আঠারো বৎসরের যুবা কোন রকমে শিশু হয়ে বেঁচে আছে। একটি এগারো বছরের মেয়ে ফাঁক পেলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়—আমায় একটা পয়সা দিন না! আমার বাবার বড় অসুখ! ফেরে সে রাত্রি দশটায়; সমস্ত পাড়াটা তার উচ্চকণ্ঠের গান শুনে জানতে পারে—দশটা বাজল।

এরই মধ্যে কেমন ক'রে যে বড়ছেলের বড়ছেলে সবল সহজ হয়ে উঠেছে, সে কথা এক রহস্য। এম্ এস্-সি পড়ছে। নিয়মিত কলেজে যায়, একবেলা প্রাইভেট ট্যুইশনি করে—পৃথিবীর বুকে গতি তার অসঙ্কুচিত। শুধু বাড়ীর মধ্যে এলেই সে কেমন বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে ওঠে। ভয় হয়, বাড়ীটার সংক্রামকতা তাকে আক্রমণ করবে। তাই সে অধিকাংশ সময় বাইরে কাটায়। রাত্রে মেজবাবুর চীৎকার শুনে, নিদ্রাহীন পাগলদের অশ্রান্ত পদধ্বনি শুনে—বিছানায় শুয়ে সে কাঁদে। এ থেকে তারও যে পরিত্রাণ নেই। তার রক্তের মধ্যেও যে সে বিষ আছে। ওই উন্মাদ রোগ, বধিরতা ব্যাধি, এ বংশের শিশুমৃত্যু, ভাগ্যক্রমে জীবিত শিশুদের গায়ের চামড়ার কুঞ্চিত শিথিলতা, নিশ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দে যে রোগের বিষের অভিব্যক্তি—সে বিষ যে তার রক্তেও আছে! তার পিতৃবন্ধু ডাক্তারটির কথা যে সে কিছুতেই ভুলতে

পারে না। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, কেন সে এ বংশের মধ্যে এমন ব্যতিক্রম হ'ল? না হ'লে ওই স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত, ভয় অনুশোচনা কোনটাই তাকে এমন পীড়িত করতে পারত না! আবার পরক্ষণেই ভাবে—মানুষের মধ্যে মন্দের চেয়ে যে ভাল বেশী—তাই এ বংশের অর্জ্জিত সকল মন্দ সকল বিষকে অতিক্রম ক'রে সে এমন হয়েছে। সমস্ত সংসারটির উপর মমতায় তার মন ভরে ওঠে। বাপ-খুড়ো, মা-খুড়ী, ভাই-বোনদের দিকে সে প্রসন্ন প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। এ যেন রূপের হাট; তাদের বংশের মত এমন রূপ, এত রূপ, সত্যিই বিরল। এদের সবার ভার তার উপর। এই কথাটা তার বেশী ক'রে মনে হয়, যখন মায়ের সঙ্গে একান্তে ব'সে সে কথা কয়। সোনার মূর্ত্তির মত রূপ তার মায়ের। হাতে দুগাছি শাঁখা ছাড়া কোন আভরণ নেই। পরণে পুরানো মূল্যবান শাড়ী, জীর্ণ হয়েছে—তবু অতি-নিপুণ যত্নে নিখুঁত রেখে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কানাই অবশ্য আশ্চর্য্য হয় না, কারণ তার মায়ের শৈশব ও বাল্যকালের শিক্ষার কথাটাই তার কাছে বড় কথা, তার জীবনের সকল পরিচয়ের মধ্যে ওইটিই একমাত্র গৌরবের বিষয়; তার মা গরীবের ঘরের মেয়ে; কোন কালে কোন পুরুষে কেউ ধনী ছিল না। আজও তাদের বাড়ীর মধ্যে তার ঠাকুমা—অর্থাৎ মেজগিন্নী ছোটগিন্নী থেকে আরম্ভ ক'রে তার খুড়ীমা সম্প্রদায় তাঁর মিতব্যয়িতার নিষ্ঠা ও মাত্রা দেখে গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিত্তহীন বংশের সঙ্কুচিত এবং লুব্ধচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। কানাই ব্যঙ্গভরে হাসে; পৃথিবীতে খেতে যারা পায় না, তাদের খাবার আকাঙ্ক্ষা, এমন কি লোভও অপরাধ নয়, কারণ সে আকাঙ্ক্ষা তো তাদের ক্ষুধার দাবী! সে দাবী অতিমাত্রায় ব্যগ্র এবং ভীরু, এই পর্য্যন্ত। অসমর্থ দাবী মানুষ উপেক্ষা করে এও

হয়, কিন্তু ঘৃণা ক'রে ব্যঙ্গ করে কি ব'লে? অথচ তোমরা যারা ব্যঙ্গ করছ—তোমাদের যে খেয়ে আশ মেটে না! আয়োজনের প্রাচুর্য্যে তোমাদের আহার্য্য যে পুষ্টির প্রয়োজনকে তুচ্ছ ক'রে, অস্বীকার ক'রে—একমাত্র আস্বাদের বিলাসবস্তুতে পরিণত হয়েছে! তোমরা যে বহু এবং প্রচুর আয়োজনের একটু একটু চেখে বাকীটা ফেলে দিয়ে অপচয়ের দম্ভকে নিরাসক্তি ব'লে জাহির কর—সে যে অমার্জ্জনীয়। শুধু অমার্জ্জনীয় নয়, ভোজনবিলাসের ফলে দেহের পেশীকে মেদে পরিণত ক'রে যে হাস্যকর রূপ তোমাদের হয়—সে যে কত কুৎসিত, কত ঘৃণার্হ, সে কি আয়নায় দেখেও তোমাদের উপলব্ধি হয় না? তার মায়ের দাবীর ভীরুতায় সে লজ্জা পায় না এমন নয়, তবে তার মা তাঁর বংশধারা থেকে কোন বিষ তার রক্তে সঞ্চারিত ক'রে দেন নি, এইটেই তার কাছে মায়ের সবচেয়ে বড় দাবী। ঘৃণা করে সে মাতামহকে। রত্নগর্ভ ব'লে সমুদ্রের লোনা জলের মধ্যে তিনি বিসর্জ্জন দিয়ে গেছেন সোনার প্রতিমা।

আরও একজনকে সে ভক্তি করে—তাঁর জন্যে রূপনারায়ণের চোখে জল আসে। সে তার প্রপিতামহী, ওই মেজকর্ত্তার মা, এ বংশের প্রথম ধনী স্বনামধন্য সুখময় চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। নব্বুই বৎসর বয়স—অন্ধ, বধির, একতাল জীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত আজও প'ড়ে আছেন; ওই মেজকর্ত্তাই তাঁর নাম দিয়েছে 'নিকষা'—রাবণের মা নিকষা। সমস্ত বংশটাকে বিলুপ্ত হ'তে না দেখে ও যাবে না। অন্তত মেজকর্ত্তা প্রতিটি প্রভাতে মাকে জীবিত দেখে—নিজের আশে-পাশে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পান—তাঁর মনের ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় যে, অন্তত আরও একটি সন্তান-শোকের প্রতীক্ষাতেই—নিকষার মৃত্যু হচ্ছে না। বৃদ্ধার নামে সুখময় চক্রবর্ত্তী সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, মেজকর্ত্তা জীবিত থাকতে বৃদ্ধা মরলে সে সম্পত্তি একমাত্র জীবিত পুত্র হিসেবে তিনিই

একক পাবেন। এইজন্য মেজকর্ত্তার অধীরতার মাত্রা দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে চলেছে।

বাড়ীর অপর সকলে কামনা করে মেজকর্ত্তার মৃত্যু,—মেজকর্ত্তার একমাত্র পুত্র মণিলাল চক্রবর্ত্তী, কানাইয়ের মণিকাকা পর্য্যন্ত। কারণ, মেজকর্ত্তার মৃত্যু হ'লে যেটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে—অন্তত সেইটুকুই সদ্য তার হাতে আসে। তাছাড়া মেজকর্ত্তা যদি মায়ের পরমায়ু পান—তবে……। সে-কথা ভেবে মনে মনে মণিলাল এমন বিরক্ত হয়ে ওঠে যে, সেদিন মণিলালের ছেলেগুলির দুর্ভোগের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। নিজের ইচ্ছে হয় মাথা ঠুকতে, কিন্তু মাথা ঠোকায় অবশ্যম্ভাবী বেদনাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য মাথা ঠুকতে পারে না মণিলাল; না পেরে, ছেলেদের চীৎকারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাদেরই মাথাগুলো দেওয়ালে ঠুকে দেয়।

মেজকর্ত্তা এ শাসনে খুশী হয়ে ঘর থেকেই বলেন—ঠিক হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে। ছত্রিশ কোটি যদুবংশ, শয়তানের দল, এ না হ'লে সায়েস্তা হবার নয়।

ভোরবেলায় উঠে কানাই দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের মহলটার খোলা ছাদে। এই খোলা ছাদটা এককালে এ-বাড়ীর বিলাস-মজলিসের স্থান ছিল। কাজে-কর্ম্মে এই ছাদটার ওপর হোগলার মেরাপ বেঁধে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হ'ত। এখন ছাদটায় ফাট ধরেছে, স্থানে স্থানে খোয়া উঠে গর্ত্তও হয়েছে; পাশের আলসের পলেস্তারা অধিকাংশই খ'সে গেছে। ছাদটার দক্ষিণ দিকে তেতলা অন্দর-মহল, অন্দরের বারান্দার ঝিলিমিলিগুলো ভেঙেছে, কয়েকটা দরজা-জানালার কব্জা খসেছে; একেবারে পশ্চিম দিকে তিনটে তলার তিন থাক বাথরুম। ছাদের উপর ময়লা জলের প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কটা জীর্ণ, পাইপগুলোও রঙের অভাবে মরচে ধ'রে মধ্যে মধ্যে জীর্ণ

হয়ে গেছে। ট্যাঙ্কটার পাশেই একটি সতেজ বটের চারা প্রায় তিন ফিট লম্বা হ'য়ে উঠেছে, তার মূল শিকড়টা প্রবেশ করেছে একটা ফাটলের মধ্যে, এবং দশ-বারোটা সরু লম্বা শিকড় ঝুলে দুরন্তবৃদ্ধিতে বেড়ে চলছে মাটির মুখে ; সকালের বাতাসে সেগুলি দুলছিল একগুচ্ছ নাগপাশের মত। কানাই এবং তার মা ছাড়া বাড়ীর আর কেউ এখনও ওঠে নি, বাইরের মহলের একতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেখানে থাকে দু'জন ট্রাম-কণ্ডাক্টর, জনকয়েক খবরের কাগজের হকার। তারা সব এর মধ্যেই বেরিয়ে চ'লে গেছে। তার মা অন্দর মহলে নিজেদের অংশটায় ঝিয়ের কাজ করছেন। অন্য অংশীদারদের এখনও ঝি না হ'লে চলে না, তাদের ঝি নিত্যনূতন, আজ আসে কাল মাইনে চাইলে কালই কোন [illegible] মত ঝগড়া ক'রে তাকে গলায় ধ'রে বাড়ী থেকে বের ক'রে দে দেয়— আবার নূতন আসে। ঝিগুলি অবশ্য উঠেছে। তাদের তা[illegible]মোফোনে গেছে কলের জলের জন্য। নীচে কলতলায় কুঁজো ডা ধরা[illegible] তারা ভাবী দিনমানটা উপভোগের জন্য কলহের ভূমিকা রাশেষ ক'রে উপরে দোতলা তেতলার ছাদের কিনারায় সারিবন্দি ব'সে[illegible]ই। ফিরছে, উড়ছে বসছে একপাল পায়রা। পূর্ব্বকালে ওদের পূর্ব্বপুরুষের ছিল শখের সামগ্রী—নানা অভিজাত সম্প্রদায়ের খাঁটি চেহারা এবং খাটি রক্ত নিয়ে তারা এসেছিল এ বাড়ীর মালিকদের অনেক টাকার বিনিময়ে; আজ তারা বন্য এবং অবাধ সংমিশ্রণের ফলে এক অভিনব বিচিত্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। মালিকের সঙ্গে সম্বন্ধ এখন অতি ক্ষীণ; আপনাদের আহার তারা এখন প্রায় আপনারাই সংগ্রহ করে; তবে ছোট ছেলেদের হাতে খাবার বাটী দেখলে ওদের মধ্যে পুরানো অসমসাহসীরা ঝাঁপ দিয়ে এসে মাথায় কাঁধে ব'সে খাবার কেড়ে খায়, আহার্য্যের মধ্যে কোন দানা-সামগ্রী রৌদ্রে দিলে তার ওপরেও অভিযান করে; চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মাংসলোলুপ ছেলেমেয়েরাও রাত্রে

চেয়ারের উপর টুল রেখে তার ওপর চেপে বাসা থেকে দু-একটা পেড়ে নিয়ে ঝোল রান্না ক'রে থাকে। মেজকর্ত্তা এখনও দিনে মুঠো দুই ক্ষুদ ছড়িয়ে দিয়ে ওদের খাইয়ে থাকেন। তারা ঝগড়া করলে তিরস্কার করেন—কঠিন তিরস্কার! কেউ কারও কেড়ে খেলে—যে কেড়ে খায়, তাকে কঠিনস্বরে বলেন,—ইউ শূয়ারকি বাচ্চা! হত্যা করা পায়রার পালক্ দেখে তিনি প্রশ্ন করলে অপরাধ বেড়ালের উপর চাপানো হয়, তিনি বেড়ালকে গালি-গালাজ করতে করতে কানে সুড়সুড়ি দেবার উপযুক্ত ভাল পালকগুলি সংগ্রহ ক'রে সযত্নে রেখে দেন ভাঙা ড্রয়ারে।

অবশ্যভাড়ীর পশ্চিম দিকে একটা বস্তী। নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা মণিলাল; হয়ে এখন আসলে দরিদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ দেওয়ালে টুলনের রীতি-নীতি. গ্রহণ করতে লজ্জা অনুভব করে এবং দেহে মেজকর্ত্তাত হয়—তাদেরই বস্তী। খোলার বাড়ী, টিনের বাড়ী হচ্ছে। ছলি প্রকার বঞ্চনা এবং অসুবিধা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। তবু তারা হবার নধ্যে ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে জীবন যাপন করে। কলহ-কচকচিতে তারা বিরক্ত হয়, প্রায় চারিদিকে—দরজায়, জানালায় জীর্ণ পর্দ্দা টাঙায়; দোতলা কোঠাগুলির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় চট অথবা পুরানো ছেঁড়া চিকের আড়াল দিয়ে ঘিরে রাখে। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে বাড়ীতে পর্দ্দাগুলি জীর্ণ নয়, অতিমাত্রায় বাহারে রঙের সতেজ ঝকমকানিতে সেটা বোঝা যায়; ওই বাড়ীগুলিতে অন্তবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়, লম্বা দড়ির আলনায় ঝুলে থাকে শুকুতে-দেওয়া অপকৃষ্ট রুচির রঙ-বেরঙের শাড়ী শেমিজ, সায়া ব্লাউজ, কামিজ, ফ্রক প্রভৃতি। ওই বস্তীটার যত কিছু গোলমাল হৈ-হৈ সব ওই বাড়ী ক'টি থেকেই উত্থিত হয়। ওরা পূর্ব্বে ছিল দরিদ্র, এখনও কর্ম্মজীবনে শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত, কিন্তু ধীরে ধীরে ওরা নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীতে অভিযান আরম্ভ করেছে।

ওদের বাড়ী হতেই সিগারেটের গন্ধ উঠে ছোট পাড়াটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইল্‌সে মাছ এবং মাংস রান্নার গন্ধ ওঠে, রাত্রি দশটা এগারটার সময় পুরুষদের মত্ত কণ্ঠের আস্ফালন শোনা যায়। ভোরবেলাতেই ওদের বাড়ীর পুরুষগুলি হাফপ্যাণ্ট, খাকী কামিজ, নূতন ফ্যাশানের মাত্র গোড়ালি ঢাকা মোজা প'রে খাবারের কৌটো হাতে কারখানায় ছুটছে। কেউ সাইকেলে—কেউ হেঁটে। ওদের বাড়ীতে জীবনযাত্রা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে, এবং শুরু হয়েছে নিম্নরুচির নৃত্যগীতমুখর ছায়াচিত্রের ঢঙে ও তালে। ওদের বাড়ীর কতকগুলি ছেলে-মেয়ে এরই মধ্যে সিনেমার গান শুরু ক'রে দিয়েছে—"এই কি গো শেষ দান", "আমি বনফুল গো"। তারস্বরে কোরাস্ গান। শুধু কোরাসেই নয়, ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত এবাড়ীতে আরম্ভ হ'লেই অমনই ও-বাড়ীতেও আর একজন ধ'রে দেয়—"এই কি গো শেষ দান ?" একটা বাড়ীতে একটা পুরানো গ্রামোফোনে গান শুরু হয়ে গেছে। বিকৃত সাউণ্ড-বক্সের মধ্যে মনে হয় ভাঙা ধরা-গলা কোন গায়কের গান। এই গান চলবে প্রায় সারা দিন, বিশেষ ক'রে ও-পাশের নতুন বাড়ীটায় রেডিও যতক্ষণ চলবে—ততক্ষণ তো চলবেই। সম্পদের প্রতিযোগিতার ঐ এক অভিনব বিকাশ।

অন্য বাড়ীগুলি বিত্তহীনতার দৈন্যে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত। মানুষগুলি মনের বিষণ্ণতা, দেহের অবসন্নতা সম্ভ্রমপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের ছদ্মবেশের আবরণে ঢেকে প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষেরা জেগেছে অনেকক্ষণ; চিক ও পর্দ্দার আড়ালে ঘুরছে ফিরছে—ধীর অর্থাৎ ক্লান্ত দুর্ব্বল পাদক্ষেপে। একটা বাড়ীতে একটি শীর্ণ শিশু অশান্ত স্বরে প্রাণফাটানো চীৎকারে কেঁদেই চলেছে। বাড়ীগুলোতে বাসনের শব্দ উঠছে, তাও অত্যন্ত মৃদু। একটি দোতলার বারান্দায় একজন ভদ্রলোক লুঙ্গি প'রে খালি গায়ে বিড়ি টানছে। অনাবৃত উঠানে যে মেয়েগুলি কাজকর্ম্ম করছে তাদের অধিকাংশ শীর্ণ, রূপ এবং শ্রী এককালে ছিল—কিন্তু এখন বিশীর্ণ

পাণ্ডুরতায় সে রূপশ্রী অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ। এমনি একটি বাড়ীর একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে অত্যন্ত শান্ত পদবিক্ষেপে মাটির দিকে চোখ চেয়ে একটি ছোট্ট ডালি হাতে বেরিয়ে এল রাস্তায়; সে যাবে পুজোর ফুল তুলতে অদূরের বাগানওয়ালা বাড়ীতে। মেয়েটি দেখতে কালো, মাথায় খাটো, পরণে ময়লা ব্লাউজ, ময়লা শাড়ী। কালো হ'লেও মুখশ্রীটি বেশ, সবচেয়ে ভাল মেয়েটির চুল—ঘন কালো একপিঠ চুল—একরাশ বললেই যেন ঠিক বলা হয়। কানাই ওকে ভাল ক'রেই চেনে; অনেক দিন থেকেই ওরা এখানে আছে। কানাইয়ের বোন উমার খেলার সঙ্গিনী, এখন সখী, প্রায়ই তাদের বাড়ীতে আসে; বড় ভাল মেয়ে, মেয়েটির নাম গীতা। সে সস্নেহে ডাকলে—ফুল তুলতে যাচ্ছ?

গীতা সলজ্জভাবে মুখ তুলে শুধু একটু হাসলে।

আকাশের কোন্ কোণে এরোপ্লেনের শব্দ উঠছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে। শব্দ শুনে দিক ঠিক ঠাওর করা যায় না। অনেক সময় যেদিকে শব্দ ওঠে, ঠিক তার বিপরীত দিকে হয়তো প্লেন ওড়ে। কানাই আকাশের দিকে তাকাল; চারিদিক সন্ধান ক'রেও আকাশচারী যন্ত্র-শ্যেনকে দেখা গেল না। মুখ নামিয়ে কানাই দেখলে গীতা তখনও তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে—এরোপ্লেনটা দেখা গেল না। ব'লেই সে নতমুখে আবার চলতে আরম্ভ করলে।

মা এসে দাঁড়ালেন ভিতর মহলের দরজার মুখে—কানু, চা হয়েছে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বললে—যাই।

চা খেয়েই সে ছাত্র পড়াতে বের হবে।

মা চ'লে গেলেন না, কানাইয়ের অতি নিকটে এসে মৃদুস্বরে বললেন—মাইনের টাকাটা কি ওঁরা এখন দেবেন না?

কানাই এবার ফিরে চাইলে মায়ের দিকে; মা মাথা নীচু ক'রে বললেন—ভাঁড়ারের জিনিস সব ফুরিয়েছে বাবা।

(দুই)

রাস্তায় চিনির আর কেরোসিনের কণ্ট্রোলের দোকানে এরই মধ্যে সারিবন্দী লোক দাঁড়িয়ে গেছে। বাজারে এখন চিনি এবং কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে; জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিনি আসা বন্ধ হয়েছে। ব্রহ্মদেশ জাপানীদের হাতে, ওখানকার কেরোসিনের উৎসমুখ এদেশের পক্ষে বন্ধ। ময়দাও অমিল হয়ে আসছে। রোজ দাম বেড়ে চলেছে দু আনা থেকে তিন আনা—তিন আনা থেকে চার—পাঁচ—ছয়, প্রায় লাফে-লাফে। কাপড়ের বাজার আগুনের মত উত্তপ্ত। পূজোর আগেই ধুতি পৌঁছেছিল ছ টাকায়—শাড়ী সাত টাকায়; তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বরের বাজার-দর ঠিক কানাই জানে না, তবে আট এবং নয়ের কম নয়, এ কথা নিশ্চিত। এবার জানতে হয়েছে। পূজোর সময় নিজের জামাকাপড় কেনা হয় নি। মায়ের, এবং তাঁর মুখ চেয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ভাইবোনদের কাপড় কিনতেই ট্যুইশনির দু মাসের জমানো টাকা ফুরিয়ে গেছে। বাপ চেয়েছিলেন দুটো গেঞ্জি, বলেছিলেন—দিবি তো ভাল দিস্। কম দামী আনিস নে যেন। সাধারণ জিনিস আজও তাঁর পছন্দ হয় না। পূর্ব্বের অপচয়ের মধ্যে থেকে যেগুলো কোনক্রমে সঞ্চয়ের মধ্যে জমা ছিল, আজকাল তাঁর তাই ভেঙে চলছে। এই ব্যয়ের জন্য তার আপসোস হয়, ক্ষোভ হয়; কিন্তু যখন রঙীন সাজ-পোশাকপরা ভাইবোনগুলির ছবি মনে পড়ে, তখন মন সান্ত্বনায় ভ'রে ওঠে। সুন্দর ভাইবোনগুলি আরও কত সুন্দর হয়ে উঠেছিল! চক্রবর্ত্তী-বংশ আজ সকল সম্পদে দেউলে হ'য়ে এসেছে, কিন্তু অর্থ-কৌলীন্যের

সম্মানের দাবীতে এবং শক্তিতে স্বজাতীয়া কুমারীকুল থেকে ফুল বাছাই ক'রে পদ্ম ফুল সংগ্রহ করার মত বাছাই ক'রে বাড়ীতে এনেছিলেন—শ্রেষ্ঠ রূপ। বিজ্ঞানসম্মত জীববিদ্যার বংশগতি-বিধান-বিজ্ঞানে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও, সে বিজ্ঞানের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নি; এ বংশের ছেলেমেয়েরা জন্মায় শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মত রূপ নিয়ে। তাই, বিশেষ ক'রে অপরূপ রূপবতী বোনগুলির দিকে তাকিয়ে সময়ে সময়ে কানাইয়ের চোখে জল আসে। ওই রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে রক্তধারার মধ্যে বংশগত বিষ জীর্ণ ঘরে সাপের মত বাসা বেঁধে রয়েছে। তার বিষ নিশ্বাসে নিশ্বাসে একদা শোণিতকণার সকল সুস্থ পবিত্র শক্তিকে জর্জ্জর ক'রে তুলবে। ওই অপরূপ রূপ-লাবণ্য এবং সুস্থ পবিত্র স্নায়ু শোণিতের সমন্বয়ে ওরা মর্ত্ত্যে স্বর্গ রচনা করতে পারত, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠীকে বিষাক্ত ক'রে তুলবে।

পাশেই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা এক প্রাসাদতুল্য বাড়ী—প্রাচীন এবং জীর্ণ। কয়েক পুরুষের মধ্যে বাড়ীটা বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে; কয়েকজনের ভাগে আজ মারোয়াড়ী এসে বাসা বেঁধেছে। যারা আছে—তাদেরও অবস্থা ওই চক্রবর্ত্তীদের বংশের মত। ওদেরও রক্তধারায় হয়তো বিষ আছে। পৃথিবীর প্রকাণ্ড বাড়ীগুলোর মধ্যে ওই একই নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে।

কম্পাউণ্ডের সামনের দিকে—রাস্তার গায়েই একটি এ-এফ-এস্-এর আড্ডা হয়েছে। নীলরঙের ইউনিফর্ম প'রে, লম্বা হোস-পাইপের বোঝা নিয়ে ওরা মহড়া দিচ্ছে। এ রাস্তাটা যেখানে গিয়ে কলকাতার অন্যতম প্রধান রাস্তায় পড়েছে, সেখানে সারিবন্দী চলেছে মিলিটারী লরী; খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় লাল টুপি, হাতে লাল অক্ষরে এম-পি লেখা কালো ব্যাজ বেঁধে মিলিটারী পুলিস—ট্রাফিক বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ এবং হলুদে রঙে চিত্র-বিচিত্র করা নানা আকারের লরী;

তার মধ্যে বহু রকমের সাজসরঞ্জাম ; জ্বালানি কাঠ থেকে মেসিনগান, হাল্কা আকারের দু'চারখানা ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত। ওরই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে চ'লে গেল আর-এ-এফ-এর একখানা প্রকাণ্ড এবং অতি সুদৃশ্য বাস্। পাশ দিয়ে দুরন্ত গতিতে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে মোটর-বাইকে দৌত্য বহন ক'রে চলেছে—মাথায় লোহার বাটির মত হেল্‌মেট, চোখে গগল্‌সের স্থলাভিষিক্ত গাটাপার্চার চক্ষু-আবরণী। মাথার ওপর অতি প্রচণ্ড শব্দ ক'রে উড়ে গেল চারটে ভি-এর আকারে এক ঝাঁক এরোপ্লেন। মিলিটারী লরীগুলোর সারির মধ্য দিয়েই কৌশলে কোন রকমে পথ ক'রে এসে পৌঁছল দুখানা শহরতলীর বাস্—আকণ্ঠ বোঝাই যাত্রী। পিছনের বাম্পারে দাঁড়িয়ে ছিল জনপাঁচেক ইউরোপীয় সৈনিক। বাস্ থামতেই তারা লাফিয়ে নামল। গাড়ীর ভেতর থেকে যাত্রীর ঝাঁকের মধ্য থেকে নামল জন কয়েক। ভারতীয় সৈনিকও জন কতক ছিল।

অকস্মাৎ একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রচণ্ড শক্তিতে আদেশের ভঙ্গিতে কে চীৎকার ক'রে উঠল—এ-ই রো—খ্-খো!

সঙ্গে সঙ্গে জনতার 'গেল' 'গেল' শব্দ।

চকিতে চোখ ফিরিয়ে কানাই দেখলে—মিলিটারী লরীগুলোর গতি স্তব্ধ হ'য়ে আসছে। ও-দিকের চৌমাথার এক কোণে এক কৌপিনধারী আপনার সবল বীভৎসমূর্ত্তি দেহখানাকে টান ক'রে পিছনের দিকে ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার যে অভিব্যক্তি তাতে মনে হয়, সে-ই যেন এই বিরাট সারিবদ্ধ যন্ত্রযানগুলোর গতিশক্তি রুদ্ধ ক'রে ক'যে ব্রেক ধ'রে দাঁড়িয়েছে প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে। এ পাড়ার জগা-পাগলা, বদ্ধ উন্মাদ, পথে পথে ফেরে, ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায়। হঠাৎ জগার এ বীরত্ব কেন? পরমুহূর্ত্তেই জগা ছুটে গেল স্তব্ধ লরীর সারির প্রথমখানার সম্মুখে। তারপরই সে মাটি থেকে টেনে তুলে কাঁধের ওপর ফেললে একটা ছেলের রক্তাক্ত আহত দেহ। লরী চাপা

পড়েছে। জগাকে অনুসরণ ক'রে জনতা ফুটপাথের ওপর হৈ-হৈ শুরু ক'রে দিলে। এম-পির হুইস্‌ল্ তীব্র শব্দে বেজে উঠল। হাত আন্দোলিত ক'রে অগ্রসর হবার ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক বাহিনী আবার অগ্রসর হতে আরম্ভ করলে। এই দ্রুত ধাবমান যান্ত্রিক বাহিনীর মাঝখান দিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পিছনের দোকানের ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা শব্দ হ'ল—পিছন ফিরে কানাই দেখলে সাড়ে সাতটা। শীতকাল—ডিসেম্বর মাস—তার ওপর নতুন সময়—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। তার ছাত্র পড়াবার সময় আটটা থেকে ন'টা। যেতে হবে বউবাজার। কানাই দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল ট্রাম-ডিপোর দিকে। তাকে অতিক্রম ক'রে পাশ দিয়ে চ'লে গেল দু'খানা সাধারণ লরী—শাক-সব্জী খাদ্যদ্রব্যে বোঝাই। সাধারণ লরী হ'লেও চালকের অঙ্গে খাকি উর্দ্দি, মাথায় লোহার হেল্‌মেট।

কানাইয়ের কানে তখনও বাজছিল—জগা-পাগলার প্রচণ্ড আদেশ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি। চোখে ভাসছিল—আকর্ণ-টানে বাঁকানো ধনুকের মত সর্ব্বশক্তি উদ্যত করা তার সেই পেশীপ্রকটিত বাঁকানো দেহ। ট্রামে উঠে ওই কথা ভাবতে ভাবতে সে বসল। ট্রামডিপোতে বন্দুকধারী সেণ্ট্রী পাহারা দিচ্ছে।

দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপন।...... থিয়েটারে জলসা নৃত্যগীত।......থিয়েটারে 'প্রেমের ফুল'। থিয়েটারে 'বেনামী চিঠি'।...থিয়েটারে 'হাতের নোয়া', 'বর্ত্তমান যুগেও হিন্দু সতীর অপূর্ব্ব মহিমা'! অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব পাগলের ভূমিকায় নটসম্রাট নগেন রায়। পাশাপাশি চারটে সিনেমা হাউসের সামনে এরই মধ্যে বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে...ফোর্থ ক্লাস ফুল, থার্ড ক্লাস ফুল; একটাতে

ঝুলছে—হাউস ফুল। আজ শনিবার। চোখের ওপর এবার ভেসে উঠল—ছুটোর পরের ফুটপাথগুলোর দৃশ্য; ট্রাম-বাস, বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়। অদ্ভুত! তাদের বাড়ীর সামনের ওই বস্তিটাই যেন গোটা কলকাতায় প্রসারিত হ'য়ে পড়েছে। কানাই একটু হাসলে। ঠিক তার পিছনে ব'সে দুটি প্রৌঢ় জন্মান্তরবাদ এবং কর্ম্মফল নিয়ে আলোচনা করছে।—এসব আমাদের জন্মান্তরের পাপের ফল। কলিতে একপোয়া ধর্ম্ম, তাও শেষ হয়ে আসছে।

অন্য জন বললেন,—চেতাবনী পড়েছেন? এই শ্রাবণেই নাকি—

প্রথম জন তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—নাকি নয়, ওতে আর সন্দেহ নেই। এবারকার সাইক্লোন তার ভূমিকা। তুমি দেখে নিয়ো—মেদিনীপুরে যেমন হয়েছে, তাই হবে—শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প—যাকে বলে প্রলয়।

সামনের বেঞ্চে দুটি মধ্যবয়সী তরুণ আলোচনা করছে রাজনীতি—Dear Sir John ব'লে যে চিঠি ঠুকেছেন শ্যামাপ্রসাদবাবু! হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদকে বলেছেন—শেরের বাচ্চা শের।

মেদিনীপুর! বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্ত মেদিনীপুর রাজরোষে প্রচণ্ড শক্তির পেষণে যখন পিষ্ট হচ্ছিল, তখনই অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত জলোচ্ছ্বাস এসে সমস্ত জেলাটাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়ে গেছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ পশু ভেসে গেছে। লক্ষ লক্ষ শবদেহে শ্মশান হ'য়ে গেছে মেদিনীপুর। বাইরের দিকে তাকিয়ে এবার তার চোখে পড়ল—মেদিনীপুরের সাহায্যকল্পে—জলসা নৃত্যগীত; মেয়র সাহায্য-ভাণ্ডার—বিজ্ঞাপনগুলো আজও বিবর্ণ হয়ে যায় নি। কাল খবরের কাগজে বেরিয়েছে—মার্শাল চিয়াং কাইশেক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ডে। আজ মাইনে পেলে সে পাঁচটা

টাকা অন্তত পাঠিয়ে দেবে—মেয়র সাহায্য-ভাণ্ডারে অথবা আনন্দবাজার সাহায্য-ভাণ্ডারে।

গাড়ীটা একটা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়াল। একটা রিক্সাওয়ালা অসম-সাহসের সঙ্গে ট্রামখানার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল। স্থান-কালের সামান্য ব্যবধানের জন্য বেঁচে গেছে। ড্রাইভার গাল দিয়ে উঠল। রিক্সাওয়ালাটা মুখ ভেঙিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে গেল। রাস্তার একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে কানাই শিউরে উঠল। এদিকে শিবনারাণ দাসের গলি, ওদিকে সিমলা স্ট্রীট, সামনে আর্য্যসমাজ মন্দির। গত আগস্ট মাসে—ওইখানে—; চোখের সামনে ভেসে উঠল রক্তাক্ত স্থানটা। কানাইয়ের চোখের উপরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে,—উঃ, কি সময়ই গেছে! সে কথা, সেই ছবি মনে ক'রে তার শরীর শিউরে উঠল। জানি না, কি কারণে তার মনের মধ্যে সাড় দিয়ে উঠল—মিল্টনের বাণী—

'Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to my conscience.'

দূরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুলিস-লরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাইড-কার সমেত একটা মোটর-বাইকে দু'জন সার্জেণ্ট টহলদারীতে দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে উত্তরমুখে চ'লে গেল।

—উঠুন মশাই। লেডিস্ সিট। লেডি। শুনছেন?

কানাই এবার চমকে উঠে পিছন দিকে হাত দিয়ে—সিটের পিছনে আঁটা লেডিস্ লেখা প্লেটটার ওপর হাত বুলিয়ে দেখলে। অন্যমনস্কতার মধ্যে লেডিস্ সিটেই সে বসেছে।

পাশের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়! কিন্তু কই, মহিলা কই?

—উঠুন না মশাই!

কানাই এবার উঠে দাঁড়াল।

—আপনি? মহিলাকণ্ঠের কথায় সে চকিত হয়ে পিছনের দিকে ফিরে দেখলে—দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলা সেন। নীলা গত বৎসর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছে। ছাত্রসভার উৎসাহী সভ্য ছিল নীলা। বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসাহী সভ্য নেপী নামক ছেলেটির দিদি—নীলা।

শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি রূপবতী নয়; কিন্তু মেয়েটির চমৎকার একটি শ্রী আছে। কানাইয়ের সঙ্গে আলাপ তার যৎসামান্যই। দু'তিন বার একটা সমিতির অধিবেশনে দেখা হয়েছে মাত্র। একবার মাত্র দুটি কথা হয়েছিল—কানাই-ই তাকে প্রশ্ন করেছিল, তার মুখে বাক্যালাপের অভিলাষের স্মিতহাস্যের আভাস দেখে—ভাল আছেন? নীলা শুধু বলেছিল—হ্যাঁ। যে হাসি আভাসে আবদ্ধ ছিল, সে হাসি প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল রাত্রির শেষপ্রহরের শিউলির মত।

—উঠলেন কেন? বসুন না।

—ধন্যবাদ। আমি এইটেতে বসছি। আপনি বরং একটু আরাম ক'রে বসুন। কানাই ঠিক পাশের সিট্‌টায় বসল। মাঝখানকার পথটার ব্যবধান রেখে প্রায় পাশাপাশিই বসল দুজনে। ধোয়া মিলের শাড়ীর ওপর চকোলেট রঙের গরম কোট গায়ে নীলাকে বেশ ভাল মানিয়েছে। মাথার চুল জালের ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাঁধের উপর প'ড়ে আছে। পাউডারের ঈষৎ আভাস মুখের শ্যামবর্ণ রংকে চমৎকার শোভন ভাবেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

কানাই প্রশ্ন করলে—কই ক'দিন আপনাকে সমিতির আপিসে দেখলাম না! আমি ভেবেছিলাম, আপনি এলাহাবাদে কনফারেন্সে গেছেন।

—নাঃ। আমি যাই নি। নীলার মুখ বেদনাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

এলাহাবাদে ছাত্রছাত্রী-সম্মেলনে নীলার যাবার কথা ছিল। বোধ হয় অর্থাভাবে যাওয়া ঘ'টে উঠে নি, অথবা সঙ্ঘ থেকে ওকে যাওয়ার অধিকার দেয় নি অর্থাৎ ওকে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করা হয় নি।

কানাই তাই নীলার ভাই নেপীর প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে কথাটা চাপা দিলে, বললে,—তারপর, শ্রীমান নেপীর খবর কি?

নীলা একটু হেসে বললে—Life এর speed তার বেড়েই চলেছে। কোনদিন বাড়ী ফেরে, কোনদিন না। কিন্তু আপনি এলাহাবাদ গেলেন না কেন? যাওয়া আপনার উচিত ছিল।

হেসে কানাই বললে—জানেন তো, "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে—;" বাকীটা সে অসমাপ্তই রাখলে।

—সে কথা তো আপনি বলেন নি? সবিস্ময়ে নীলা বললে—আপনি বলেছিলেন—কার অসুখ।

—কথাটা ঠিক মিথ্যে নয়, বাড়ীতে আমাদের লোকসংখ্যা ছোটতে বড়তে অন্তত তিরিশ। সর্দ্দি হোক, নিউমোনিয়া হোক—প্রতিদিন একজনকে অসুস্থ পাওয়া যায়ই। সুতরাং কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ওই জন্যেই যে যাওয়া অসম্ভব, সেটা সত্য নয়। কারণ যে মনোরথ হৃদয়ে উঠেই হৃদয়েই মিলিয়ে যায়, সেটা ঠিক প্রকাশের বস্তু নয়—অন্তত বর্ত্তমান সমাজে।

নীলা চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার কথা অবশ্য সত্য। কানাই ছাত্র-সমাজে ভালি বক্তা ব'লে পরিচিত, বাক্যধারা তার স্বত-উৎসারিত এবং বক্তব্য আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্যে অকাট্য ও তীক্ষ্ণ। বিশেষ ক'রে কোনক্রমে তাকে আঘাত দিতে পারলে তখন ওর চেহারা পাল্টে যায়। তার বক্তব্য তখন এমন ধারালো এবং আঘাতধর্ম্মী হয়ে ওঠে যে, প্রতি-পক্ষের আর সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব হয় ওঠে।

—কিন্তু আপনি এত সকালে—? প্রশ্ন করতে গিয়ে কানাই মধ্যপথে

আত্মসচেতন হ'য়ে থেমে গেল। নীলার সঙ্গে তার যেটুকু পরিচয় তাতে এ প্রশ্ন করা উচিত নয়। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল তাতেই প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অল্প একটু হেসে উত্তর নীলা দিলে—আপনি বোধ হয় জানেন'না, আমি Supply Departmentএ চাকরী নিয়েছি।

—চাকরী নিয়েছেন? আর পড়বেন না তা হ'লে?

—নাঃ। প'ড়ে কি হবে? কি করব?

কানাই কিছু উত্তর দিতে পারলে না। সত্যই তো, কি হবে? লেখা-পড়ায় নীলার মত মাঝারি শক্তির মেয়ে এম্-এ-তে হয়তো কোন রকমে সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু তাতেই বা কি ফল? বড়জোর কোন Girls' High Schoolএ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হতে পারে। বেতন চল্লিশ কি পঞ্চাশ, কিন্তু খাতায় লিখতে হবে পঁচাত্তর অথবা এক শত। নীলার কোমল শ্যামশ্রীর মধ্যে মিষ্টতা আছে সত্য, কিন্তু তাতে আই-সি-এস্ অথবা বি-সি-এস্ যোগ্যতাসম্পন্ন কোন বাঙালী তরুণ আকৃষ্ট হবে না। সুতরাং তার এই নৈরাশ্যজনক পাঠ্যজীবনের জের টেনে দরকার কি?

—আপিসে রাশীকৃত ফাইল জ'মে ম্যাট্রিকুলেশনের কোন সাবজেক্টের হেড্ এক্জামিনারের বাড়ীর মত অবস্থা ক'রে তুলেছে। তাই একটু ওভারটাইম খাটতে চলেছি। Most obedient and faithful servant, বুঝলেন না! ব'লে এবার সে মৃদু একটু শব্দ ক'রেই হাসলে। কানাইও হাসলে।

নীলাই আবার বললে—এখন আপনি কোথায় চলেছেন?

—ছাত্র ঠ্যাঙাতে। প্রাইভেট ট্যুইশনি আছে একটা—বউবাজার।

—বউবাজার! নীলা সবিস্ময়ে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে বাইরের দিকে তাকালে।

—এই মোড় ফিরেই একটু এগিয়ে গিয়ে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু

জংসনের—। এ কি! এ যে ওয়েলিংটন স্কোয়ার? এটা কি ডালহৌসির ট্রাম নয়।

পিছন থেকে মৃদুস্বরে একজন সহযাত্রী বেশ একটু আদিরসাশ্রিত রসিকতা ক'রে উঠল; কানাই পিছন দিকে মুখ ফেরালে, কিন্তু কে বক্তা তা ঠাওর করতে পারলে না, কারণ সকলের মুখেই রস-রসিকের হাসি ফুটে উঠেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলে, নীলার শ্যামবর্ণ মুখখানা চকিতে হয়ে উঠেছে তার মায়ের নিত্য-মার্জ্জনায় উজ্জ্বল তামার পঞ্চ-পাত্রখানির মত। গাড়ীটা মন্থর গতিতে মোড়ের বাঁক ফিরছিল। কানাই উঠে দাঁড়াল। এঃ, দেরি হয়ে গেল! কথাটা সে প্রায় আত্ম-অজ্ঞাতসারেই ব'লে ফেললে।

—দেরি যদি হয়েছে তবে আর একটু চলুন। আমাকে পৌছে দিয়ে আসবেন।

নীলার এ অনুরোধটুকু কানাইয়ের ভাল লাগল। মনে তার একটু রঙও যেন ধ'রে গেল। একজন সঙ্গিনীর জন্য যদি সে একটি সকাল নষ্ট করতেই না পারে তবে সে তার আপনার জন্য পারে কি? সে ব'সে পড়ল; এবার সে তার সিটেরই শূন্য স্থানটাতেই বসল।

পিছনে মনে হ'ল—নর্দমার নীল মাছির আস্তানার পাশে—গাছ থেকে খ'সে পড়েছে অতি সুপক্ক ফল—মাছির দল ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে চলেছে গন্ধের উৎস লক্ষ্য ক'রে।

এসপ্ল্যানেডে নেমে নীলা বললে—চলুন, কফি খেয়ে আপনি ফিরবেন—আমি আপিসে যাব।

—কফি খেয়ে? কানাইয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—তার সম্বলের কথা স্মরণ ক'রে।

নীলা হেসে বললে—নতুন চাকরী পেয়েছি—বন্ধুবান্ধবদের বেশী খাওয়াবার তো সাধ্য নেই, বড়জোর কফি, স্যাণ্ডউইচ—এই পর্য্যন্ত।

এর আগে সে কখনও কফিখানায় আসে নি। ভেতরে ঢুকে তার মনে হ'ল—বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন সাবানের রঙিন ফেনার এক টুকরো ফানুষের মত এখানে ভাসছে।

(তিন)

প্রাইভেট ট্যুইশনি সেরে বাড়ী ফিরে কলেজ। কলেজের পর বাড়ী অথবা সমিতির আপিস। তারপর আবার চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বদ্ধ আবহাওয়া। এই তার জীবন? বাড়ীর বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে যখন তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে তখন সে অভিসম্পাত দেয় আপন বংশকে। যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে নামে—রাজপথের আশেপাশে বড় বড় বাড়ীগুলোকে দেখে, আর দেখে পথের ওপর নিরন্ন মানুষের মেলা—তখন তার মন অপরাধী হয়ে ওঠে—আপনার বংশকে অভিসম্পাত দেওয়ার জন্য। মানুষ নিরুপায়। একা তার পূর্ব্বপুরুষের অপরাধ কি? অহরহ একটা অস্থির জর্জ্জরতায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে নিজে জানে, এর কারণ কি! এর কারণ নিহিত আছে তার রক্তধারার মধ্যে।

আজ কিন্তু সমস্ত দিনটা তার অনেকটা শান্ত ভাবে কেটে গেল! প্রাইভেট ট্যুইশনির মাইনে এনে বাড়ীর বাজার ক'রে দিয়ে চারটে টাকা সে নিজে রেখে দিলে। তার মা কিন্তু এটা পছন্দ করেন না। তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আছে—একটা আত্মনির্য্যাতনের প্রচণ্ড আবেগ। সংসারের লোকের সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনার সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে কষ্ট ভোগ ক'রেই তাঁর আনন্দ। ওইটাই তাঁর আদর্শ। সেই আদর্শে তিনি তাঁর ছেলেকেও দীক্ষিত দেখতে চান। কানাই তাঁকে দুঃখ দিতে চায় না। আদর্শ গ্রহণ না করলেও মায়ের আদেশ সে অমান্য করে না। মা তার বলেছিলেন—চারটে

টাকায় কি তোর দরকার? আমাদের সংসারে চারটে টাকার কত দাম তুই বল্!

অন্যদিন হ'লে কানাই টাকাটা আর চাইত না। কিন্তু আজ সে একটা অর্দ্ধসত্য ব'লে টাকাটা নিজের কাছে রাখলে। বললে—কলেজে দিতে হবে।

কলেজে অবশ্য দু'টাকা লাগবে। বাকী দু'টাকা সে রেখে দিলে—নীলার আতিথ্যের প্রতিদান দেবার জন্য। কফিখানায় সেও তাকে একদিন কফি খাওয়াবে। সেটা তার উচিত। সন্ধ্যার সময় ঘরে ব'সে ওই কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শুনে সে চকিত হয়ে উঠল। কি ব্যাপার? আপনার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে আশ্বস্ত হ'ল, না—তাদের বাড়ীর ভেতরে নয়। গোলমাল উঠেছে রাস্তায় বস্তীর সামনে। বিদেশী উচ্চারণে হিন্দীতে একটা লোক চীৎকার জুড়ে দিয়েছে—মধ্যে মধ্যে ভাঙা বাংলাতেও কথা বলছে। বস্তীর কোন অধিবাসীর সঙ্গে কোন বিদেশীর হাঙ্গামা বেধেছে। বিদেশীটির কথাবার্তার মধ্যে দম্ভ যেন ফেটে পড়ছে। লোকটা টাকার দাবী জানাচ্ছে—ফেকো, হামরা রূপেয়া ফেকো।

তীক্ষ্ণ সরুগলায় কেউ ব্যর্থ প্রতিবাদ করছে। কি বলছে, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে একটা দুটো কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে শুধু। কণ্ঠস্বরের যেটুকু তার কানে এসে পৌঁছুল—তাতেই সে বুঝলে—গীতার অর্থাৎ সেই শ্যামবর্ণা শান্ত মেয়েটির বাপের কণ্ঠস্বর। গীতার বাপের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় তার নাই, কিন্তু গীতা তার বোন উমার বন্ধু। এককালে সে তাদের বাড়ী নিয়মিত আসত উমার সঙ্গে খেলা করতে। স্কুলেও সে উমার সঙ্গে পড়েছে কিছুদিন। তখন সে মধ্যে মধ্যে তার কাছে এসে পড়া দেখিয়ে নিত। মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ শান্ত। তাদের সংসার ক্রমশ যত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে,

মেয়েটিও তত সঙ্কুচিত শান্ত হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে পড়া ছাড়তে হয়েছে। তাদের বাড়ীতেও সে বড় একটা আসে না। যখন আসে তখন কানাই বুঝতে পারে—কোন জিনিষ চাইতে এসেছে গীতা। সে যখন পথ চলে, পদক্ষেপ দেখে মনে হয়—তার মাথার উপর চেপে আছে একটা প্রচণ্ড-ভার বোঝা। দারিদ্র্যের বোঝা, কানাই সে জানে। দারিদ্র্যের পেষণে গীতার প্রাণশক্তি ম'রে যাচ্ছে, খেতে না-পেয়ে তত নয়। দারিদ্র্যের অস্পৃশ্যতাজনিত জীবনের সঙ্কোচনেই সে বেশী নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। সেই গীতার বাবা ব'লেই কানাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

গীতার বাবাই বটে। তার হাত চেপে ধরেছে একজন কাবুলী-ওয়ালা। লোকটির বয়স বেশী নয়। কানাইয়ের সঙ্গে তার দু'বেলা দেখা হয়। সে সকাল থেকে এসে ব'সে থাকে এই পাড়ার কোন বাড়ীর দাওয়ায়। মোটা সুদে টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা। সুদূর আফগানিস্থান বা পেশোয়ার থেকে এখানে এসে সুদি কারবার ফেঁদে বসেছে। ধনীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, যারা বাপের মৃত্যুপথ তাকিয়ে আছে, তারা এদের কাছে টাকা ধার করে। আর ধার করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, যারা দিন দিন নামছে নিঃস্ব রিক্ত অবস্থার দিকে। গীতার বাবা সরু গলায় চীৎকার করছে—রূপেয়া কি আমাকে মারলে আদায় হবে না কি? নেই তো কাঁহাসে দেগা?

—সুদ নিকালো। সুদ। দো মাহিনা একঠো আধেলা নেহি দিয়া তুম।

কানাই এগিয়ে এসে বললে—এ সাহেব, ছোড় দিজিয়ে। এ কেয়া বাৎ, জুলুমবাজীকে মুলুক নেহি।

লোকটি হেসে কানাইকে বললে—বাবুজী, আমার শরীরে যতক্ষণ তাগদ আছে, ততক্ষণ আমার জুলুমবাজীর একতিয়ার আছে।

কানাইয়ের মাথার ভিতরটায় যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সে তবুও নিজেকে সংযত ক'রে একটু হেসেই এগিয়ে এসে

কাবুলীওয়ালার হাত ধ'রে বললে—ঠিক বলেছ তুমি। তাগদই দুনিয়ায় একতিয়ারের আসল কিস্মৎ বটে। তবে তাগদ সংসারে তো তোমার একচেটিয়া নয়। ছাড়, ভদ্রলোকের হাত ছাড়।

কাবুলীওয়ালাটি আশ্চর্য্য হয়ে কানাইয়ের মুখের দিকে চাইলে। সে কানাইয়ের চেয়ে লম্বায় অন্তত এক ফুট বড়—শরীরের পরিধিতে তার দ্বিগুণ। অথচ সে-ই তাকে বলছে—তাগদ তোমার একচেটিয়া নয়!

গীতার বাপ ওদিকে এই সহানুভূতিটুকু পেয়ে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।—দেখুন! দেখুন! একবার অত্যাচারটা দেখুন! এই যুদ্ধের বাজারে আজ দু'মাস চাকরী নাই—পেটে খেতে পাই না, আর জুলুম দেখুন আপনারা!

কানাই কাবুলীওয়ালাটিকে বললে—ছেড়ে দাও।

কানাইকে ভয় ক'রে ঠিক নয়, কিন্তু কানাইয়ের নির্ভীকতা এবং স্থানটা তার বিদেশ ও কানাইয়ের স্বদেশ ব'লেই তাগদ সত্ত্বেও কাবুলী-ওয়ালা তার খাতকের হাত ছেড়ে দিলে। বললে—বেশ তো, আপনি তো ভদ্র আদমী—আমার টাকা আদায় ক'রে দিন আপনি, আপনাকেই আমি সালিশ মানছি। আসল দিতে না পারে—দু মাসের সুদ ছও রূপেয়া চার আনা আদায় ক'রে দাও। পঞ্চাশ রূপেয়ার দো মাহিনার সুদ।

পঞ্চাশ টাকার দু'মাসের সুদ ছ'টাকা চার আনা! টাকায় এক আনা সুদ মাসে? কানাইয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সে কি ব'লে প্রতিবাদ করবে, বিস্ময় প্রকাশ করবে খুঁজে পেলে না। এ নিয়ে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে, কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ মিটে গেল। বস্তীর বিপরীত দিক থেকে এল এক প্রৌঢ়া। এসে বললে—কই কই কাবুলেওলা? এই নে বাবা তোর দু'মাসের সুদ, এই নে। ব'লে সে ছ'টাকা চার আনা লোকটির হাতে আলগোছে ফেলে দিলে।

কানাই এতেও একটু বিস্ময় বোধ করল। প্রৌঢ়াকে সে চেনে।

এই পাড়াতেই অল্প একটু দূরে সে থাকে। প্রৌঢ়া পাড়ায় বামুনদিদি ব'লে পরিচিত। অনেকে তাকে অন্তরালে বামুনদাদাও ব'লে থাকে। প্রৌঢ়ার গতিবিধি পুরুষের মত। পুরুষের ছাতা মাথায় দিয়ে চটি পায়ে সে ঘোরাফেরা করে, ট্রামে বাসেও কানাই তাকে যেতে আসতে দেখেছে। সে ঘটকীর কাজ করে। বাড়ীতে ছ'দশ টাকার বন্ধকী কারবারও করে। তার পক্ষে দয়াধর্ম্ম কানাই কল্পনা করতে পারে না—অন্তত তার সম্বন্ধে লোকে যে ধরণের কথাবার্ত্তা বলে, তাতেও কল্পনা করা যায় না। সে এসে ছ'টাকা চার আনা দিয়ে দিলে! গীতার বাবা কি মা যদি টাকাটা ধার করত, তবে টাকাটা আসা উচিত ছিল তাদের কারও হাত দিয়ে।

প্রৌঢ়া আপন মনেই বললে—পাড়াপড়শী—দুঃখী মানুষ—ভদ্দর লোকের ছেলের অপমান করছে—এ কি চোখে দেখা যায়! যা'হই না-হয় আমার টাকাটা!

বলতে বলতেই সে চ'লে গেল গীতাদের বাড়ীর দিকে।

গীতার বাপ ঘরে ব'সে আর্ত্তনাদ করছে—কাল যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ! হে ভগবান, তুমি বিচার কর। তুমি বিচার কর।

কানাইয়ের মনের মধ্যে ফিরছিল ওই প্রৌঢ়ার কথা। সে মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছে তার আচরণে। বাড়ীতে ফিরেও সে ওই কথাটাই ভাবছিল। সঙ্গে সঙ্গে এও বার বার মনে হ'ল যে, টাকাটা এ ক্ষেত্রে তার নিজের দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক করলে—কাল গীতাকে ডেকে টাকা চারিটি পাঠিয়ে দেবে। সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল—তাদের বাইরের মহলের খোলা ছাদে। ওখান থেকে গীতাদের বাড়ীটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলে, গীতার বাবা বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছে। হতভাগ্য মানুষটির জন্য মন তার ব্যথিত হয়ে উঠল। দুর্ব্বহ ব্যাধি! বিশেষ এই শীতকালে। সর্দ্দির প্রকোপ শীতকালে বাড়ে।

গীতার বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্যের হাঁপানী নয়। কারণ রোগটা যখন তার প্রথম দেখা দেয়—তখনও প্রদ্যোত ভটচায ছিল যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থার লোক, তার উপর সে ছিল বিলাসী, গায়ে শাল থেকে চেস্টার-ফিল্ড-কোট প্রভৃতির অভাব ছিল না। এখন সেগুলো অবশ্য নেই, কতক অনেক পূর্ব্বেই বন্ধক দেওয়া হয়েছে, আর ছাড়ানো হয় নি; শাল-খানা বেচে ফেলা হয়েছে, নিতান্ত অল্পদামী যেগুলো সেগুলো জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে গেছে, তার দু'একটা ফালি এখনও আছে, রাত্রে তারই এক টুকরো প্রদ্যোত গলায় জড়িয়ে রাখে।

তাঁর হাঁপ ও কাশির উৎপত্তি অজীর্ণ রোগ থেকে। ভাল পরার চেয়েও তার ভাল খাওয়ার উপর ঝোঁক ছিল বেশী। অজীর্ণতা অর্থাৎ রোগের হেতুটা কিন্তু এখন গৌণ হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে মুখ্য হেতু জীর্ণ করবার মত বস্তুর অভাব। অভাবের কারণে দেহ তার শীর্ণ—পেট শুকিয়ে প্রায় পিঠে ঠেকেছে; এখন প্রদ্যোত ভটচায খালি পেটে বিড়ি টানতে গিয়ে কাশে; কাশির সঙ্গে ওঠে হাঁপানী, চোখ দুটো ঠিক্‌রে যেন বেরিয়ে আসতে চায়, শীতের দিনেও সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দেয়; মনে হয় এখুনই কখন দু'চারটে হিক্কা উঠে সব শেষ হয়ে যাবে। শুধু বিড়ি টেনেই রোগ ওঠে না, শক্তির অধিক কোন উত্তেজনা উঠলেও রোগ দেখা দেয়—হাঁপায়; হাঁপানীর সঙ্গে ওঠে কাশি।

কলকাতার শহরতলীর এক বিখ্যাত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রধান পল্লীর অধিবাসী বংশের ছেলে প্রদ্যোত ভটচায। পূর্ব্বপুরুষের ব্রহ্মত্র ছিল—পাকা একতলা বাড়ী ছিল—নামডাকও ছিল। প্রপিতামহ ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে তাঁকে ডেকেছিল অধ্যাপনা করবার জন্য, কিন্তু ম্লেচ্ছের চাকরী তিনি গ্রহণ করেন নি। শুধু ম্লেচ্ছেরই নয়—শূদ্রের দানও তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁরই সে কালের প্রভাবে

আজও প্রদ্যোতের বাড়ীতে পেঁয়াজের নাম 'গৌরপটল'। নামকরণটা অবশ্য তাঁর আমলে হয় নি—হয়েছে তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্রের আমলে, তাঁর পৌত্র অর্থাৎ প্রদ্যোতের বাপের দ্বারা।

তাঁর পুত্র অর্থাৎ প্রদ্যোতের পিতামহ করতেন গুরুগিরি। তখন কোম্পানীর বেনিয়ানী ক'রে কলকাতার কায়স্থ এবং বৈশ্য সমাজ বিপুল বিভব এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। সায়েবী খানা হজম করবার জন্য আধ্যাত্মিক হজমীগুলির কদর তাদের কাছে বিভব এবং প্রভাবের অনুপাতেই ওজনে সমান ভারী ছিল। প্রদ্যোতের পিতামহ তাদের মধ্যেও তাঁর ব্যবসা প্রসারিত ক'রে দিলেন। অবশ্য তাতে লাভবান তিনি যথেষ্টই হয়েছিলেন। একতলা বাড়ী দোতলা হয়েছিল। কিন্তু তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। শিষ্য হ'লেও তারাই ছিল সমাজে গরীয়ান। তাই তিনি শিষ্যদের গরীয়সী বিদ্যায় দীক্ষিত করতে চাইলেন নিজের ছেলেকে। গুরুগিরিতে অজস্র প্রণাম এবং প্রণামী পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলেকে—প্রদ্যোতের বাবাকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আষ্টেপৃষ্ঠে যে সংযমের বা বাধা-নিষেধের বন্ধন, তা থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলে যতখানি তেল পুড়িয়ে আলোর সমারোহে মেতে গেল—ততখানি নাচ শিখলে না। 'গৌরপটল' নাম দিয়ে—রান্নাঘরে পেঁয়াজের জন্য স্বতন্ত্র উনান কড়ার সৃষ্টি করলে, কিন্তু এণ্টান্স পরীক্ষার গণ্ডী উত্তীর্ণ হতে পারলে না। তাতে অবশ্য আটকাল না; বাপের প্রতিষ্ঠাবান শিষ্যদের অনুগ্রহে মার্চেণ্ট আপিসে একটা চাকরী তার মিলল। মাইনে বেশী নয়। তাই সে বাপের মৃত্যুর পর সায়েবী ফ্যাশানে চুল ছেঁটে ও টিকি রাখলে এবং গৃহদেবতা শালগ্রামশিলাটিকে নিয়ে পৌরোহিত্য বৃত্তি গ্রহণ করলে উপরি ব্যবসা হিসেবে।

তারই ছেলে প্রদ্যোত।

প্রদ্যোতের বাপ আপনার ছেলেকে ক'রে তুলতে চেয়েছিল স্বাধীন

ব্যবসায়ী অথবা দালাল। স্বাধীন ব্যবসায়ের ইচ্ছাটাই ছিল প্রবল। তখন বাঙালী ধনীরা চেয়ার টেবিল নিয়ে সবে আপিস ফাঁদতে শুরু করেছে। মূলধনের অভাবে প্রদ্যোতের বাপ দালালীটাকেই ভাল ব'লে মনে করেছিল। নিজের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বেশ বুঝেছিল যে, দেওয়া এবং নেওয়ার মাঝখানে হাঁত পেতে দাঁড়াতে পারলে সে হাতে দাতা-গ্রহীতা দু'তরফ থেকেই কিছু কিছু ঝ'রে পড়তে বাধ্য। দালালদের কমিশন এবং সেল-পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ দেখে সে ছেলেকে দালালীতে দীক্ষা দিতে চেয়েছিল। দালালীর অন্যতম প্রধান মূলধন মুখ, অর্থাৎ কথা ব'লে মানুষকে মুগ্ধ করা, সেটা প্রদ্যোতের ছিল। সে তখন গৌরপটলের পরবর্ত্তী শব্দ রামপক্ষী আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। টিকি একেবারেই ছেঁটেছে।

প্রপিতামহের নাম ছিল হরিদাস, পিতামহ খ্যাত হয়েছিলেন নবীন নামে। তাঁর পুত্রের তিনি নাম রেখেছিলেন চারুচন্দ্র, চারুচন্দ্রের পুত্র প্রদ্যোত—দালালী আরম্ভ করলে। দালালী ব্যবসায়ে প্রদ্যোত প্রথমটায় বেশ সার্থকতা লাভ করেছিল, প্রতিদিনই সে কিছু না কিছু অর্থ নিয়ে বাড়ী ফিরত। তখনই তার আরম্ভ হ'ল স্মৃতিভোজন। রোগের বীজ তখনই প্রবেশ করেছিল। ভাল হোটেলে পার্টিদের খাওয়াতে গিয়ে তাকেও খেতে হ'ত চপ কাটলেট।

দালালী থেকে ক্রমশ সে আরম্ভ করলে 'সেল-পারচেজ বিজনেস'; তখন এই চপ কাটলেট খাওয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেল। তারপর একদা ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভ করে—বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে বাজারের পাওনাটা সমস্ত গ্রাসের প্রত্যাশায় ইন্‌সল্‌ভেন্সি ফাইল্‌ করে—পৈতৃক বাড়ী বিক্রী ক'রে স্ত্রীর নামে কলকাতায় তুললে সৌখীন বাড়ী, এবং নূতন বাড়ীতে ব'সে—কেবলই ইলিশ-ভেটকির ফ্রাই, মটন-মাংসের কালিয়া কোর্ম্মা, রামপক্ষীর কাটলেট আস্বাদন ক'রে

কর্ম্মহীন দিনগুলি যাপন করতে আরম্ভ করলে। এইবার রোগের বীজ অঙ্কুরিত হ'ল; পেটে বায়ু হ'তে আরম্ভ হ'ল; ব'সে ব'সে কেবলই উদ্গার তুলত প্রদ্যোত।

ওদিকে আরম্ভ হ'ল মামলা-পর্ব্ব। মামলায় ফাঁকি দেবার ব্যবস্থার মধ্যে কাঁচা হাতের গলদে ফাঁক বেরিয়ে পড়ল। সেই ফাঁক দিয়ে যখন সুদ-সমেত বাজারের পাওনা এবং মামলার খরচের দায়ে ব্যাঙ্ক শূন্য হয়ে— স্ত্রীর নামে বেনামী বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল তখনও পথে দাঁড়িয়ে প্রদ্যোত অভ্যাসবশে প্রচুর পরিমাণে তেলেভাজা খেয়ে চপ-কাটলেটের সখ মেটাত। অঙ্কুর তখন পল্লবিত হয়েছে। বায়ু ঊর্দ্ধগত হয়ে তখন হাঁপানী কাশি দেখা দিয়েছে।

তারপরেও চাকরী একটা মিলেছিল। নিজের বাড়ী ছেড়ে ভদ্র-পল্লীতে একতলায় বাসা নিয়ে—হাঁপ-কাশি নিয়েও সে আপিসে যেত। তখনও তেলেভাজা চলত। সস্তার বাজারে গঙ্গার ইলিশও সে আনত। হয়তো তার জীবনটা ওই ভাবেই কেটে যেত। কিন্তু হঠাৎ একদা আরম্ভ হয়ে গেল ইউরোপে পোলাণ্ডের এক টুকরো জমির ওপর যুদ্ধ। দেখতে দেখতে গোটা ইউরোপ জ্বলে উঠল—অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদখানার মত। সে আগুনের আঁচ ভারতবর্ষে এল। দূরত্ব বহু সহস্র মাইল— মধ্যে সাত সমুদ্র—তবু সেখানে আগুন জ্বললে এখানকার সোনা রূপো গলতে শুরু করে। ব্যবসার বাজারে বিপর্য্যয় ঘটল। রিট্রেঞ্চমেণ্ট আরম্ভ হ'ল। রিট্রেঞ্চমেণ্টের প্রথম হিড়িকেই প্রদ্যোতের চাকুরী গেল। কর্ম্মচ্যুত হয়ে সে এই বস্তীতে এসে বাসা নিয়েছে। আজ পয়সার অভাবে তেলেভাজা আর সে খায় না; অন্নও দু'বেলা সব দিন পেটে পড়ে না, কিন্তু হাঁপানী রোগটা আজ প্রায় মহীরুহে পরিণত হয়েছে, অতি-আহার থেকে যার উৎপত্তি অনাহারেও তার বৃদ্ধির বিরাম নাই, সে আজ তার শিকড় বিস্তার করেছে জীর্ণদেহের প্রতি কোষে-কোষে—

সেইখানে থেকে সে রস শোষণ করছে, আজ আর পাকস্থলীর অজীর্ণ রসের কোন অপেক্ষাই সে রাখে না।

গীতার মা সরোজিনী খানিকটা গরম তেল নিয়ে বুকে মালিশ করে দিচ্ছে। বারো তেরো বছরের বড় ছেলে হীরেন পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করছে। গীতা জল গরম করতে ব্যস্ত। গরম জলে খানিকটা সোডি-বাই-কার্ব মিশিয়ে খেলে প্রদ্যোতের হাঁপানী কমে। আজ সোডা নেই—শুধু গরম জল, তাতেও হয়তো উপকার হবে, এই প্রত্যাশা।

প্রৌঢ়া ঘটকী ব'সে আছে। সে সহানুভূতির অনেক কথা ব'লে যাচ্ছে। আশ্বাস দিচ্ছে। প্রদ্যোতের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। প্রদ্যোত হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে—বামুনদি, তুমি যাও এখন।

প্রৌঢ়া বললে—আচ্ছা। আসব আবার। হীরেন, তুই আয়। সেরখানেক চাল আছে নিয়ে আসবি।

প্রদ্যোত হাঁপানীর আক্ষেপেই বোধ করি পাশ ফিরে শুল।

(চার)

পরদিন সকালে উঠে জামা গায়ে দিয়ে পকেটে হাত দিয়েই কানাই চমকে উঠল। এ কি, তার টাকা? টাকা কোথায় গেল? কে নিলে? পরক্ষণেই তার মুখে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি। নেবার লোকের অভাব কোথায়? তবে ঝিয়েরা কেউ নয় এটা ঠিক। তারা ছাড়া যে কেউ হোক নিয়েছে। কে নিয়েছে এ সন্ধান ক'রে ওঠা শার্লক হোম্‌সেরও সাধ্যাতীত। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ঘর হতে বের হ'য়ে এল। ইচ্ছে হ'ল—এই বেরিয়ে সে আর ফিরবে না এ বাড়ীতে।

—কানু !

কানাই ফিরে দেখলে—তার মা আসছেন। সে দাঁড়াল। মা কাছে এলেন।

কানাই বললে—বল।

—কাল রাত্রে এসে টাকা চারটে আমি নিয়ে গেছি।

কানাই তাঁর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল। কোন কথা বললে না, কিন্তু দৃষ্টিতে তার নিষ্ঠুর প্রখরতা খেলে গেল।

মা বললেন—কলেজের টাকা আসছে মাসে দিবি। তুই এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন ? সংসারটার কথা ভেবে দেখ্ !

কানাই হাসলে। বললে—কিন্তু আমার কথা কে ভাববে মা ?

—সংসারে স্বার্থত্যাগই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম বাবা। তুই আগে তো এমন ছিলি না ! এমন কেন হলি তুই ?

কানাই কোন কথা না ব'লে বেরিয়ে গেল।

আজ রবিবার। আজ অবশ্য ছাত্রকে পড়াবার তার কথা নয়, কিন্তু ছাত্রের পরীক্ষা এসেছে সামনে, তাই রবিবারেও যাচ্ছে সে।—আজ রবিবার; একটু আশ্বস্ত হ'ল সে। নীলার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপিস আজ বন্ধ।

কানাইয়ের দুর্ভাগ্য। আজও নীলা—কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। সে একা নয়—নেপীও তার সঙ্গে। নেপী নীলাকে কী আঙুল দিয়ে দেখালে—ঐ যে! পরক্ষণেই কানাই বুঝলে নেপী তাকেই আঙুল দিয়ে দেখালে। নীলা ও নেপী ট্রামে উঠেই বললে—এই যে আপনি !

কানাই শুকনো মুখে বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা চলেছেন কোথায় ? আজ তো রবিবার।

—সে কি ! আপনি যাচ্ছেন না ? নীলার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

হঠাৎ কানাইয়ের মনে পড়ে গেল—আজ তাদের সমিতির উদ্যোগে একটা জরুরী সভা আছে। মেদিনীপুরের সাইক্লোন-পীড়িত অঞ্চলে রিলিফ ব্যবস্থার আলোচনা—প্রতিবাদ বলাই ভাল। কানাই একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—ও! আজকের মীটিংয়ের কথা বলছেন?

—নিশ্চয়। স্পীকারদের মধ্যে আপনার নাম রয়েছে।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি? আপনি সত্যিই যাবেন না? বিজয়দা নেই আজ—কলকাতার বাইরে তিনি। আপনি যাবেন না—সে কি! নীলা উত্তেজিত হয়ে উঠল—ট্রামে উপস্থিত যাত্রীদের কথাও সে বোধ হয় ভুলে গেল।

নেপী ব্যগ্রভাবে তার হাত ধ'রে বললে—না—না—কানাইদা, সে হবে না। চলুন আপনি।

—গিয়ে কি করব? খুব জোরালো একটা বক্তৃতা দিলেই কি তাদের দুঃখ দূর হবে? না—সরকার শশব্যস্ত হয়ে প্রতিকার করতে ছুটবে? এ সব আমার কাছে যাত্রার দলের ভীমের অভিনয় ব'লে মনে হয়।

নীলা ব'লে উঠল—কিন্তু প্রতিবাদের, প্রতিকারের যতটুকু অধিকার আছে—সেটুকু গ্রহণ না-করার নাম কাপুরুষতা—হ্যাঁ কাপুরুষতাই। সে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

কানাই স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। এর পর নেপীও আর কোন কথা বলবার সুযোগ পেলে না। ট্রামের যাত্রীদের মধ্যে ঘটনাটাকে ভিত্তি ক'রে নানা রসালো আলোচনা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। সংযমের নামে—শ্লীলতার নামে—সমাজধর্ম্মের অনুশাসনে শত বন্ধনে বাঁধা মানুষের মনের অবরুদ্ধ কামনা আত্মপ্রকাশ করছে সমালোচনার নামে। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা মানুষ বাঁধনে অভ্যস্ত হয়েও দাঁতে ক'রে বাঁধনটাকে চিবুচ্ছে।

একটা কথা তার কানে এল—Politics আজকাল জমেছে ভাল। বেশ যাকে বলে রসিয়ে উঠেছে।

অপর জন বললে—বিশেষ এদের পার্টিটা। এদের পার্টিটায় নাকি বেটাছেলের চেয়ে মেয়েদের দল ভারী!

গাড়ীটা এসে দাঁড়াল গোলদীঘির পাশে। সামনেই কলুটোলা স্ট্রীট। নীলা এবং নেপী নেমে গেল। ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে সভা।

একজন ব'লে উঠল—বাপ্‌স্‌, পদক্ষেপে গাড়ীখানা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল!

কানাই শূন্য দৃষ্টিতেই চেয়ে ব'সে রইল।

গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল মেডিকেল কলেজ পার হয়ে; বাঁ দিকে শিব-মন্দির, এ দিকে মেডিকেল কলেজের পাঁচীলের পাশে ফুটপাথের উপর পাড়াগেঁয়ে মানুষের একটি দল। একটি মেয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে। দৃশ্যটা অত্যন্ত করুণ মনে হ'ল কানাইয়ের। ট্রাম থেকে সে নেমে পড়ল।

মেয়েটি বুক চাপড়ে কাঁদছে—ওরে আমার ধন—ওরে আমার মানিক! ওরে, আমি যে ঝড়ে জলে বাছাকে বাঁচিয়ে রেখেছিনু রে! ওরে বাবারে!

লোক কয়েকটি মেদিনীপুরের অধিবাসী। ঘরবাড়ী ভেঙে মাটির ঢিবি হয়ে গেছে, গোরুবাছুর ভেসে গেছে, জলোচ্ছ্বাসে জমির বুকে চাপিয়ে দিয়েছে বালির রাশি। অন্ন নেই—এমন কি তৃষ্ণা মিটিয়ে জলপান করবারও উপায় নেই—জল লবণাক্ত হয়ে গেছে। সুদূর মেদিনীপুর থেকে এরা এসেছে অন্নের সন্ধানে। পেটের জ্বালায় সব ছেড়ে মেয়েটি ভোরবেলায় কার বাড়ীর দোরে গিয়েছিল উচ্ছিষ্ট ভিক্ষায়, দুর্বল ছেলেটা মায়ের পেছনে চলেছিল—সেই অবস্থায় রাস্তা পার হতে গিয়ে লরী চাপা পড়েছে।

একজন দোকানী বললে, ব্যাপারটা তাদের সামনেই ঘটেছে, বললে—হাঁ—হাঁ করতে করতে চাপা প'ড়ে গেল।

একজন দর্শক বললে—লরীটার নম্বর নেন নি মশাই?

—নিই নি? নিশ্চয় নিয়েছি। আটা মিলের লরী—ময়দার বস্তা বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। নম্বর —।

কানাই ফিরল। ট্রামের জন্যও অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হ'ল না তার। দ্রুতপদে পথটা অতিক্রম করে এসে উঠল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। সভা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। নেপী ভলাণ্টিয়ারের কাজ করছে—ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। কানাইকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হেসে কানাই একপাশে এসে বসল। বক্তৃতা করছে বিখ্যাত কিষাণ-কর্ম্মী নুরুল হক। তীব্র প্রতিবাদ করছে, আপনাদের অধিকারের কথা উচ্চস্বরে বলছে।—"দুনিয়ায় আমরাও মানুষ—আমাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে; সকল দেশের মানুষের মত—সকল দেশের মানুষের মত আমরা বাঁচতে চাই। আমরা কেন মরব? কেন আমরা পীড়িত হব? অন্যায়—এ অন্যায়! এর আমরা প্রতিবাদ করি।"

নীচে টেবিল ঘিরে একদিকে বসেছে পুলিস বিভাগের লোক। শর্টহ্যাণ্ড নোট নিচ্ছে। ওই সাঙ্কেতিক অক্ষর থেকে চলিত হরপে রূপান্তরিত ক'রে এরপর পরীক্ষা করা হবে, ওর মধ্যে বক্তা তার বলার অধিকার অতিক্রম করেছে কি না! অন্যদিকে বসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার।

যে বক্তা বলছিল—তার কথা শেষ হইতেই—নীলা এসে দাঁড়াল মাইকের সামনে। সে আজ অ্যানাউন্সারের কাজ করছে। সে ঘোষণা করলে—এর পর বলবার কথা ছিল আমাদের কর্ম্মী কানাই চক্রবর্ত্তীর। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। তাঁর স্থলে বলবেন—আমাদের অন্য কর্ম্মী—আবদার রহমন। এই সভা ক'রে বক্তৃতা ক'রে কিছু হবে

না জানি। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদের অধিকার আমরা ছাড়ব কেন। প্রতিবাদে ফল হবে না ব'লে হতাশায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে ব'সে থাকাটা পঙ্গুতার মত মারাত্মক ব্যাধি। কাপুরুষও একদিন সাহস সঞ্চয় ক'রে বীরের মত উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই ব্যাধি যাকে আক্রমণ করেছে—তার ভরসা নেই। জীবন সত্ত্বেও সে মৃত।

হলের মাঝখানের পথ দিয়ে কানাই এসে দাঁড়াল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে নীলার মুখ যেন কেমন হয়ে গেল। পিছন থেকে সভাপতি মৃদুস্বরে বললেন—কানাইবাবু! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি। নীলা তবুও চুপ ক'রে রইল। সভাপতি নিজে উঠে এসে ঘোষণা করলেন—কানাইবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রোগ্রাম মত তিনিই এখন বলবেন। তারপর বলবেন—মিস্টার রহমান।

কানাই এসে দাঁড়াল মাইকের সামনে।

খুব বেশী কিছু সে বললে না। বললে শুধু এই সন্থ-দেখা ঘটনাটির কথা। আর বললে—মেদিনীপুর থেকে খাদ্যাভাবে কলকাতায় এসে ছেলেটা চাপা পড়েছে খাদ্যেরই উপকরণ আটার লরীর তলায়। ঘটনাটা দেখে মনে পড়ল—রবীন্দ্রনাথের কথা—যে কথা তিনি লিখেছিলেন—মিস্ র‍্যাথবোর্নকে। "সমগ্র ব্রিটিশ নৌবহর ইংল্যাণ্ডের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে। আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আমাদের দেশের মানুষের কাছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এক গাড়ী খাদ্যও পৌঁছাবার ব্যবস্থা হয় না।"

বক্তৃতা শেষ ক'রেই সে বেরিয়ে গেল।

নেপী দাঁড়িয়ে ছিল—প্রবেশ-পথের মুখে। সে কানাইয়ের দুখানা হাত ধ'রে আবেগ ভরে বললে—ভারি চমৎকার হয়েছে কানাইদা। এর বেশী নেপী বলতে পারলে না। পারেও না কখনও। তার উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে, কিন্তু সে আবেগ-উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে তার চোখের

দৃষ্টিতে—মুখের রক্তোচ্ছ্বাসে; কিন্তু মুখর হয়ে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না বেচারা। নম্রতা বিনয় এবং মিষ্টস্বভাবত্বের আদর্শ শৈশব থেকে এমন ভাবে তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার সুপ্রচুর প্রাণশক্তি সত্ত্বেও তার প্রকাশে কলরব নাই, তার অদম্য কর্ম্মশক্তি অক্লান্ত, গতি তার অপ্রতিহত বললেও চলে, তবু তার কর্ম্মের মধ্যে সমারোহ প্রকাশ পায় না।

কানাই সস্নেহে বললে—তোর ভাল লাগলেই আমি খুশী।

নেপী অপ্রতিভের মত হাসলে। এটা তার স্বভাব।

—আচ্ছা, আমি চলি।

—একটা কথা বলছিলাম কানাইদা।

হেসে কানাই বললে—বল্।

নেপী বললে—পার্টি থেকে রিলিফ ওয়ার্কে একদল ওয়ার্কার পাঠাবে মেদিনীপুর। আপনি চলুন না লীডার হয়ে! আর—। নেপী পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে রাস্তার বুকে দাগ কাটতে লাগল। স্পষ্টত কানাই বুঝলে—নেপী লজ্জিত হয়েছে। নেপী যখন লজ্জিত হয়েছে—তখন সেটা নিশ্চয় তার নিজের কথা। এটা অনুমান ক'রে নিতে কানাইয়ের কষ্ট হ'ল না।

হেসে কানাই বললে—আর যদি—তোমাকে পার্টির মধ্যে নেবার জন্মে বলে দি! কেমন?

—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানাই বললে—তোর কথা ব'লে দেব নেপী। কিন্তু আমার যাওয়া হবে না ভাই। আমার ছাত্রের পরীক্ষা সামনে।

কথাটা ব'লেই কানাইয়ের খেয়াল হ'ল—যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। সে —আচ্ছা—ব'লেই অগ্রসর হ'ল।

নেপী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। লাউড স্পীকারে কমরেড রহমানের বক্তৃতা ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কানাইদার শেষ কথা কয়টা বলার সুরের মধ্যে সকরুণ এমন কিছু ছিল, যার স্পর্শে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তার চমক ভাঙল নীলার ডাকে। তার দিদি ডাকছে।

—নেপী!

—দিদি।

—কানাইবাবু চ'লে গেলেন?

—হ্যাঁ।

নীলা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল—তারপর আপনাকে যেন ঝাঁকি দিয়ে সচল ক'রে তুলে মিটিংয়ের দিকে ফিরল।

কানাইয়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নেপীর কথায়। জীবন চলেছে তার শোচনীয় বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে। একদিকে ডাকছে তাকে বাইরের ডাক—অন্যদিকে বাড়ীর সহস্র বন্ধনে সে আবদ্ধ। মা তাঁর নিজের আদর্শের বন্ধনে বেঁধে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তাঁর পথে। এ চাকরী তার কেবল বাড়ীর জন্যে। কলেজ স্ট্রীট পার হয়ে সে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে এসেই সচকিত হয়ে উঠল। এ কি! সাইরেন বাজছে? সাইরেন?

ভুল তার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙল, সাইরেন নয়, আমেরিকান মিলিটারী লরী, ওদের হর্নই ওই রকম—প্রকাণ্ড লম্বা লরী সারিবন্দী চলেছে।

সামনেই একটা কণ্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। হিন্দু, মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙালী—স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ঝিয়ের দল। গৃহস্থঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই, মাথার রুখু চুল ঠেলা-ঠেলিতে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে উড়ছে। মুখে অপরিসীম উদ্বেগ। কখন্ গিয়ে পৌছুবে ওই দোকানের সম্মুখে!

উর্দ্ধদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়তো বোরখা ঘোমটা এদের চিরকালের জন্যই খ'সে গেল। এই চরমতম দুর্গতির মধ্যেই এসে গেল আবরণ থেকে মুক্তি! কানাইয়ের মুখে হাসি খেলে গেল। ওপাশে ফুটপাথে ব'সে আছে নিরন্ন গৃহহীনের দল—ভিক্ষা ওদের পেশা নয়, কিন্তু ওরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

অদ্ভুত অবস্থা! এ অবস্থা পৃথিবীতে আজও কখনও আসে নাই। নিষ্কৃতি পাবারও উপায় নাই। যুদ্ধমান জাতিগুলি—জাতিগুলি নয়—জাতির নায়কের ইঙ্গিতে তারা পরস্পরের প্রতি হিংসায়, আক্রোশে, বাঁচবার ব্যাকুলতায়, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবীর জীবনশক্তিকে। এক বৎসরে বোধ হয় বিশ-ত্রিশ বৎসর অতিক্রম ক'রে চলেছে। এক বৎসরে বিশ-ত্রিশ বৎসরের সম্পদ-শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। লোহা-তামা-সোনা-রূপা সব—সব। এমন কি বিশ বৎসরে মানুষে যে পরিশ্রমশক্তি নিয়োজিত হ'ত—তা এক বৎসরে ক্ষয়িত হচ্ছে। বিশ বৎসরে ধনী যে ধন উপার্জ্জন করত—এক বৎসরে সেই ধন সে সঞ্চয় করছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরে বিশ বৎসরের বঞ্চনায় বঞ্চিত হচ্ছে দরিদ্রের দল। বিশ বৎসরের অভাব অন্নের বস্ত্রের, সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুরও অকস্মাৎ নিষ্ঠুরতম হিংস্র মূর্ত্তিতে এসে আক্রমণ করেছে পৃথিবীর মানুষকে। বিশেষ ক'রে এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য মানুষগুলিকে।

(পাঁচ)

বিশ বৎসরের পতনও বোধ করি চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে আসন্ন হয়ে উঠেছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অবস্থান তো এই পৃথিবীর মধ্যেই। অল্প-স্বল্প কয়েক টুকরো বস্তী জমি—যা ছিটেফোঁটার মত প'ড়ে আছে—তাই বিক্রী করবার জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সপ্তাহ দুয়ের ভেতর কিন্তু গীতাদের বাড়ীর গতি যেন বিপরীতমুখী হবার চেষ্টা করছে। অনেকদিন ধ'রে সেই প্রৌঢ়া আসা-যাওয়া করছে। প্রদ্যোতের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বড় একটা শোনা যায় না। প্রৌঢ়ার ওপর শ্রদ্ধা হয়েছে কানাইয়ের। প্রৌঢ়া আসে, বসে, গল্প-গুজব করে।

কানাইয়ের বোন উমা সেদিন বললে—গীতার বোধ হয় বিয়ে হবে।

—বিয়ে হবে? কানাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

—ঘটকী প্রায়ই আসে ওদের বাড়ী।

প্রৌঢ়া যে ঘটকী এ কথাটা কানাইয়ের মনে সাড়া জাগায় নি—কারণ ঘটকী হ'লেই মেয়ের বিয়ে হয় না, মেয়ের বিয়েতে প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু টাকা! তবু উমার কথায় আজ মনে হ'ল—হবেও হয়তো। বিনা পণে বিয়ে করবার মত লোকও তো আছে। মনে মনে কামনা করলে—তাই হোক, তাই হোক। দয়া ক'রেও যদি কেউ গীতাকে গ্রহণ করে, তবে দয়া তার সার্থক। গীতা দয়ার যোগ্য পাত্রী। দয়া ছাড়া অন্য কিছু দিলে ওই মেয়েটির তা গ্রহণের শক্তি নাই।

মা এসে দাঁড়ালেন। সেই মুখ—উদাসীন সকরুণ; দৃষ্টিতে আত্ম-ত্যাগের প্রেরণা—কানু!

কানু একটু হাসলে—বল।

—এ মাসের মাইনের এখনও সময় হয় নি?

—না। আজ তো সবে মাসের পনেরো।

—কিন্তু টাকাটা যে চাই।

—টাকা চাইলে হয়তো পাব। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আমার কলেজের মাইনে বাকী আছে ও-মাস থেকে।

—তুই তো বলছিলি—তিন চার মাস বাকী রাখলেও চলে।

—চলে, কিন্তু, তিন চার মাসের মাইনে একসঙ্গেই বা দেব কোত্থেকে এর পর ?

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—তোকেই একটা উপায় করতে হবে কানু। না-হয় সন্ধ্যের দিকে আর একটা প্রাইভেট ট্যুইশন দেখে নে।

কানাইয়ের হাসি এল। সে নিজে কখন্ পড়বে—এ-কথা বললেই মা আর এখুনি তাঁর আদর্শের কথা বলবেন। কোন প্রতিবাদ না ক'রেই সে বললে—বেশ, দেখি !

মায়ের মুখে হাসি ফুটল। বললেন—আয়, চা খেয়ে নে। টাকাটা আজ নিয়ে আসবি বাবা। কানাই মায়ের অনুসরণ করলে।

আকাশে প্রচণ্ড শব্দ ক্রমশ মাথার ওপর এগিয়ে আসছে। প্লেন আসছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি চীৎকার ক'রে উঠল—ওরে বাপরে ! কত—কত—কত !

উমাও উৎসাহ ভরে উচ্চকণ্ঠে গুনতে আরম্ভ করেছে—এক, দুই, তিন, চার—

কানাই তাকিয়ে দেখলে—সত্যই সংখ্যায় অনেক। অন্তত পঞ্চাশ-খানা। চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তা ধ'রে ট্রাম-রাস্তায় যেতে হবে। ফুটপাথে যেখানেই গাড়ীবারান্দার মত আশ্রয় সেখানেই মধ্যে মধ্যে নিরাশ্রয় মানুষ শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা ক্রমশই যেন বাড়ছে। কলকাতায় জনসংখ্যাও বেড়েছে।

হঠাৎ একটা গলির ভেতর থেকে কে ডাকলে—কানাইবাবু !

নারীকণ্ঠ।—নীলা। কানাই দেখলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসছে নীলা। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের মিটিংয়ের পর আর নীলার সঙ্গে দেখা হয় নি। কিন্তু এত সকালে এখানে নীলা ? সবিস্ময়েই সে প্রশ্ন করলে—আপনি ? এখানে ?

হেসে নীলা বললে—বলেন কেন! শ্রীমান নেপীর খোঁজে এসেছিলাম।

—নেপীর খোঁজে! কোথায় নেপী? মেদিনীপুর থেকে কবে ফিরল?

—এক সপ্তাহ পরে ফিরেছিল। আবার চার-পাঁচদিন আগে উধাও হয়েছে। বাবা রেগে আগুন। মা ভাবছেন। তাই এসেছিলাম—রমেনের কাছে। পার্টি আপিসে খবর পেলাম—কাল সে ফিরেছে।

রমেনও পার্টির একজন উৎসাহী সভ্য। নেপীর সমবয়সী। তার সত্যকার কম্‌রেড।

কানাই প্রশ্ন করলে—পেলেন খোঁজ?

হ্যাঁ। শুনলাম—আজ সকালের ট্রেনেই এসে পৌঁছুবে। তারপর হেসে বললে—আমারই হয়েছে এক বিপদ। মা দোষ দেবেন আমাকে। বাবা অবশ্য আমার বা আমাদের কাজে বিশেষ ইণ্টারফিয়ার করেন না। কিন্তু নেপী ছুটেছে পাগলের মত। বাবা যখন নেপীর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—তখন আমি অপরাধ অনুভব না ক'রে পারি না। আমিই ওকে পার্টিতে ঢুকিয়েছিলাম।

কানাই হেসে বললে—কিন্তু নেপী তো কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না মিস্ সেন! তখন আপনি কেন অনর্থা অপরাধী মনে করেন নিজেকে?

নীলা কোন কথা বললে না—বোধ হয় বলতে পারলে না। আত্ম-অপরাধ-বোধের গ্লানির মধ্যে যে অশান্তি, সেই অশান্তির মধ্যে সে কানাইয়ের কথায় সান্ত্বনার শান্তি পেয়েছে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে শুধু কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কানাই বললে চলুন,—এগিয়ে যাওয়া যাক। বাড়ী যাবেন তো?

স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীলা বললে— চলুন।

চলতে আরম্ভ ক'রে কানাই বললে—জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানেন—অন্তত আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ব'লে মনে হয়? সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

নীলা কোন কথা বললে না, শুনবার প্রতীক্ষা ক'রেই নীরব হয়ে রইল।

কানাই বললে—জীবনে যে পথে চলতে চাই—যাকে আদর্শ ব'লে মনে করি—সেই পথে চলায়—সেই আদর্শকে মানায়—সংসারের পারিপার্শ্বিকের বাধাকে অতিক্রম করতে না পারা। পারিপার্শ্বিক অবশ্য বাধা দেয় না—বাধা দেয় নিজেরই হৃদয়াবেগ—মায়া-মমতা স্নেহ-প্রেম। নেপী আশ্চর্য্য ছেলে; এই বয়সে সে সমস্তকে ডিঙিয়ে কেমন ক'রে মুক্তি পেলে—ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই মিস সেন!

নীলা একবার একটু হেসে বললে—নেপীর আপনি কোন দোষই দেখতে পান না!

কানাইও হাসলে, বললে—না, পাই না, সত্যিই পাই না মিস সেন।

নীলা বললে—কিন্তু বাবা-মার কথা ভুলি কি ক'রে বলুন? আমার বাবাকে আপনি জানেন না। তিনি অত্যন্ত উদার, তিনি কখনও—

ট্রাম এসে পড়ল। দুজনে ট্রামে উঠে বসল। নীলা বসল লেডীস সিট—একটি প্রৌঢ় মহিলার পাশে। কানাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

নীলার কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। সে তার বাবার কথা মনে ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

কেশব সেন স্ট্রীটেই নীলাদের বাসা। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সামনে ট্রামখানা দাঁড়াল, কিন্তু নীলা সেখানে নামল না। আরও

খানিকটা এসে কলেজ স্কোয়ারের সামনে গাড়ীখানা দাঁড়াতেই সে কানাইকে বললে—আসুন।

নীলার গতিই বেশ একটু দ্রুত; যেন অতিরিক্ত সাহসিকতায় খানিকটা উগ্র। কিন্তু উগ্রতা সত্ত্বেও—স্বচ্ছন্দ। সামনে যারা জনতা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে চেয়ে ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে দিলে। অর্থাৎ—পথ দাও। স'রেও দাঁড়াল তারা।

গাড়ীর মধ্যে মাত্র 'হ্যাঁ-না'-তেও যাত্রীর জনতা ভনভন ক'রে উঠবে মাছির মত। কানাই তাই, কোথায়—কেন ইত্যাদি কোন প্রশ্ন না ক'রেই নীলার সঙ্গে নেমে পড়ল। নীলার বোধ হয় নেপীর সম্বন্ধে আবেগ এখনও শেষ হয় নি।

গোলদীঘির মধ্যে প্রবেশ ক'রে কানাই বললে—কোথাও বসবেন?

নীলা কানাইয়ের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনার কাছে আমার ত্রুটি স্বীকার করা হয় নি, বাকী আছে।

—সে কি! কিসের ত্রুটি?

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমি আপনাকে—

বাধা দিয়ে হেসে কানাই বললে—না—না। কথাটা আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আর আমাকেই কিছু বলেন নি আপনি। কথাটা সাধারণ ভাবেই—

নীলাও বাধা দিয়ে বললে—না, না। আমি আপনাকেই বলেছিলাম। আমি স্বীকার করছি।

কানাই স্তব্ধ হয়ে রইল। মন্থর গতিতে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। নীলা মৃদুস্বরে বললে—কানাইবাবু!

কানাই বললে—আপনি সেদিন আমাকেই যদি কথাটা ব'লে থাকেন—তবুও আপনার দোষ হয় নি মিস্ সেন। আমার কাজ আমি করতে পারছি না। নিজের কাছেই আমার জবাবদিহি নেই।

কানাইয়ের কথায় নীলার মন সহানুভূতিতে ভ'রে উঠল; কানাইয়ের মনের কোন দুঃখকে সে যেন আভাসে অনুভব করলে, বললে—কি হয়েছে কানাইবাবু?

কানাই নীরবেই পথ চলতে লাগল।

নীলা আবার প্রশ্ন করলে—বলতে কি কোন বাধা আছে?

—বাধা? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানাই বললে—আমাদের বাড়ীর কথা। সে অনেক ইতিহাস। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে—পার্টির কাজ আমার দ্বারা বোধ হয় হবে না মিস্ সেন।

—কেন?

—বললাম তো, সে অনেক ইতিহাস। তা ছাড়া—

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে নীলা আবার প্রশ্ন করলে—কম্‌রেড!

কানাই বললে—থাক কম্‌রেড। সে কথা বলব কোনদিন।

নীলা চুপ ক'রে রইল।

কানাই আবার বললে—আমি হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন—। সে চুপ ক'রে গেল—বলতে যাচ্ছিল—"কোনদিন আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব।" কিন্তু বলতে পারলে না। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই মুখ তুলে সুইমিং ক্লাবের বাইরের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে মিস্ সেন। আটটা বেজে গেল।

সে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল কলেজ স্ট্রীটের দিকে। নীলা পুকুরের ধারের রেলিংটা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তারও মনে হ'ল—আপিসের বেলা হয়েছে।

নিজেদের বাড়ীর দোরে এসে নীলা দেখলে—বেশ একটি ভিড় জ'মে গেছে। ভিড় দেখে সে শঙ্কিত হ'ল না, কারণ ভিড়ের ভেতর

থেকে কোন গায়কের গানের সুর-ধ্বনি ভেসে আসছে। বুঝলে, তার বাপের খেয়াল। বাবা মধ্যে মধ্যে পথের ভিক্ষুক ধ'রে আনেন। বিশেষ ক'রে তার যদি কোন গুণপনা থাকে তবে তো কথাই নাই। এই মহার্ঘ্যতার দিনে খেয়ালটা অনেকটা কমেছে, তবে সেজন্য তাঁর দুঃখ অনেক।—সে কথা নীলা বুঝতে পারে। দেবপ্রসাদ অবশ্য মুখ ফুটে কোন কথাই কখনও প্রকাশ করেন না। বরং কোনদিন যদি আবেগের আধিক্য বশত নিয়েই আসেন—তবে অপ্রতিভের মত কৈফিয়ৎ দেন—সংসারের সকলের কাছে, ইদানীং বিশেষ ক'রে নীলাকে যেন কৈফিয়ৎ দিতে চান। তার কারণটা নীলা বুঝতে পারে, সংসারের ব্যয়ভার নীলাও আংশিক ভাবে বহন করে—সেই জন্য। এতে নীলা অত্যন্ত দুঃখ পায়। কিন্তু পরস্পরের দুঃখ পাওয়াটা দুজনেই ভাণ করে না-জানার।

নীলাকে দেখেই দেবপ্রসাদ বললেন—শোন—শোন নীলা—ভিক্ষুক ছেলেটির গানটা শোন। আর মা—ও-ই নিজে এই গানটা বেঁধেছে! পাড়াগাঁয়ের ভিখিরীর ছেলে—

ছেলেটি গান থামিয়েছিল—দেবপ্রসাদের উচ্চ কণ্ঠের কথা শুনে। বললে—আজ্ঞে না বাবু, আমরা ভিখেরী লই গো। ঘর আমাদের বর্দ্ধমান জেলা। ঘর দুয়োর আছে, বাবা ভাগে চাষবাস করে। তা মাশায়, কাল যুদ্ধ লেগেই যে সর্ব্বনাশ ক'রে দিলে গো! চালের দর কি মাশায়! আগুন! আট আনায় এক সের চাল। বাবা খেটে খায়। আমার আব্বার একটা হাত নাই। এই দেখেন।—ব'লে সে তার বাঁ হাতখানি বের করলে। শুকনো মরা ডালের মত একখানি হাত। আবার সে হেসে বললে—আমার মা নাই কিনা! বাবার ছেন্দা খানিক কম। আক্রার বাজারে বাবারও মাশায় খেতে কুলোয় না। মিছে কথা বলব না মাশায়—সত্যিই কুলোয় না। তাই আমি বসি

গান গেয়ে ভিখ-টিখ মেগে এখন খাই। আবার যদি কখনও যুদ্দু টুদ্দু মেটে—সস্তা গণ্ডা হয়—তবে আবার বাড়ী যাব। নইলে বুঝলেন কিনা বাবু, পথেই কোন্‌দিন হরি ব'লে—! মাটির উপর শুয়ে প'ড়ে চোখ উল্টে জিভ বের ক'রে সে মরার অভিনয় করলে। অদ্ভুত ছেলে—পথে মৃত্যু-কল্পনা ক'রে হাসছে। অকৃত্রিম স্বচ্ছন্দ হাসি!

সব চুপ হয়ে গেল ছেলেটির কথায়।

ছেলেটিই বললে—শোনেন মা ঠাকরণ, গানটা শোনেন। উড়ো জাহাজের গান। দেখেছেন তো উড়ো জাহাজ? তা দেখবেন বইকি! আপনারা তো সায়েব-মামেদের (মেমেদের) সমতুল্য লোক। আর কলকাতার আকাশে তো বিরাম নাইরে বাবা।—তা শোনেন—গান শোনেন।

ডুবকী যন্ত্রটি বাঁ হাতের অভাবে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধ'রে—ডান হাতে বাজিয়ে গান ধরলে।—

"গাড়ী কত বড় কে জানে,
গাড়ী উড়ছে আসমানে!
সর্ব্বনেশে বোমা না কি
আছে প্যাটের (পেটের) মাঝখানে।
গাড়ীর চল্লিশ হাত ডানা,
ড্রাইবর আছে তিন জনা,
কলকব্জা কত আছে—যার নাকো জানা।
আবার, ইঞ্জিন বাবু চালু ক'রে
'দুরবী' (দুরবীন) লাগায় নয়নে।
কলকাতার সব মোটা-গেরস্ত
বোমার ভয়ে পালাতে ব্যস্ত,
গরীব লোকের মরণ হায় রে—নাইক অন্ন, নাইক রে বস্ত্র।

তার ওপরে ঘর গিয়েছে,—পথেই মরণ 'নেকনে'।

(অদৃষ্টের লিখনে)

আবার জাপানীরা এসে, বলে,

মেরে দেবে পরাণে।

নীলা বললে—গানটা আমি লিখে নেব।

দেবপ্রসাদের চোখ ভ'রে জল এসেছে।

ভিতর থেকে মা হাঁকলেন—নীলা, নটা যে বাজে!

দেবপ্রসাদ বললেন—তুই যা মা, আমি লিখে রাখছি গানটা।

নীলার বাবা দেবপ্রসাদ সেন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। ব্যবসায়ে আইন-জীবী,—উকীল। দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পাস ক'রে আইন প'ড়ে উকীল হয়েছিলেন। ওখানেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে। তাঁর জীবনে আইনবুদ্ধি এবং আদর্শবোধের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র এমন ভাবে উঁকি মারে যে, দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজীবন লেগেই রইল; দুই বাড়ীর পার্টিশন-সুটের মত চলেছেই, আপোসও হ'ল না, কোন পক্ষ হারলও না। এক্ষেত্রেও একবস্ত্রপরিহিত নলদময়ন্তীর মত ব্যবসায়বুদ্ধি ও আদর্শবোধের মধ্যে যদি দর্শনশাস্ত্র কলির মত ছুরি দিয়ে কাপড়খানা দুভাগ করতে সাহায্য করত—তাতেও দেবপ্রসাদ উপকৃত হতেন, এস্-সি তা না ক'রে তাঁর দর্শনজ্ঞান জীবনে ঝগড়ার গুরু ভগবদ্ভক্ত নারদমুনির অভিনয় ক'রে গেল। ওকালতীতে তাঁর জীবনের কোন বিকাশই হ'ল না। অথচ শক্তি যে তাঁর ছিল না এমন নয়। জীবনে আপনী আদর্শ-নিষ্ঠাই তার প্রমাণ। তবুও এর পূর্ব্বে যে উপার্জ্জন তাঁর ছিল—তাতেই তাঁর বেশ চলেছে। ছেলেকে এবং মেয়েকে তিনি সমান শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন। ছেলে অমর এম্-এ পাস করে বি-সি-এস্ থেকে আরম্ভ করে নানা চাকরীর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিয়েছিল পঞ্চাশ

টাকা মাইনেতে স্কুল-মাস্টারি। যুদ্ধের প্রথমে স্কুলগুলির দুরবস্থায় তার সে মাইনেও কমে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশে।

বর্ত্তমানে তাঁর নিজের উপার্জ্জনেরও অনুরূপ অবস্থা। বিশেষ ক'রে কয়েক মাস থেকে সাধারণ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে এসেছে যে, ধর্ম্মাধিকরণের মারফতে আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা প্রাপ্য আদায় করবার জন্য যেটুকু প্রাথমিক খরচের প্রয়োজন, তাও তাদের জোটে না। কয়েকজন বাড়ীওয়ালা মক্কেল তাঁর আছে। তাদের বাড়ীভাড়া আদায় বা ভাড়াটে বিতাড়নের মামলা প্রায় লেগেই থাকত। কিন্তু ইভাকুয়েশনের হিড়িকে কলকাতায় বাড়ীওয়ালারা বাড়ী ভাড়া আদায়ের জন্য মামলা করা দূরে থাক, ভাড়াটেদের কড়া তাগাদা পর্য্যন্ত করে না।

তার জন্য অবশ্য দেবপ্রসাদ দুঃখিত নন; কারণ কোনও দিনই তিনি অন্যায় মামলা-মোকদ্দমার পোষকতা করেন না। এমন কি, মোকদ্দমা নিয়ে পরিচালনার মাঝখানে মক্কেলের দুরভিসন্ধি বা মিথ্যাচারের পরিচয় পেয়ে বহুবার ওকালতনামা ছেড়ে দিয়েছেন। এতদিন উপার্জ্জনের জন্য তিনি কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি, কিন্তু বর্ত্তমানে দুঃখ—তিনি সংসারের পরিজনবর্গের মুখে একান্ত প্রয়োজনীয় টুকুও তুলে দিতে পারছেন না।

সংসারের চালচলন তাঁর চিরদিনই মোটামুটি ধরনের। কেবলমাত্র ছেলেমেয়ের শিক্ষার বিষয়ে তিনি ছিলেন অকৃপণ। বড় ছেলে এম্-এ পাস করেছে। মেয়ে নীলাকে তিনি শিক্ষায় বাধা দেন নি। এ পড়ানোর মধ্যে তাঁর পদস্থ জামাই-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এইটুকু তিনি ভেবেছিলেন যে, মধ্যবিত্ত জীবনে নীলাও যদি তার আপন সংসারে উপার্জ্জন করতে পারে তবে নীলার সংসার অভাবের দুঃখ থেকে অনেকাংশে ত্রাণ পাবে। কলকাতায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের দিকে

তাকিয়ে আশ্বাসভরে তিনি কল্পনা করতেন—স্বামীকে খাইয়ে আপিস পাঠিয়ে নীলাও চলেছে কোন নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষয়িত্রীর কাজে। শিক্ষয়িত্রী ছাড়া অন্য কোন চাকরী তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে ভাল মেনে পারতেন না। কিন্তু এই যুদ্ধের বিপর্যয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্ট দেখে গোপনে দরখাস্ত করে চাকরী সংগ্রহ করবার পর যখন এসে বলে আগমন—বাবা, আমি চাকরী নিয়েছি,—সেদিনই তিনি গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তবু মুখে কিছু বলেন নাই। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন—স্বল্প শিক্ষিতা মেয়ে নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদে প্রসাধন ইত্যাদির রুচিতে অভ্যস্ত হয়েছে—তার সংস্থানের জন্যই সে এই পথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু নীলা প্রথম মাসের শেষেই ট্রামের টিকিট এবং চা-জলখাবারের দরুন মাত্র পনেরটি টাকা বাদে মাইনের সমস্ত টাকাটাই তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করেছে।

দেবপ্রসাদ অত্যন্ত শান্ত স্থির প্রকৃতির লোক। ধৈর্য্য তাঁর এত দৃঢ় যে, তাঁর বড়ছেলে ও নীলার মধ্যবর্ত্তী দুটি সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁর চোখে জল আসে নি; কিন্তু নীলার মাইনের টাকা হাতে নিতেই তাঁর চোখে জল এসেছিল।

জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোট ছেলে নেপী। আই-এস্-সি পাস ক'রে সে বি-এস্-সি পড়ছে, কিন্তু সে নামেই; দিনরাত সে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কিছুদিন থেকে সে প্রায় বাড়ীই আসে না। দেবপ্রসাদ তাকে এক মাস চোখেই দেখতে পান না। গভীর রাত্রে আসে—মৃদুস্বরে নীলাকে ডাকে। শেষ যেদিন তিনি তাকে দেখেছিলেন—সেদিন তাঁর ঘুম ভেঙেছিল ওই ডাকে। ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি পারেন নি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—বেরিয়ে যা বলছি—বেরিয়ে যা। খবরদার নীলা, বারণ করছি আমি, দরজা খুলে দিবি নে।

টা দরজা খুলতে গিয়ে নীলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মা নেমে এসে-সে ন, তিনিও দরজা খুলতে সাহস করেন নি। পিছন পিছন দেব-দও নেমে এসেছিলেন। নেপী অদ্ভুত। নেপী তখন মৃদুস্বরে কয়েকে ডেকে বলেছিল, দরজা খুলতে হবে না, জানালার ফাঁক দিয়ে এসেছে াত দাও। বারান্দায় বসে খেয়ে নিই। বড্ড খিদে পেয়েছে। প্রো' দেবপ্রসাদ নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলেছিলেন ে—আজ তোমায় আমি মার্জ্জনা করলাম, কিন্তু এমনভাবে যদি ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে থাকে, তবে এ বাড়ীতে আর এস না। আজ দু'সপ্তাহ ধ'রে নেপী প্রায় নিরুদ্দেশ। মধ্যে নাকি একদিন সে এসেছিল—কিন্তু দেবপ্রসাদ তাকে চোখে দেখেন নি। নীলাও না-কি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিশেছে! তিনি কি করবেন ভেবে পান না। শিক্ষার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। নীলার সে চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকলে তিনি তাকে নিবৃত্ত করবেন কি ক'রে? পারতেন—একটা উপায় ছিল। জীবনে শান্তিপূর্ণ একখানি নীড়ের সংস্থান যদি তিনি নীলার জন্যে ক'রে দিতে পারতেন—তবে নীড়ের প্রতি নারীর চিরন্তন মো আনন্দে নীলা রাষ্ট্রের কথা, পৃথিবীর কথা হয়তো ভুলতে পারত। কিন্তু তাও তিনি পারেন নি। দেবপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই সময়েই নীলা বেরিয়ে এল,—স্নান ক'রে খেয়ে সে আপিসে যাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে সে বললে, অত্যন্ত মৃদুস্বরে—আজ নেপী আসবে বাবা।

(ছয়)

কানাই এসে দাঁড়াল তার ছাত্রের বাড়ীর ফটকের সামনে। দাঁড়াল কতকটা আকস্মিক ভাবে। যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা ঘড়িতে গানের গতের মত বাজনা বাজছে। সওয়া আটটা। কলেজ স্কোয়ারে সে আটটা বাজতে দেখে এসেছে।

বড়লোকের বাড়ীর এই ঘড়িটি প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর বাজে। দামী ঘড়ি। কানাইয়ের মনে হ'ল, আজ আর ভাগ্যকে না মেনে উপায় নাই। ভাগ্য অর্থে অবশ্যই দুর্ভাগ্য!

কানাইয়ের ঠাকুমা মেজগিন্নী যখন অমাবস্যা বা পূর্ণিমার আগমন-সম্ভাবনায় বাতবৃদ্ধির আশঙ্কায় অধীর হন—তখন কানাই হাসে, বলে—আকাশে অমাবস্যা লাগল—তার সঙ্গে তোমার পায়ের সম্বন্ধ কি? পা তো থাকে মাটিতে। মোট কথা, গ্রহপ্রভাব বা ভাগ্যকে কানাই স্বীকার করে না, সে বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু আজ এই নীলার সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে সে দুর্ভাগ্য ব'লে মনে না ক'রে পারলে না, কারণ এর ফলে খানিকটা দুর্ভোগ যে অবশ্যম্ভাবী—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সে ছাত্রের বাড়ী ঢুকল। নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে অন্তত এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে প্রথম মনে করেছিল আজ আর সে ছাত্রের বাড়ী যাবেই না; কিন্তু মায়ের সেই কুণ্ঠিত মৃদুস্বরের 'ভাঁড়ারের সব জিনিস ফুরিয়েছে বাবা'—কথা কয়েকটি তাকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। মাইনের টাকাটা আজ তার চাই। মায়ের তাগিদ ছাড়া আরও একটি গোপন তাগিদ এই মুহূর্ত্তে তার মনে জেগে উঠেছে। কাল অথবা পরশু নীলাকে কফি খাওয়াবে সে।

নতুন বড়লোক। হাল ফ্যাশানের প্রকাণ্ড ঝকঝকে বাড়ী, মার্বেলে মোড়া মেঝে, অত্যন্ত শৌখিন মার্কিনী ফ্যাশনের স্টেয়ার-কেস, বিচিত্র কারুকার্য্য করা কংক্রীট সিলিং, বহুমূল্য এবং বহুবিধ আসবাব, খানকয়েক মোটর, কুকুর, মায় বাড়ীর সামনে খানিকটা লন নিয়ে সে এক আভিজাত্যের আসর। বাড়ীর কর্ত্তা—তিনিই কৃতীপুরুষ,—কাঠের ব্যবসা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে তেঁতুল, তুলো, অভ্র, লোহা প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুর কেনা-বেচা ব্যবসায়ের রস সংগ্রহ ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন

ইঁট-কাঠ-লোহা ও সম্পদের এই তিলোত্তমা। বাড়ীর নাম সত্য সত্যই তিলোত্তমা। ফটকের গায়ে একদিকে মার্বেল ফলকে কালো অক্ষরে অন্যদিকে কাচের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা তিলোত্তমা—কাচের নীচে ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা আছে, রাত্রে ঐ বাল্বের আলোর ছটায় সোনালী লেখা অগ্নির অক্ষরের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

বারান্দার সামনে থাকবন্দী বালির বস্তা। মধ্যে একটি সরু রাস্তা। কানাই সেই রাস্তা ধ'রে পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। ঘরের দরজা-জানালার মুখেও বালির বস্তা; ইলেকট্রিক আলোগুলোকে ঢেকে আলোক নিয়ন্ত্রণের চমৎকার ঢাকনি। চারিদিকে শো-কেসের মত নক্সাদার আলমারীগুলোর কাচে বিচিত্র ছাঁদে কাপড়ের ফালি লাগানো। তারই মধ্যে দিয়ে ঝকঝকে বাঁধানো রাশি রাশি বিলিতী বই। অধিকাংশই ইংরেজী, বিদেশী পাবলিশার কোম্পানীর পাবলিকেশন—Encyclopaedia, Book of Knowledge থেকে আরম্ভ ক'রে অতি-আধুনিক কবিতা-সংগ্রহ পর্য্যন্ত সব রকমই আছে। কানাই প্রথম দিন এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত বড় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে যাঁরা মানুষ—তাঁদের বাড়ীর ছেলেকে কেমন ক'রে পড়াবে সেই চিন্তায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আলমারীর এক প্রান্ত থেকে বইগুলোর নামের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে মধ্যস্থলে এসে সে তালা ধরে দাঁড়িয়ে চাবির ছিদ্রের উপরের ঢাকনিটা আঙুল দিয়ে ঠেলেছিল, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই ঠেলেছিল; কিন্তু সেটা কিছুতেই একতিল সরে নি বা নড়ে নি। বিস্মিত হয়ে তালাটার দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাসিও পেয়েছিল; তালাটায় মরচে প'ড়ে জাম্ ধ'রে গেছে। শুধু একটায় নয়—সব তালাগুলোরই এক অবস্থা।

কানাই পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। ছাত্র অনুপস্থিত। অবশ্য তার

পরীক্ষা হয়ে গেছে, পড়াশুনার তাগিদ খুব নেই। তবু কর্ত্তা সেটা পছন্দ করেন না। এ ছেলেটিকে তিনি বিষয়ী করতে চান না, একে তিনি একজন মনীষী ক'রে তুলতে চান। প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড পণ্ডিত—দেশময় হবে তার খ্যাতি; লোকে বলবে—রত্ন। তাঁর বড়ছেলে দুটি অবশ্য মূর্খ নয়, বেশ ইংরেজী বলে এবং লেখে; তারপর কৃতিত্বের কষ্টিপাথরের 'কষটে' তারা খাদ সত্ত্বেও বাজারে খাঁটি সোনার কদরই পেয়েছে; এবার কর্ত্তা ওই সোনার উপরে এই ছেলেটিকে কেটে কুটে ঘষেমেজে একেবারে একখানি কহিনূরের মত বসাতে চান। তাই তার ঘষা-মাজার বিরাম তিনি পছন্দ করেন না। অঙ্ক, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস এবং অপর বিদ্যা এইভাবে ভাগ ক'রে চারজন মাস্টার চার ঘণ্টা পড়িয়ে থাকেন। তবে ছেলেটিকে কানাইয়ের ভাল লাগে; সচ্ছলতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে, তবু ছেলেটির সর্ব্বদেহে মেদময় লালিত্যের পরিবর্ত্তে সবল পেশীদৃঢ়-স্বাস্থ্যের পৌরুষময় রূপ ক্রমশ ফুটে উঠছে। চঞ্চল দুরন্তপনায় অধীর হ'লেও ভদ্র, সাধারণ শ্রেণীর মেধা হ'লেও জানবার আগ্রহ তার প্রবল। ব্যঙ্গভরা বক্রদৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা কানাইয়ের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তবুও যাদের দেখলে তার বক্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহজ, সরল এবং কোমল হয়ে আসে—ওই ছেলেটি তাদের মধ্যে একজন। ছেলেটি তাদের বাড়ী কয়েকবার গেছে। সুখময় চক্রবর্ত্তীর ঐশ্বর্য্য-দেবতার শূন্য ভাঙা দেউল দেখে সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আজও সে তাকে মাইনের টাকা হাতে তুলে দিতে পারে না। মাসের শেষে তার বাপের মনোগ্রাম করা খাম একখানি হাতে দিয়ে বলে—সার্, এই চিঠিখানা! কানাই এখন আর প্রশ্ন করে না, খামখানা সযত্নে পকেটে রাখে। প্রথমবার একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—চিঠি?

মাথা নীচু ক'রেই ছাত্র অশোক উত্তর দিয়েছিল—বাবা দিয়েছেন।

ব'লেই সে বাড়ীর ভেতর চ'লে গিয়েছিল। কানাই খামখানা খুলে—পেয়েছিল নূতন দশ টাকার নোট তিনখানা।

কর্ত্তা স্বয়ং দেখা ক'রে বলেছিলেন—মাস্টার মশাই, এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আপনি সুখময় চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের প্রপৌত্র! এ কথা বলা আপনার উচিত ছিল।

একটা কঠিন ব্যঙ্গভরা উত্তর কানাইয়ের জিভের ডগায় খেলে গিয়েছিল। কিন্তু সে আপনাকে সংযত ক'রে হাসিমুখে সবিনয়েই উত্তর দিয়েছিল—পরিচয় জানাবার তো কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নি!

কর্ত্তা মোহগ্রস্তের মত শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে অতীত কালকে স্মরণ ক'রে বলেছিলেন—মাষ্টার মশাই, তখন আপনারা জন্মান নি, আমরাই তখন ছেলেমানুষ; সুখময় চক্রবর্ত্তীর ছেলেদের—মানে আপনার পিতামহদের—জুড়ী যখন রাস্তায় বের হ'ত, তখন রাস্তার দু'ধারের লোক চেয়ে দেখত। তার পরই তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—রঘুপতির কোশলনগরী—যদুপতির মথুরাই সংসারে বিলুপ্ত হয়ে গেল—আমরা তো সামান্য মানুষ!

কানাই এ কথার কোন জবাব দেয় নি; সে বুঝতে পারে নি কর্ত্তার ওই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির অন্তরালে কোন্ ভাবনা খেলা করছিল; বিলুপ্ত অতীতের প্রতি মমতা অথবা ভাবীকালে বর্ত্তমানের বিলুপ্তির অবশ্যম্ভাবী বিয়োগান্ত পরিণতি! কয়েক মুহূর্ত্ত পর কর্ত্তার মুখের পেশীগুলি দৃঢ় হয়ে উঠেছিল—ঈষৎ দীপ্ত দৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন—আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে ট্রাস্ট ক'রে দিয়ে যাচ্ছি, সম্পত্তি ভাগ হবে না, কারও বেচার অধিকার থাকবে না। যারা কাজ করবে, ট্রাস্টের জন্যে তারাই অ্যালাউন্স পাবে।

কানাই একটু হেসেছিল। কালের ধ্বংস-শক্তিকে তিনি বিষয়-বুদ্ধির জালে আবদ্ধ করে পঙ্গু ক'রে ফেলতে চান।

একা ঘরে ব'সে সমস্ত কথাই তার মনের মধ্যে ভেসে গেল পরের পর। কর্ত্তা তখন যুদ্ধের কথা ভাবেন নি। ভাবলেও ভেবেছিলেন ১৯১৪ সালের যুদ্ধের কথা, অর্থাৎ ভেবেছিলেন শুধু লাভেরই কথা; ব্ল্যাকআউট, সাইরেন, শত্রুপক্ষের বোমারু প্লেন, রিট্রিট, ইভাকুয়েশন এসব কথা ভাবেন নি। এখন ভাবেন কি না কানাই জানে না, তবে তার সন্দেহ হয়, কারণ তিনি এই যুদ্ধের বাজারে নূতন নূতন ব্যবসা খুলে চলেছেন, সম্প্রতি ফেঁদেছেন ধান-চালের ব্যবসা—প্রকাণ্ড কয়েকটি গুদামে রাশি রাশি চাল মজুদ করেছেন। শুধু চাল নয়—আটা চিনিও আছে। কথাটা কানাইকে বলেছে তার ছাত্রটি।

হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন ক'রে দিয়ে একটা চাকর এসে তাকে বললে—কর্ত্তা আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

কানাই বুঝলে, বিলম্বের জন্য তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সমস্ত মন তার মুহূর্ত্তে অগ্নিচ্ছটা-স্পর্শে শাণিত অস্ত্রের মত হিংস্রতায় ঝকমক ক'রে উঠল। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল, বললে—চল।

কর্ত্তার ঘরের আসবাব দু'ধরনের, একদিকে বিলিতী কায়দায়,—সোফা, কৌচ, টেব্‌ল, পেগ্‌-টেব্‌ল, সমস্তই সাহেববাড়ীর কারখানায় তৈরী প্রথম শ্রেণীর জিনিস; অন্যদিকে ফরাস।

ফরাস অবশ্য সনাতন ফরাস নয়; 'ডায়াস' ধরণের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান—দু-তিনজনের বসবার উপযুক্ত চারখানা চৌকী, টেবিল ঘিরে চেয়ার বা কৌচ-সোফা সাজানোর ভঙ্গিতে সাজানো; প্রতিটি চৌকীর মাপের তোষক—তার উপর গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ রঙের চাদর বিছিয়ে ফরাস করা হয়েছে, ফরাসের উপর ওই হলুদ রঙের কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া

সারি সারি তাকিয়া, প্রত্যেক চৌকীটির পাশেই দু-তিনটি ক'রে ছোট সুদৃশ্য জলচৌকার মত চৌকী, চৌকীর উপর সুদৃশ্য পাথরবাটি এবং শ্বেতপাথরের গেলাস সাজানো। পাথরবাটিগুলি অ্যাশ-ট্রে এবং গেলাসগুলি ফুলদানীর স্থলে অভিষিক্ত হয়েছে। এদিকের দেওয়ালে বাঙলার বিখ্যাত চিত্রকরের হাতের পটশিল্প-অঙ্কন-পদ্ধতিতে আঁকা কয়েকখানি ছবি। কৌচ-সোফার দিকটার দেওয়ালে বিলিতী চিত্রকরের আঁকা ছবি।

একটা ফরাসের উপরে কর্ত্তা কানে রেডিওর হেড্‌ফোন লাগিয়ে ব'সে আলবোলা টানছিলেন; বোধ হয় কোন বৈদেশিক বেতারবার্ত্তা শুনছিলেন—বার্লিন, রোম, ভিসি, টোকিও, সাইগনের প্রচারের সময় এখন নয়—হয়তো ফিলাডেল্‌ফিয়া, কালিফোর্নিয়া,—তাও যদি না হয়, তবে কোন অজ্ঞাত দেশের বেতারবার্ত্তা। বাইরে কোন শব্দ যাতে না হয় তাই ওই হেড্‌ফোনের ব্যবস্থা। রেডিও-যন্ত্র একটা নয়, দু'টো; একটাতে শোনা হয় ভারতীয় বেতারবার্ত্তা, অন্যটায় বৈদেশিক। স্মিতহাস্যে আহ্বান ক'রে বললেন—Congratulations মাস্টার মশাই! আসুন—বসুন।

কানাইয়ের ছাত্র অশোক এবার পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে; কিন্তু অঙ্কে ব্রাকেটে ফার্স্ট হয়েছে, একশোর মধ্যে নব্বই নম্বর পেয়েছ।

কানাই সত্যিই খুশী হ'ল। সে হেসে বললে—অশোক কই?

—আপনার কাছে যায় নি সে?

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ, সকালবেলাই সে আপনার কাছে গেছে।

—আমি ভোরবেলাতেই বেরিয়েছি। পথে একটা কাজে হঠাৎ আটকে গিয়েছিলাম।

—তা হ'লে সে এক্ষুনি ফিরবে। বসুন। একটু গল্প করা যাক্।

ব'লেই তিনি ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গেই এসে দাঁড়াল। কর্ত্তা বললেন—দু' কাপ চা নিয়ে আয়। আর মাস্টার মশাইয়ের জন্যে কিছু খাবার।

—না, না, খাবার এখন আর খেতে পারব না আমি। শুধু চা।

কর্ত্তা বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না, সে হবে না। আজ আপনাকে মিষ্টিমুখ করতেই হবে। তাছাড়া, খেয়ে, আপনাকে বলতে হবে—জিনিসটা কি এবং কোথাকার তৈরী! কর্ত্তা হাসতে লাগলেন। কিন্তু কানাই কিছু বলবার আগেই তিনি নিজেই বললেন—একালে অবিশ্যি কলকাতার মিষ্টির চাপে মফস্বলের ভাল জিনিস প্রায় ম'রেই গেল; কিন্তু সেকালে কান্দীর মনোহরা, জনাইয়ের মনোহরা, গুপ্তিপাড়ার নলেন গুড়ের সন্দেশ, মানকরের কদমা, তুব রাজপুরের ফেনী—বিখ্যাত জিনিস ছিল। এ হ'ল আপনার কান্দীর মনোহরা!

জিনিসটা সত্যই ভাল। কানাই বললে—জনাইয়ের মনোহরা আমি খেয়েছি, আমার এক পিসিমার বাড়ী জনাই। এ মনোহরা জনাইয়ের মনোহরার চেয়ে ভাল। তবে ওপরের চিনির ছাউনিটা একটু বেশী শক্ত।

—চিনির ছাউনিটা শক্ত হ'লে ভেতরের ক্ষীরের পুরটা ভাল থাকে।

তার পরই কর্ত্তা বললেন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে—চিনি কিছু কিনে রাখবেন

কানাই তাঁর মুখের দিকে শুধু চাইলে, মুখে কোন প্রশ্ন করলে না।

—বাজারে আর চিনি পাওয়া যাবে না কয়েক দিনের মধ্যে। নলে কয়েকটা টান দিয়ে আবার বললেন—আটা, চাল—দর হু-হু ক'রে বাড়বে। এর মধ্যে কি কৌতুক আছে কে জানে, কর্ত্তা সকৌতুকে একটু হাসলেন।

কানাইও নিজেদের সামর্থ্যের কথা স্মরণ ক'রে একটু হাসলে।

কর্ত্তা বললেন—ব্যবসা করবেন মাস্টার মশাই ?

কানাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চকিতে গম্ভীর দৃষ্টিতে সে কর্ত্তার মুখের দিকে চাইলে।

আলবোলার নলে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে কর্ত্তা বললেন—আপনি সুখময় চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র, আপনি আজ তিরিশ টাকা মাইনেতে প্রাইভেট ট্যুইশনি করছেন। আমার বড় কষ্ট হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে গেছেন—'বাঙালীকে বাঙালী ছাড়া আর কে রক্ষা করিবে ?' আমাদের আপনাকে সাহায্য করা উচিত, তাছাড়া অশোক আপনাকে বড় ভালবাসে।

কানাইয়ের মনের মধ্যে জেগে উঠল তার মায়ের মুখ, অসুস্থ ভাইবোনদের ছবি, সুখময় চক্রবর্ত্তীর ভাঙা বাড়ী।

কর্ত্তা ব'লেই চলেছিলেন—আপনি ব্যবসা করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। মানে, ধারে মাল দেব,—চাল, চিনি, আটা। আজ চালের দর জানেন ? চৌদ্দ টাকা। কাল হয়তো ষোলয় উঠে যাবে। আজ কিনে যদি কাল বেচেন—তাও মণকরা দু'টাকা থাকবে আপনার। দৈনিক পঞ্চাশ মণ চাল যদি আপনি কেনা-বেচা করতে পারেন, তবে দৈনিক একশো টাকা, মাসে তিন হাজার,—বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা লাভ হবে আপনার।

কানাইয়ের শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল—তার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, হাতের তালু ঘামছে, চোখ দুটির দৃষ্টি স্থির উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে কল্পনানেত্রে দেখছিল—তার মায়ের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, পরনে পট্টবস্ত্র, দেহ তাঁর নশ্বর লাবণ্যে ভ'রে উঠেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি ; ভাইবোনদের পরনে উজ্জ্বল নূতন পরিচ্ছদ, চিকিৎসকের সূচীমুখে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত বিষামৃতের প্রভাবে বংশগত বিষ নষ্ট

হয়েছে—তাদের ধমনীতে বইছে পবিত্র সুস্থ রক্তস্রোত, রোগমুক্ত দেহকোষ; সুখময় চক্রবর্ত্তীর ভাঙা দেউল সুসংস্কৃত হয়ে বর্ণ-বৈচিত্র্যে ঝলমল করছে; কলকাতার রাজপথ দিয়ে চলেছে তার রথ,—মূল্যবান মোটর।

কর্ত্তা ব'লেই যাচ্ছিলেন—উত্তেজনায় তিনিও এবার উঠে বসলেন—বললেন—জানেন মাস্টার মশাই, আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম, তবে এই যুদ্ধের বাজারে কি লাভ যে হ'ত, সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করছে ইউরোপীয়ান কোম্পানী। চাবিকাঠি সব তাদের হাতে। অথচ যোগ্যতায় আমরা তাদের চেয়ে খাটো নই।

তারপর আবার বললেন—করুন, আপনি ব্যবসা করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কানাই এবার বললে—কাল আপনাকে বলব। ব'লে সে উত্তেজনাভরেই উঠে দাঁড়াল। মাইনের টাকাটা পর্য্যন্ত ভুলে গেল।

—দাঁড়ান। কর্ত্তা তাকিয়ার তলা থেকে একখানা খাম বের ক'রে তার হাতে দিলেন, বললেন—অশোক এটা আপনাকে প্রণামী দিয়েছে। একটু খানি হেসে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—অশোকের নামে একটা 'যুদ্ধের কণ্ট ার টা নিয়েছিলাম, তাতে এবার অশোক অনেক টাকা লাভ পেয়েছে। শ দড়ির জাল। ব'লে, কর্ত্তাও উঠে পড়লেন—বললেন—চলুন, বা র শ রাজমিস্ত্রী লেগেছে দেখে আসি।

একসঙ্গেই দুজনে বেরিয়ে এলেন।

কর্ত্তা আজ অতিমাত্রায় মুখর হয়ে উঠেছেন। হাসতে হাসতে বললেন—আপনি কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন মাস্টার মশাই।

কানাই তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

কর্ত্তা বিচক্ষণ বোদ্ধার মত এবার বললেন—আমার বংশে টাকা-আনা-পাই, মানে এরিথমেটিকের হিসেবটা সবাই বুঝতে পারে—ওটা

প্রায় আমাদের বংশগত বিদ্যে। কিন্তু জিওমেট্রি, অ্যালজাব্রা—এ দুটো হ'ল হাইআর ম্যাথেমেটিক্স। অশোক ওই দুটোতেই ফুলমার্ক পেয়েছে—দশ নম্বর তার কাটা গেছে এরিথমেটিকে।

অন্য দিন হ'লে হায়ার ম্যাথামেটিক্সের এই ব্যাখ্যা শুনে কানাইয়ের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে হাসতে পারলে না। মোহগ্রস্তের মতই সে পথ চলছিল। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। কর্ত্তা তাকে ব্যবসায়ে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বান তার জীবনাদর্শকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। কর্ত্তার পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে তার মা-বাপ-ভাই-বোন—গোটা সংসার।

বাড়ীর কম্পাউণ্ডের প্রান্তভাগে রাস্তার উপরে একসারি ঘর; ঘরগুলো বাড়ী তৈরীর সময় জিনিসপত্র রাখবার জন্য সাময়িক প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল—ইদানীং প'ড়েই ছিল, এখন তার সামনে Baffle Wall তৈরী হচ্ছে;

কর্ত্তা বললেন—Public Air Raid Shelter ক'রে দিচ্ছি সাকে।

একজন মিস্ত্রী সেলাম ক'রে একখানা কাগজ এনে সামনে ধ'রে বললে—বাবু দিলেন—এইটা দেওয়ালে লেখা হবে। চূণকাম ক'রে কালো হরফে থে দেব।

রোমান হরফে কাগজটায় লেখা ছিল—

PUBLIC AIR RAID SHELTER—PROVIDED BY RAI B. MUKHERJEE BAHADUR.

আর্টের মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্যবিধানটা যদি একটা বড় অঙ্গ হয়—তবে—বাইরের লেখাটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক অথবা হাস্যকর হয়েছে। কারণ পাবলিক এয়ার রেড শেল্টার ব'লে যে দুখানা কুঠরী

নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তার মাপ বোধ হয় দশ ফুট বাই বারো ফুটের বেশী নয়; আর লেখাটা লম্বায় মাপলে অন্তত পনের ফুট হবে।

এবার কানাই হাসলে। হেসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে খামখানা খুললে—খামের মধ্যে ছিল একখানা একশো টাকার নোট।

(সাত)

নোটখানা সে পথেই ভাঙিয়েছিল।

একজোড়া কাবুলী স্যাণ্ডেলের দাম নিলে সাড়ে আট টাকা। অবশ্য জিনিসটা ভাল। কাপড় এবং জামা কিনবারও তার ইচ্ছে ছিল—প্রয়োজনও আছে। কিন্তু কি ধরনের, কি রকমের, কত দামের কিনবে—মনস্থির করতে পারলে না। মিলের ধুতি আর তাঁতের কাপড়ের দামের তফাত আজকাল ক'মে গেছে; মিলের কাপড়ের দাম যে-পরিমাণে বেড়েছে তাঁতের কাপড়ের দাম সে রকম বাড়ে নি। ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আজকাল তাঁতের কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে। দশ টাকার জায়গায় বারো টাকা দিয়ে লজ্জা নিবারণের সঙ্গে অভিজাত শৌখিনতাও যেখানে মিটছে, সেখানে হিসেবের দুটো টাকা তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের কাছে। অন্য দিন হ'লে অবশ্য হিসেবের কথাটা কানাইয়ের মনে একবারও উঠত না, কিন্তু কর্ত্তার ওই ছত্রিশ হাজার টাকার হিসেব এবং নগদ একশো টাকা প্রাপ্তি তার মনেও রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। পথে চলতে চলতে তার মনের দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসা সে প্রায় ক'রে ফেলেছে। কর্ত্তার আহ্বানেই সে সাড়া দেবে। জীবনের আদর্শবাদকে সে বিসর্জ্জনই দেবে; তার বাপ মা ভাই বোনদের—বিশেষ ক'রে তার মায়ের দুঃখ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে ব্যবসাতেই নামবে। তাই কাপড় কিনতে গিয়ে কি কাপড় কিনবে এটা একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেল তার কাছে। একবার

এও ভেবেছে, কাপড় না কিনে অল্প দামের স্যুট কেনাই বোধ হয় উচিত। ব্যবসা করতেই যখন নামবে, তখন স্যুট তো দরকার হবেই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত মারোয়াড়ী এবং বাঙালী চাল-ক'রের কারবারীর কথাও তার মনে হয়েছে; হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়, গায়ে বেনিয়ান, গলায় চাদর অথবা মাথায় পাগড়ী। এই দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে নিজের কাপড়-জামা তার কেনা হয় নি, মায়ের জন্যে একজোড়া লালপেড়ে শাড়ী ও দুটো শেমিজ কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

মা যেন তার জন্য প্রতীক্ষা ক'রেই ছিলেন। কাপড়-শেমিজ এবং পঞ্চাশটি টাকা সে মায়ের হাতে তুলে দিলে। কাপড়-শেমিজ রেখে নোট ক'খানি গুনে দেখে মা তার মুখের দিকে চাইলেন। কানাই প্রশ্ন করলে—এখুনি বাজারে যেতে বলছ?

মৃদুস্বরে মা বললেন—না, বেলায় গেলই হবে।

—তাই যাব।

তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কানাই প্রশ্ন করলে—আর কিছু বলছ?

মা তার দিকে চেয়ে বললেন—আর টাকা?

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—অশোক এসেছিল, সে যে ব'লে গেল, একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিস তুই?

সে বিস্মিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মা মাথা নীচু করলেন, কিন্তু হাতখানা প্রসারিত হয়েই রইল। কানাই কোন কথা না ব'লে পকেট শূন্য ক'রে বাকী নোট, টাকা এবং খুচরোগুলো তাঁর হাতে তুলে দিলে। মা আর গুনে দেখলেন না—নিয়ে চ'লে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে সে রইল। ছোট এই ঘটনাটিতে তার অন্তর যেন রী-রী ক'রে উঠল।

দরজার পাশ থেকে উঁকি মারলে একখানি মুখ। অপূর্ব্ব সুন্দর

মুখ। তার বোন উমা; চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে। উমার মত সুন্দরী মেয়ে এই কলকাতা শহরে—আভিজাত্যের লীলাভূমি এই মহানগরীতেও তার চোখে দুটি-চারটির বেশি পড়ে নি। সাহিত্যে কাব্যে পড়া যায়, রূপের প্রভায় ঘর আলো হয়ে ওঠে; অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে বলা যায় উমার সেই রূপ। ঘর আলো হয় না—কিন্তু ঘর অপূর্ব্ব একটি সুষমায় ভরে ওঠে; যেমন সুন্দর একখানি ছবি টাঙালে ঘরের দেওয়াল মণ্ডিত হয়ে ওঠে অপরূপ শ্রীতে এবং সৌন্দর্য্যে। উজ্জ্বল শুভ্র আয়ত দুটি চোখ —গাঢ় কালো দুটি চোখের তারা; সে চোখের দৃষ্টিতে সুধাসমুদ্রের মদিরতা। কানাইয়ের মন খারাপ হ'লেই উমাকে ডেকে তার সঙ্গে সে গল্প করে। উমাকে দেখে তার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে ডাকলে—উমা!

সলজ্জ হাসিমুখে—অকারণে কাপড়ের আঁচল টানতে টানতে উমা এসে ঘরে ঢুকল। তার কাপড় টানার ভঙ্গির মধ্যে কুণ্ঠার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে কানাইয়ের চোখে পড়ল, সে হাসিমুখেই প্রশ্ন করলে —কি সংবাদ?

—তোমার ছাত্র এসেছিল।

—অশোক?

—হ্যাঁ। সে এবার অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছে। তারপর বেশ একটু আদর জানিয়ে উমা বললে—আমাকে একজোড়া কাচের কঙ্কন দিতে হবে কিন্তু।

কানাই একটু হাসলে। উমা বললে—তুমি একশো টাকা পেয়েছ আজ। কানাই উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই এল চটি টানার শব্দ ঠিক দরজার ওপারে। এসে ঢুকলেন বাপ। বিনা ভূমিকায় বললেন—একশো টাকা পেলি তুই, দশ টাকা আমায় দে না।

কানাইয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল; টাকা নিয়ে তিনি কি করবেন সে

তা জানে। বহু কষ্টেই আত্মসংবরণ ক'রে সে উত্তর দিলে—সমস্ত টাকাই মাকে দিয়ে দিয়েছি। ব'লে উত্তেজনায় পকেট দুটো টেনে বের ক'রে আনলে।

বাপ চ'লে গেলেন।

উমা কখন এরই ফাঁকে বেরিয়ে গেছে সে তার খেয়াল হয় নি। উমার সন্ধানেই সে বের হ'ল। উমার প্রার্থনা তাকে পূর্ণ করতেই হবে। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোটখুড়ী—সুখময় চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্রবধূ। তাদেরই মত ধ্বংসোন্মুখ বিত্তশালীর ঘরের মেয়ে; বয়সে কানাইয়েরই সমবয়সী। ছোটখুড়ীর চোখে মুখে কথা, কথাগুলি ব্যাধের তূণের বাণের মত শাণিত। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই তিনি উপেক্ষা ক'রে চলেন,—তির্য্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপে, ঠোঁটের বাঁকানো ভঙ্গিতে, দ্রুত সশব্দ পদক্ষেপের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের দোলায় তাচ্ছিল্য যেন উপচিয়ে পড়ে। এ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবার মত রূপ আছে তাঁর, তার উপর এই রূপের প্রভাবে দুর্দ্দান্ত মদ্যপ স্বামীকে জয় ক'রে তিনি তাঁকে মদ ছাড়িয়ে একান্ত অনুগত জনে পরিণত ক'রে তুলেছেন। সুতরাং বিজয়িনীর মত চলাফের করবার অধিকারও তাঁর আছে। আজ তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—একদিন সিনেমা দেখাও কানু।

—বেশ তো।

—বেশ তো নয়, কবে দেখাচ্ছ বল ?

—আসছে সপ্তাহে।

অভ্যাসমত মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে এবার ছোটখুড়ী বললেন—একশো টাকার সুদ থেকে দেখাবে বুঝি ? ব'লে রেলিংয়ের ওপর বুক দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে প'ড়ে খেলার ছলেই বোধ করি থুথু ফেললেন।

কানাইয়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। জ্ঞাতিত্বের অপ্রীতি মেশানো ক্রূর আঘাত যেন বিষাক্ত শলাকার মত তাকে বিদ্ধ করলে। ছোটখুড়ী হাসতে

হাসতে আপনার ঘরের দিকে চ'লে গেলেন, গভীর স্নেহ প্রকাশ ক'রে ব'লে গেলেন—না—না। তোমায় ঠাট্টা করছিলাম বাবা। এক সপ্তাহের সুদ যেটা পাবে—পরের সপ্তাহে সেটাই তোমার আসলে দাঁড়াবে, তারও সুদ পাবে।

কানাই বাধা দিয়ে বলে—দাঁড়াও ছোটখুড়ী। তোমায় একটা প্রণাম করি।

ছোটখুড়ী ঘরে ঢুকে বললেন—থাক্ বাবা, এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি লক্ষপতি হও।

কানাইয়ের সর্ব্বশরীর জ্বালা ক'রে উঠল। মনের ক্ষোভ-মেটানো অত্যন্ত জ্বালাকর উত্তর খুঁজে না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। অকস্মাৎ পিছনে অত্যন্ত মৃদু চাপা হাসির শব্দ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেজকর্ত্তার পৌত্র, আঠারো বছরের শিশু-মানবটি উলঙ্গ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নগ্ন প্রতিবিম্ব দেখে মৃদু-গুঞ্জনে হাসছে! মাথার ভেতর তার যেন আগুন জ্ব'লে উঠল। কিন্তু তবু তাকে আত্মসংবরণ করতে হ'ল; মেজকর্ত্তার পরম যত্নে আদরে গ'ড়ে তোলা এই আঠারো বছরের শিশু-মানবটিকে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। অভ্রান্ত জ্যোতিষী কোষ্ঠী-গণনায় বলেছে—শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, ভাবীকালে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হবে। মেজগিন্নী ওকে দেবতার মত সেবা করেন। মেজকর্ত্তা নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাইয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখেন। ওর এই উলঙ্গ অশ্লীলতা—বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে দেবভাবের স্ফুরণের ভূমিকা। ঘৃণায় ক্রোধে তার সমস্ত অন্তর অধীর হয়ে উঠেছিল। আত্মসংযম হারাবার ভয়েই সে দ্রুতপদে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পেছন থেকে ডাকলেন মেজগিন্নী—কানু!

কানু ফিরে দাঁড়াল। বাতে কুঁজো হয়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন

মেজগিন্নী, ভাবলেশহীন মুখ, অকুণ্ঠিতভাবেই তিনি বললেন—আমায় দশটা টাকা ধার দিবি? একশো টাকা পেয়েছিস শুনলাম।

রূঢ়স্বরে কানু বললে—না। ব'লেই সে দ্রুততর গতিতে দোতলায় নেমে চ'লে গেল আপনার ঘরের দিকে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল যূথী, মেজকর্ত্তারই পৌত্রী—যে সুযোগ পেলেই পথে-ঘাটে গোপনে ভিক্ষে করে। ঘরের মধ্যে তার জামাটা মাটিতে প'ড়ে আছে, শুধু জামাটাই নয়, ট্রামের মান্থলি টিকিট—পকেটের কাগজপত্র সমস্ত ছড়িয়ে প'ড়ে আছে মেঝের ওপর। অত্যন্ত কটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল; যূথী গোপনে খুঁজতে এসেছিল তার পকেটে—ঐ একশো টাকা।

সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে;—সুখময় চক্রবর্ত্তী কি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বঞ্চনা ক'রে তাদের চরমতম মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত কুড়িয়েছিলেন?

তেতলা থেকে ভেসে এল মেজকর্ত্তার উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।—কালী-ঘাটের বস্তী বিক্রী ক'রে রেজেস্ট্রী আপিস থেকে বেরুলাম—পকেটে চেকে নগদে দেড় লক্ষ টাকা। রতনবাইয়ের বাড়ীতে সন্ধ্যে থেকে বারোটার মধ্যে দেড় হাজার টাকা পাররার পালখের মত ফুঁয়ে উড়ে গেল। বারোটার পর আমার জুড়ী আসছে চিৎপুর দিয়ে; শীতকাল—শালে ওভারকোটে শীত কাটে না। হঠাৎ নজরে পড়ল—একটা গ্যাস-পোস্টের ধারে একটা খোলার ঘরের বেশ্যা দাঁড়িয়ে শীতে হি-হি ক'রে কাঁপছে। ক্রমে দেখলাম, একজন নয়, সারি সারি। বাড়ী এসে ঘুম হ'ল না। পরের দিন রাত বারোটায় জুড়ী নিয়ে বেরুলাম—সঙ্গে একশোখানা আলোয়ান—সে আমলে একখানার দাম আট টাকা। পরের দিন গোটা কলকাতায় গুজব হ'ল—দিল্লীর বাদশার কোন্ এক বংশধর কলকাতায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।··একশো টাকা! আরে

রাম কহো! রামকৃষ্ণদেব ব'লে গেছেন—মাটি সোনা—সোনা মাটি! নারায়ণ! নারায়ণ! একশো টাকা—আরে ছি! ছি! ছি!

জানলার গরাদে ধ'রে শূন্য দৃষ্টিতে সে রাস্তার ওপরের বস্তীটার দিকে চেয়ে রইল। বেলা প্রায় বারোটা, বস্তীটা এখন স্তব্ধ; বেলা ন'টার মধ্যেই পুরুষেরা খেয়ে দেয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে। যে বাড়ীতে এখনও কাজকর্ম্মের জের চলছে, সেগুলির পুরুষেরা কর্ম্মহীন বেকার; বাড়ীতে তাদের খাবার আয়োজন এক বেলা—তাই খাবার সময়টাকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত ক'রে ওবেলার অন্নাভাবের কালটাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে নেওয়া হচ্ছে।

গীতাদের বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া আজ এরই মধ্যে হয়ে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে। গীতার বাপ ওই যে বারান্দায় রৌদ্রের আমেজে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছে, অন্যদিন এ সময় লুঙ্গী প'রে ব'সে বিড়ি টানে আর কাশে। গীতার মা ব'সে পান চিবুচ্ছেন—আর গল্প করছেন মোটা ঘটকীটার সঙ্গে। গীতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোঠার কাঠের রেলিংয়ে ভর দিয়ে। গীতাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। পরণে তার নতুন রঙীন কাপড়; মাথায় চুলের রাশি এলানো। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছে গীতা। বোধ হয় ঘটকী কোন সম্বন্ধ এনেছে। গীতার মা কয়েক জোড়া নতুন কাপড় রেখে বাকী কয়েক জোড়া ঘটকীকে ফেরত দিলে। তা হ'লে পাত্রটি নিশ্চয় কোন অবস্থাপন্ন হৃদয়বান তরুণ। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল—হয়তো কোন ধনী বৃদ্ধ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে গীতাকে বিবাহ করছে—কন্যার অভাবগ্রস্ত বাপ-মাকে ঘুষ দিয়ে বার্দ্ধক্যের অতৃপ্ত লালসা-ব্যাধি পরিতৃপ্তির জন্য।

পরক্ষণেই মনে হ'ল—তা হোক; তবু তো গীতা ভাল খেতে পরতে পারবে। গীতার মা-বাপের তো দুঃখের লাঘব হবে! স্বাচ্ছল্যের প্রসাদে দেহ তার পুষ্টিতে ভ'রে উঠুক, সেই পুষ্টিই তাকে মনের অসন্তোষ

সহ্য করবার—বহন করবার মত শক্তি দেবে। তারপর তার কোল জুড়ে আসবে সন্তান—সে-ই তখন তার সে অসন্তোষ নিঃশেষে মুছে দেবে। আর, যদি সে সন্তান তাদের মত ব্যাধিগ্রস্তের রক্ত বহন ক'রে অকালে মরে, তবে? পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, না, তার মধ্যেও গীতা আপনার একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কিন্তু সে কথা কল্পনা করতে তার মন চাইলে না। বার বার সে কামনা করলে—আশীর্ব্বাদ করলে—গীতার পবিত্র সতেজ রক্তধারার এবং দেহকোষের প্রসাদে তার সন্তান সকল ব্যাধির বিষকে জয় করবে। তা ছাড়া বিজ্ঞান তো ব্যতিক্রমের কথাও মানে; ব্যাধিগ্রস্তের বংশে সুস্থ সন্তান সম্ভব ব'লেও স্বীকার করে! তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

কিন্তু সে কি করবে? কি তার পথ? কিছুক্ষণ আগে পথে আসতে আসতে সে যা স্থির করেছিল—সে স্থিরতা আর তার নাই। সুখময় চক্রবর্ত্তীর বংশের ভাঙাবাড়ীর ইঁটগুলো—ওই নোনাধরা ইঁটগুলো পর্য্যন্ত ক্ষুধিত—শুধু ক্ষুধা নয়, তার অন্তরালে আছে যে ঘৃণ্য লোলুপতা—তাতেই তার স্থিরতার দৃঢ়তার ভিত্তি পর্য্যন্ত ন'ড়ে গেছে। ওই নোনাধরা ইঁটগুলো ঢাকতে পলেস্তার যতই খরচ সে করুক না কেন, সে আবার খ'সে পড়বে; তার নোনাধরা স্বরূপ আবার বেরিয়ে পড়বে।

(আট)

ব্লাক আউটের কলকাতা; শুক্ল পক্ষের প্রথম দিকের তিথির রাত্রি; চাঁদ ডুবে গেছে। একদিন মাটির বুকের এই মহানগরীটির আলোক-সমারোহের বিচ্ছুরিত ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ছটা আকাশমণ্ডলে যেন অভিযান করত; আজ শত্রুপক্ষের আকাশচারী বোমারুর শ্যেনদৃষ্টি হ'তে আত্ম-গোপনের জন্য তার সমস্ত আলো, আলোক-নিয়ন্ত্রণী আবরণে এমনভাবে আচ্ছন্ন করা হয়েছে যে, অন্ধকার জমাট বেঁধে শহরের বাড়ীগুলোর মাথায়

এবং রাস্তার বুকের উপর নেমে এসেছে। ট্রাম-বাস-মোটরের আলোক-রশ্মি দীপ্তিহীন প্রেতচক্ষের মত অন্ধকার রাস্তার মধ্য দিয়ে সশব্দে আসছে যাচ্ছে। বাস্-ট্রামের ভিতরে আবছা আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায়, চেনা যায় না; মনে হয় রূপহীন অবয়বের একটি দল চলেছে। রিক্সার যাত্রীদের দেখাই যায় না, নীচের কাগজঢাকা স্তিমিত আলো দুটি বিন্দুর মত ছুটে চ'লে যায়, নেহাৎ কাছে এলে দেখা যায় মানুষের দুটো পা শুধু উঠছে, পড়ছে—ছুটছে। ফুটপাতের ওপর মানুষ চলছে সন্তর্পিত গতিতে।

পথপার্শ্বের দোকানগুলির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু তার রশ্মি-ধারা বাইরের দিকে নিয়ন্ত্রণ-আবরণীতে প্রতিহত। মধ্যে মধ্যে বড় দোকানের উচ্চশক্তির ভাস্বর আলোর ছটা আবরণীকেও ভেদ ক'রে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত খানিকটা আভা ফেলেছে রাস্তার উপর। অন্ধকারের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য চলন্ত মানুষের দল এইখানে এসে কালো কালো মূর্ত্তির মত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠে আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কচিৎ কখনও ট্রামওয়ের তারে চলন্ত ট্রামের ট্রলির সংঘর্ষে বিদ্যুচ্চমকের মত একঝলক নীলাভ দীপ্তি ঝলকে উঠে অন্ধকারকে পরমুহূর্ত্তে গাঢ়তর ক'রে তুলছে। আর গর্জ্জন বুকে এরোপ্লেনের শব্দ উঠছে,—পাশাপাশি দুটি রঙীন উল্কাবিন্দুটের লাল নীল দুটি আলোকবিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে চ'লে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে কানাই নামল। সমস্ত অপরাহ্নবেলাটা সে কার্জন পার্কে ব'সে কাটিয়েছে। কর্ত্তার কথা ভেবেছে আর ভেবেছে তার বাড়ীর কথা। মাসে তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন! ভাবে—কালে তিন হাজার তিরিশ হাজারে উঠতে পারে। যুদ্ধ যদি চলে—! যুদ্ধ চলবে বৈকি! পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ—

আটলান্টিক হতে প্যাসিফিক পর্য্যন্ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে যুদ্ধের ব্যাপ্তি—সে কি হঠাৎ থেমে যাবে? ভূমিকম্প নয়, সাইক্লোন নয়, জলোচ্ছ্বাস নয় যে, অপ্রতিহত গতিতে প্রাকৃতিক বৈষম্যের উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হয়ে এলেই থেমে যাবে। যুদ্ধ মানুষের হাতে, যে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মানুষ এ যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে তার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ নিরস্ত হবে না। যে কৃত্রিম বৈষম্যের ফলে এ যুদ্ধ-সৃষ্টি মানুষ সম্ভব ক'রে তুলেছে, যুদ্ধের অপচয়ে সে বৈষম্য এক দিকে ক্ষয়িত হ'য়ে আসছে, কিন্তু মানুষ প্রাণপণে সে বৈষম্যকে পরিপূরিত ক'রে চলেছে। আর যদিই থামে তবে ভাবীকালের নবতর যুদ্ধের ভূমিকা রচনা ক'রে তবে সে থামবে। সুতরাং তিন বা তিরিশ হাজার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা কিছু নেই। পরক্ষণেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'তিন বা তিরিশ হাজার কতটুকু? মরুভূমির মত তাদের অভাবে বালুময় সংসারের তৃষ্ণার কাছে—তিন বা তিরিশ হাজার বিন্দু কতটুকু? মরুতৃষ্ণার মত যে তৃষ্ণা আজই সে প্রত্যক্ষ করেছে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার সে ভাবে আপন জীবন-স্বপ্নের কথা। একমাত্র স্বপ্ন, তার সমস্ত ছাত্র-জীবনের কল্পনা আকাঙ্ক্ষা, এম্-এস্-সি পাশ ক'রে বিজ্ঞানে গবেষণা করবে, একটা কিছু আবিষ্কার করবে! সমস্ত অন্তরটা তার টনটন ক'রে ওঠে। মনে হয় সম্পদের আরাধনা ক'রেই বা সে করবে কি? অভাব-দুঃখের বেদনা যত বড় যত তীব্রই হোক, সম্পদ-সঞ্চয়ের যে বিয়োগান্ত পরিণতির মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছে তাতে সে সম্পদ-সঞ্চয়কে ঘৃণা করে—ভয় করে; সম্পদ সঞ্চিত হ'লেই স্বভাবধর্ম্মে সে পচনশীল মিষ্টরসের মত ফেনায়িত মাদকরসে পরিণত হবেই। সুখময় চক্রবর্ত্তীর বংশের দন্তহীন মুখের কদর্য্য লোলুপ যে গ্রাস-বিস্তার সে দেখেছে—তাতে সম্পদের ওপর তার

বিতৃষ্ণা জ'ন্মে গেছে। তা ছাড়া, তার জীবনের আদর্শ, যে আদর্শে সে দীক্ষা নিয়েছে, তাকে এ পথ তার পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব! সমস্ত দিনটা বাড়ীতে ব'সে ভেবে কিছু স্থির করতে পারে নি। বিকেলে গিয়ে প্রথমে সার্ আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল সে। ইচ্ছে ছিল, নীলার ছুটি হ'লে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার পরামর্শ নেবে। কিন্তু নীলা বেরিয়ে এল আরও কয়েকটি সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে। কানাই কেমন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে, তার ইচ্ছে হ'ল না ওদের মধ্য থেকে নীলাকে স্বতন্ত্র ডাকতে; মনে হ'ল—সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গসুখতৃপ্তা হাস্যপরিহাসমুখরা নীলার—কানাইয়ের কথা শুনবার মত মন কোথায়? তার সমস্যার উত্তর সে কেমন ক'রে দেবে? জনস্রোতের মধ্যে মিশে, নীলার চোখ এড়িয়ে এসে সে বসল কার্জন পার্কে।

সেখানে ব'সে এতক্ষণ কাটিয়ে সে ফিরছে।

ট্রাম থেকে নেমে গলি রাস্তা। গলির মধ্যে অন্ধকার গাঢ়, তিনটে গ্যাসপোস্টের ঠুঙিপরানো আলোর আভাস শুধু শূন্যলোকে ভাসছে। জনবিরল পথ। শীতের রাতে দুধারে বাড়ীর জানালা-দরজা বন্ধ। গলির মোড়ে বড় রাস্তার পাশে হঠাৎ প্রায় তার সামনেই গর্জ্জন ক'রে উঠল একটা মোটর। পরক্ষণেই জ্ব'লে উঠল ব্ল্যাক-আউটের ঠুঙি পরানো হেড-লাইট। গাড়ীটা এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল—স্টার্ট দিলে। কানাই চমকে উঠেছিল প্রথমটা। পরক্ষণেই সে বিস্মিত হ'ল। গাড়ীখানা বেরিয়ে যেতেই নজরে পড়ল—পেছনের নম্বরটা। অত্যন্ত পরিচিত নম্বর। তার ছাত্র অশোকদের গাড়ীর নম্বর বোধ হয়। গাড়ীখানাও ঠিক তেমনি—ওদের ছোট গাড়ীখানার মত অবিকল একরকম। সে এসে দাঁড়াল আপনাদের বাড়ীর প্রকাণ্ড গাড়ীবারান্দাটার মধ্যে।

—কে? কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল আবছায়ার মত।

—আমি নেপী। সতের-আঠারো বছরের ছেলেটি এগিয়ে এল।

—কি, নেপী? এমন সময়?

—কাল জনসেবা-কমিটির মিটিং, আপনাকে যেতেই হবে। বলতে এসেছি আমি। আমাদের ছেলেদের অনেক কম্‌প্লেন আছে—আপনাকে আমাদের হয়ে বলতে হবে।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কানাইয়ের মুখে—ব্যঙ্গের নয়, স্নেহের হাসি। নেপীকে সে বড় ভালবাসে। নীলার পাগল-ভাই নেপী! নেপী পৃথিবীর মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। দিন নাই—রাত্রি নাই, আহার নাই—নিদ্রা নাই, প্যাম্ফ্‌লেট বগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিলি করছে, দেওয়ালে আঁটছে, বুভুক্ষুর দলকে ডেকে ডেকে মিছিল করছে, সমস্ত অন্তর ফাটিয়ে চীৎকার করছে—মানুষের জন্য রুটি চাই, ভাত চাই। তার জন্য আপনার সাধনার দীর্ঘজীবন কামনা করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

নেপী অনুনয় ক'রে বললে—আপনাকে যেতেই হবে কানুদা।

—যাব। কিন্তু, কিছু খেয়েছিস্ তুই? মনে পড়ল নীলার মুখে শোনা নেপীর দৈনন্দিন জীবনের কথা।

—না। এই বাড়ী যাচ্ছি। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও তার হৃষ্ট কণ্ঠস্বরে কানাই অনুমান করলে কথা বলতে গিয়ে নেপীর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। কানাই বললে—দাঁড়া। সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল। সুখময় চক্রবর্ত্তীর পুরী অন্ধকার। ইলেকট্রিক কোম্পানী বিলের টাকা না-পেয়ে অনেক দিন আগেই কনেক্‌শন কেটে দিয়েছে; ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে, সিঁড়ি-উঠোন-বারান্দা অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই অভ্যাসের ইঙ্গিতে দ্রুতপদেই সে মায়ের ঘরের দিকে চলেছিল। আজই সে টাকা এনে দিয়েছে, খাবার কিছু অবশ্যই আছে আজ—অন্তত তার জন্যও যেটা রাখা আছে, সেটা সে নেপীকে খাওয়াতে পারবে।

বন্ধ দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কানাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দরজার মুখে।

তার বাবা একটা বোতল নিয়ে ব'সে মদ খাচ্ছেন। তার মা থালার উপর খাবার সাজিয়ে দিচ্ছেন। গন্ধ থেকে বুঝতে পারা যায়—মাংস থেকে প্রস্তুত কোন খাদ্যবস্তু। মা তার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টেনে দিলেন। বাবা তার দিকে আরক্ত চোখ তুলে বললেন—দশ টাকা তোর মা আমাকে দিয়েছে, দশ টাকা। তারপর বোতলটা তুলে ধ'রে বললেন—Eight twelve—তাও country-made whisky! কি যুদ্ধই লাগল বাবা! আর দু' টাকা চার আনা দিয়ে এনেছি—First class mutton! স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—দাও না কানুকে একটু মাংস, চেখে দেখুক!

কানাই প্রথমটা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। অকস্মাৎ তার চোখে যেন একঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নোনাধরা ইঁট! তার পরমুহূর্ত্তেই সে ফিরল,—দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য্য! তার মা অন্নপূর্ণার মত ব'সে শিবের মত নেশাখোর স্বামীকে মদ এবং মাংস খাওয়াচ্ছেন! মনে হ'ল এই সময় একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সুখময় চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা তার সকল বংশধরকে নিয়ে ধরিত্রীগর্ভে যদি সমাহিত হয়, তবে সে জয়ধ্বনি ক'রে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে করতে মরতে পারে!···কিন্তু নেপী কই?

—নেপী! নেপী চ'লে গেছে। বিচিত্র ছেলে, হয়তো আবার কাজ মনে পড়েছে। নইলে সে কখনই যেত না। না, ওই যে আসছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় লক্ষ্য ক'রে সে এগিয়ে গেল।—নেপী!

—না বাবা, আমরা। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তরাল থেকে ফুঁপিয়ে কে কেঁদে উঠল।

কানাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—কে ? সে এ-পাড়ার সকলকেই চেনে। যে কাঁদছিল, তার কান্নার মাত্রা বেড়ে গেল। প্রৌঢ়া সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধ'রে বললে—অন্ধকারে হুঁচোট লেগেছে বাবা। আয়—আয়, বাড়ী আয়।

উচ্ছ্বসিত কান্নার মধ্যে ক্রন্দনপরায়ণা বললে—না।

এবার কানাই কণ্ঠস্বর চিনতে পারলে। বর্দ্ধিত বিস্ময়ে ডাকলে—গীতা !

প্রৌঢ়া সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে ফিরে বললে—তবে তুই বাড়ী যাস্। আমি চললাম। ব'লেই সে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চ'লে গেল। অন্ধকারের মধ্যে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অধীর হ'য়ে গীতা সেই পথের ওপরেই যেন ভেঙে প'ড়ে গেল।

—কি হ'ল গীতা ? কি হয়েছে ? ওঠ। ওঠ।

ধুলায় লুটিয়ে গীতা কাঁদতে আরম্ভ করলে।

—কি হয়েছে বল ?

বহু কষ্টে গীতা বললে—আমায় বিষ এনে দাও কানুদা।

কানু শিউরে উঠল ! হয়তো বৃদ্ধও তাকে দেখে পছন্দ করে নি। সে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

গীতা আবার বললে—কেমন ক'রে আমি এ মুখ দেখাব ?

কানু সস্নেহে তাকে হাতে ধ'রে আকর্ষণ ক'রে বললে—ওঠ। কি হয়েছে বল দেখি !

—ওই ঘটকী আমায়—। আবার সে কেঁদে উঠল।

বহু কষ্টে গীতা যা বললে—সে শুনে কানাই যেন পাথর হয়ে গেল। ওই ঘটকী তাকে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছিল কোন ধনী পাত্রকে দেখাবার জন্য। গীতার ফোটো দেখে পাত্র নাকি গীতা এবং তার

মা-বাবাকে কাপড় পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল—কন্যাটিকে যেন তাঁরা ঘটকীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন—তিনি চোখে একবার দেখবেন; তাঁর পক্ষে বস্তীতে কন্যা দেখতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। ঘটকী তাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তার সে বাড়ীতে চলে গোপন দেহ-ব্যবসায়। ঘটকী তাকে সেই ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে বিক্রী করেছে।

গীতা আবার বললে—কেমন ক'রে আমি বাঁচব কানুদা?

কানু বললে—ছি—ছি, তোমার মা—

মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে গীতা বললে—মা জানে—কানুদা, মা জানে।

—জানে!

—জানে। নিশ্চয় জানে। নইলে যাবার সময় আমায় কেন সে বললে—বামুনদিদি যা বলবে, তাই শুনিস মা! তোর দৌলতে যদি দুটো খেতে পরতে পাই; নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পৃথিবীর এক অদ্ভুত মূর্ত্তি ভেসে উঠেছিল তার চোখের সম্মুখে। সর্ব্বাঙ্গে দুষ্টক্ষতময়ী পৃথিবী। সুখময় চক্রবর্ত্তীর রক্ত কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে? পৃথিবীর পথে পথে কি চক্রবর্ত্তীবাড়ীর নোনাধরা ইঁট ছড়িয়ে পড়েছে?

গীতা বললে—নইলে, মা কাপড়গুলো নিলে কেন? শুধু মা নয় কানুদা, বাবাও জানে। সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কানাই নির্ব্বাক্।

—আমি কি করব কানুদা?

কানাই দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত ধ'রে বললে—আমাকে বিশ্বাস ক'রে আমার সঙ্গে আসতে পারবে গীতা?

গীতা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কানাই অন্ধকার পথের দিকে হাতটা প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললে—যদি পার তো এস আমার সঙ্গে।

—তোমাদের বাড়ী ?

—না। এ বাড়ীর সঙ্গে আর আমায় কোন সম্বন্ধ নেই।

(নয়)

বাঙালীর জীবনে ভীরুতার অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা নয়। তার কল্পনা আছে; কিন্তু সে কল্পনা কার্য্যকরী ক'রে তোলবার মত বাস্তব জ্ঞান তার নেই; কর্ম্মের পথে পা বাড়িয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভাসতে তার ভয় আছে—এ কথা সত্য। বিশেষ ক'রে পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীর। বৈজ্ঞানিকেরা নানা ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন, বিজ্ঞানের ছাত্র কানাইয়ের নিজেরও সে ব্যাখ্যায় অনুমোদন আছে;—জীবনধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী বাঙলার শস্যসম্পদ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির সমাজব্যবস্থা তার কর্ম্মশক্তিকে আলস্যাচ্ছন্ন ক'রে ক্রমশ তাকে সুষুপ্তির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। তার দেহকোষ এবং বীজকোষের পরস্ব গ্রাসের ইচ্ছার পক্ষে প্রয়োজনীয় অভিযানের দুঃসাহসিকতার যে আবেগ—সে আবেগ তার সুষুপ্ত হয়ে গেছে।

কানাই তার নিজের জীবনে বহুবার কর্ম্মশক্তির এই দুঃসাহসিকতা জাগ্রত করবার চেষ্ট করেছে। কিন্তু সুখময় চক্রবর্ত্তী হতে তার বাপ পর্য্যন্ত—তিন পুরুষ ধ'রে যে শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছেন, যে ঘুম বিশ্রাম এবং আরামকে অতিক্রম ক'রে আজ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে—তাকে অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয় নি। কতবার সে সঙ্কল্প করেছে—সুখময় চক্রবর্ত্তীর রাক্ষসী-মায়ার ঘুম-ভরা এই পুরী সে পরিত্যাগ ক'রে নূতন যুগের অভিনব মানবগোষ্ঠীর এক বংশের প্রথম পুরুষ হিসাবে

জীবন আরম্ভ করবে। নিজের রক্তধারার বিষকে নষ্ট করিয়ে সুস্থ এবং পবিত্র ক'রে নেবে। তারপর কাজ আরম্ভ করবে—বিপুল উৎসাহে প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু পারে নি। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম বাধা দাঁড়িয়েছিল তার মায়ের স্নেহ; যে বংশে তার জন্মকে সে অভিশাপ ব'লে মনে করে, সেই বংশের প্রতি মমতা। কেমন ক'রে যে বিপরীত-ধর্ম্মী দুটি হৃদয়বৃত্তি—ঘৃণা ও মমতা পাশপাশি তার মধ্যে বাস করছে—সে তার নিজের কাছেও এক রহস্য ব'লে মনে হয়েছে। এই দুটি বিপরীত হৃদয়ধর্ম্ম তার মনকে দু'দিক থেকে আকর্ষণ ক'রে তাকে গতি-হীন ক'রে রেখেছিল। কল্পনা সে করেছে অনেক। কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নি। আজ ওই একশো টাকার উপর সমগ্র পরিবারের লোভ দেখে—বিশেষ মাংসের উপকরণ সহযোগে মন্তের নৈবেদ্য সাজিয়ে তার মায়ের আত্মত্যাগ এবং স্বামীসেবার নিষ্ঠার বিকৃতি দেখে তার ঘৃণার দিকটা অধীর শক্তিতে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। সে নিজে কয়েকটা টাকা রেখেছিল, তা তার মায়ের সহ্য হয় নি; কিন্তু স্বামীদেবতাকে দশ-দশটা টাকা মদের জন্য দিয়ে অপব্যয় করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা হ'ল না। তারপর গীতার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে সমগ্র বর্ত্তমানের উপরেই নিষ্ঠুরভাবে মমতাহীন হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত অধীর হৃদয়াবেগের শক্তিতে এক মুহূর্ত্তে নিষ্ক্রিয় অস্পষ্ট কানাই সক্রিয় হয়ে নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠল; যেন একটা আকস্মিক ভূমিকম্প পাথরের পুরী ফেটে গিয়ে তার মধ্য থেকে মুক্তির পথ পেল। দুর্য্যোগ-ভরা মুক্ত পৃথিবী ওই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর চেয়ে কম ভয়াবহ—কম জটিল নয়; সে কথা কানাই জানে—তবু জটিল পৃথিবীর বুকে—জীবনের পথ বেছে নিতে তার এতটুকু দ্বিধা হ'ল না, ভয় হ'ল না; গীতার হাত ধ'রে মহানগরীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অজানিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভেসে পড়ল।

কিছুদূর এসে গীতা সভয়ে প্রশ্ন করলে—এই রাত্রে কোথায় যাবেন কানুদা ?

কানাই স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরে বললে—এত বড় কলকাতা শহর, লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে থাকে, সেখানে কি দুজনের এক রাত্রির মত জায়গা মিলবে না ভাই ? এস।

গীতা আর কোন প্রশ্ন করতে পারলে না ; কিন্তু জীবনের পটভূমিকার যে স্বল্পপরিসরতার মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে, যে সব মানুষকে সে দেখেছে, তাতে গাঢ় অন্ধকার রাত্রে দুটি অপরিচিত নরনারীর জন্য যে কোন গৃহদ্বার সহৃদয়তার সঙ্গে উন্মুক্ত হতে পারে, এ আশ্বাসে সে নিশ্চিত হতে পারল না। তাদের বস্তীতে এক বাড়ীর একটুকরো ছেঁড়া কাগজ যদি কোনক্রমে অন্য বাড়ীতে গিয়ে পড়ে অথবা কেউ যদি মুক্ত বায়ুর জন্য অপরের বাড়ীর দিকের জানালা খুলে মুহূর্তের জন্য সেখানে দাঁড়ায়, এমন কি কেউ যদি রোগের যন্ত্রণাতেও অধীর হয়ে কাতর চীৎকার করে, তবে মুহূর্তে যে অসহিষ্ণু তীব্র কদর্য্য প্রতিবাদ ওঠে, সে স্মরণ ক'রে গীতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বড় বাগানওয়ালা বাড়ীটায় দুটো পূজার ফুল তুলতে হয় লুকিয়ে ; বস্তীর ওপাশে প্রকাণ্ড ছতলা বাড়ীটায় ইলেক্‌ট্রিক পাম্পওয়ালা দুটো টিউবওয়েল আছে, সেখানে গীতা গিয়েছিল তার অজীর্ণরোগগ্রস্ত বাপের জন্যে খাবার জল আনতে,—তারা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে কানাই একটা ট্যাক্সি ডাকলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গাড়ী থামল একটা অন্ধকার অল্পপরিসর রাস্তার উপর। কানাই একটা বাড়ীর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকলে—বিজয়দা ! বিজয়দা !

ট্যাক্সি ড্রাইভার হাঁকল—বাবু, আমার ভাড়া ?

—সবুর কর। নিয়ে দিচ্ছি। ব'লে সে আবার ডাকলে—বিজয়দা !

একজন চাকর দরজা খুলে দিয়ে প্রশ্ন করল—কে ?

—ষষ্ঠী, বিজয়দা কোথায় ?

—কানাইবাবু ? বাবু তো এখনও ফেরেন নি।

—ফেরেন নি ? তাই তো ! তোমার কাছে টাকা আছে ষষ্ঠী ?

—আজ্ঞে, টাকা তো নাই।

ট্যাক্সি ড্রাইভার অধীর হয়ে উঠল—বাবু !

গীতা আপনার আঁচল খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে ড্রাইভারের হাতে এগিয়ে দিলে। ড্রাইভার বললে, চেঞ্জ নাই আমার।

মৃদুস্বরে গীতা বললে—চেঞ্জ চাই না। ড্রাইভার মুহূর্ত্তে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ীখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কানাই সবিস্ময়ে পিছন ফিরে চাইতেই সে বললে—আমার কাছে একখানা পাঁচ টাকার নোট—। আর সে বলতে পারলে না, মুহূর্ত্তে নোটটার ইতিহাসের মর্ম্মান্তিক স্মৃতি তার অন্তরের মধ্যে আবার উদ্বেল হয়ে উঠে চাপা কান্নার উচ্ছ্বাসে তার স্বর রুদ্ধ ক'রে দিলে।

কানাই ব্যাপারটা বুঝলে ; সান্ত্বনার হাসি হেসে সে বললে—বেশ করেছ। এস।

কানাইয়ের বিজয়দা—একখানা দৈনিক ইংরেজি কাগজের আপিসে কাজ করেন। সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সম্পাদক। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রের আসরে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভাগ্যাকাশ' 'ঘনঘটা' 'ঘোর ঝঞ্ঝা' 'মহাকাল' 'তমসারূপিণী কালিকা' নিয়ে ফেনোচ্ছ্বাসিত বাংলাদেশের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে ফেনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিত যুক্তিতর্কের প্রখর স্রোতসম্পন্ন লেখাগুলি পড়লেই সকলে বুঝতে পারে—এ লেখা বিজয়বাবুর। এছাড়া আরও একটা পরিচয় তাঁর আছে। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই যে সব বাঙালীর ছেলের ঘাড়ে—দেশমাতৃকা সিন্ধবাদের নাবিকের ঘাড়ের বুড়ীর মত চেপে ব'সে আর নামেন না—বিজয়দা

তাদেরই একজন। ১৯১৬ সালে কলেজে ঢুকেই তিনি সে আমলের বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তারপর ১৯২১ সালে এম্-এ ক্লাসে পড়া মুলতুবী রেখে নেমেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। জেল থেকে বেরিয়ে দ্বিগুণিত উৎসাহে বিপ্লববাদ নিয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন। ১৯২৪ সালে রাজবন্দী হয়ে এম্-এ পাস করলেন। মুক্তি পেয়ে অধ্যাপনা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর এল ১৯৩০ সাল। ১৯৩০ সালের গণ-আন্দোলনের সময় গভর্মেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ডেটিন্যু হিসেবে আটক ক'রে রেখেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মুক্তি পেয়ে এই চাকরী নিয়েছেন। বর্ত্তমানে রাজনীতিতে বিজয়দা সাম্যবাদী—কম্যুনিস্ট। একা মানুষ; ভৃত্য ষষ্ঠীচরণই তাঁর সংসারে সব। জুতো সেলাই তিনি মুচিদের দিয়েই করিয়ে থাকেন এবং চণ্ডীপাঠের পাটই নেই বিজয়দার জীবনে—ও দুটো কর্ম্ম বাদ দিয়ে তাঁর সকল কর্ম্ম ষষ্ঠীচরণই করে; অকৃতদার বিজয়দারও ষষ্ঠীচরণের উপর নির্ভরতা অকৃত্রিম এবং অগাধ। কেবল বাজার-খরচের হিসেব নেবার সময় বিজয়দা সন্দিগ্ধ হয়ে সজাগ হয়ে ওঠেন। কারণ, বাজারে ষষ্ঠী প্রায় পুকুর চুরি ক'রে থাকে। মাছের খরচ লিখিয়েও ষষ্ঠী খেতে দেয় নিরামিষ; মাছ কোথায়, প্রশ্ন করলে বলে—মাছটা পচা ছিল।

—পচা মাছ কই? প্রশ্ন ক'রে বিজয়দা তাকে চেপে ধরবার চেষ্টা করেন—ষষ্ঠী অম্লান বদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—ফেলে দিয়েছি। যে মাছি উড়ছিল!

বিজয়দা তার এই উপস্থিতবুদ্ধিতে খুশী হয়ে ওঠেন; এবং পুনরায় মাছের দাম স্বরূপ আরও দশ আনা পয়সা দিয়ে বলেন—এক টাকা সেরের মাছ, এবার পাঁচসিকে সের দিয়ে আনবে ওবেলায়। আধ সের মাছ জল ম'রে দেড়পো দাঁড়াবে। তা হ'লে আর পচা হবে না।

বিজয়দা ফিরলেন প্রায় রাত্রি দশটায়। অদ্ভুত মানুষ বিজয়দা,

কানাইয়ের সঙ্গে গীতাকে দেখেও কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন—কি রে, কি খবর ?

কানাই গীতাকে ইঙ্গিত করতেই সে বিজয়দাকে প্রণাম করলে। বিজয়দা সস্নেহে বললেন—বাঃ, এ যে বেশ মেয়ে। ব'স, ভাই ব'স।

সমস্ত বৃত্তান্ত ব'লে কানাই প্রশ্ন করলে—এখন কি করব বল ?

গীতা পাশের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।

বিজয়দা ডাকলেন—ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী এসে দাঁড়াল। বিজয়দা বললেন—টাটকা পুরী ভাজিয়ে আনতে গেলে কি দর নেবে ?

ষষ্ঠী মাথা চুলকাতে লাগল। বিজয়দা বললেন—যা দর নেবে—তার চেয়ে চার আনা দর বেশী দিয়ে আধ সের পুরী ভাজিয়ে আন। আর মিষ্টি চারটে। বুঝলে ? ব'লে একটি টাকা তার হাতে তুলে দিলেন।

কানাই বললে—আমি খাব, কিন্তু মেয়েটির মুখে আজ আর কিছু উঠবে না বিজয়দা।

বিজয়দা একটু ম্লান হাসি হাসলেন।

—এখন কি করব বল ?

অত্যন্ত সহজ উপায় আছে, কিন্তু সে তোর হাতে।

—বল ?

—মেয়েটিকে তুই বিয়ে ক'রে সংসার পেতে ফেল্।

কানাই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিজয়দার দিকে চেয়ে রইল। বিজয়দা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কানাই বললে—না বিজয়দা, সে হয় না। অন্য উপায় বল।

—তবে তো মুস্কিলে ফেললি।

কানাই আবেগের বশবর্ত্তী হয়েই তাকে ব'লে গেল আপনার বংশের কাহিনী। শেষে বললে—আমার এ বিষাক্ত রক্ত নিয়ে সংসার পাতা হয় না বিজয়দা।

—বিষাক্ত রক্ত তো চিকিৎসা করিয়ে নির্বিষ করা যায়। কালই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ফেলে, তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্। খরচের জন্যে ভাবিস নে, সে ব্যবস্থা আমি করব।

কানাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—না বিজয়দা।

—তবে তুই ওকে এমনভাবে নিয়ে এলি কেন ?

—নিয়ে এলাম কেন ? এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ ? এত বড় অনাচার—অত্যাচার—

বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—সে তো আদ্যিকাল থেকে হয়ে আসছে। মেয়েরা বাল্যে বাপের সম্পত্তি—যৌবনে স্বামীর, তার পরে পুত্রের। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে বাপ-স্বামী কন্যা-পত্নী বিক্রী ক'রে আসছে। তারপর একটু হেসে বললেন—আর পৃথিবীতে রাষ্ট্রবিপ্লব কদাচিৎ হ'লেও দুর্ভিক্ষ তো চিরস্থায়ী অবস্থা। ধনী আর দরিদ্র নিয়ে পৃথিবী—দরিদ্রের মধ্যে দুর্ভিক্ষ চিরকাল। সুতরাং কেনা-বেচা চিরকাল চলেছে। এই কলকাতা শহরে ওটা একটা চিরকেলে ব্যবসা। শুধু কলকাতা কেন, যে কোন দেশের পুলিস রিপোর্ট দেখ্ তুই, দেখবি ব্যবসাটা প্রাচীন। ওই মেয়েটির মত কত শত মেয়ে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—মেয়েটির মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেছ বিজয়দা ?

—ভাল ক'রে দেখি নি। তবে তার আজকের মর্মান্তিক দুঃখ আমি মান করতে পারছি। কিন্তু দশ দিন পরে ওটা স'য়ে যেত।

কানাই উঠে দাঁড়াল। তার উত্তেজনা বিজয়দা বুঝতে পারলেন—াইয়ের হাত ধ'রে আকর্ষণ ক'রে বললেন—ব'স্।

কানাই কঠিন মৃদুস্বরে বললে—তুমি এত হৃদয়হীন তা জানতাম না বিজয়দা।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিজয়দা বললেন—মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে?

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কানাই বললে—থাক্। ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কি বিপদ! বল্ না যা জিজ্ঞেস করছি।

—ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত পড়েছে। আমার বোনের সঙ্গে পড়ত। বছর খানেক আগে বাপের চাকরী যেতে পড়া ছেড়েছে।

—তা হ'লে? একটু হেসে বিজয়দা বললেন—তা হ'লে ওকে কোন নারীকল্যাণ-আশ্রমে পাঠিয়ে দে।

—নারী-কল্যাণ আশ্রম?

—হ্যাঁ। বলিস তো মিশনারীদের হাতে আমি দিয়ে দি। ভবিষ্যতে তাতে ভালই হবে। আমার একজন বন্ধু মিশনারী আছেন—খুব ভাল লোক—আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

কানাই হেসে বললে—থাক্ বিজয়দা। আজকের রাত্রির মত এখানে থাকতে দিয়েছ, এই যথেষ্ট। এর ওপর অযথা ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে!

তার মনে প'ড়ে গেল মিঃ মুখার্জি, অশোকের বাপ কর্ত্তাবাবুর কথা। ব্যবসায়ে তিনি তাকে সাহায্য করবেন; দিনে পঞ্চাশ মণ চাল বেচতে পারলে দৈনিক লাভ একশো টাকা—মাসে তিন হাজার, বছরে ছত্রিশ হাজার! গীতাকে সে কোন স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবে, বোর্ডিংয়ে রাখবে; লেখাপড়া শিখে সে আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। ও নিয়ে সমস্ত দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

ষষ্ঠীচরণ পুরী মিষ্টি নিয়ে এসেছে, সে খাবার তাগিদ দিলে।

বিজয়দা বারান্দায় দুটো বিছানা ক'রে ফেললেন। শোবার মত ঘর কেবল একটা। আর একখানা ঘরে রান্না হয়, ভাঁড়ার থাকে এবং ষষ্ঠীচরণ শোয়। কানাই গীতাকে ডাকলে। গীতা রান্নাঘরেই একখানা মাদুরের ওপর শুয়ে ছিল। তখনও সে কাঁদছিল। একান্ত অনুগতের মতই সে উঠল এবং খেলেও। তবে খাবার সময় কান্না বেড়ে গেল। কানাই তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিজয়দা ইঙ্গিতে বারণ ক'রে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর স্বরে বিজয়দাই ডাকলেন—গীতা! গীতা!

গীতা নীরবে এসে সামনে দাঁড়াল। বিজয়দা বললেন—ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়। গীতা তাই করলে।

বারান্দায় কনকনে শীত। কলকাতায় যতখানি কনকনে হওয়া সম্ভব। বিজয়দা বেশ নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। কানাই আজকের কথাই ভাবছিল। অনুশোচনা হয় নি, স্থির মনে সমস্ত খতিয়ে দেখছিল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিল।

এরোপ্লেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একখানা প্লেন উড়ে গেল। আবার একখানা। আর একখানা।—আরও একখানা! নিশীথ-আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে ঘর্ঘর শব্দে। বমার প্লেনের দল হয়তো অভিযানে চলেছে। অথবা ফাইটারের ঝাঁক চলেছে সীমান্তের দিকে শত্রুর বমারের সন্ধানে। বিজয়দার বাসার পশ্চিম দিকে অল্প খানিকটা দূরে গঙ্গা; গঙ্গার ধারে পোর্টকমিশনারের রেলওয়ে লাইনে অবিরাম গাড়ী চলেছে। শান্টিংয়ের জন্য গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কার শব্দ উঠছে। অদূরবর্তী বড় রেল-ইয়ার্ডটাতেও চলছে শান্টিং। মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনের শিটি বেজে উঠছে। ইয়ার্ডটার অদূরবর্তী বন্দুক-গুলি তৈরীর কারখানায় কাঁচা মাল আসছে; তৈরী মাল চালান হচ্ছে। হাজারে হাজারে মানুষ কাজ ক'রে চলেছে যন্ত্রের সঙ্গে; মজুরী ডবল। গলির মোড়ে বড়

রাস্তার ওপারেই এ-আর-পি আড্ডায় বন্ধ জানালা-কপাটের মুখে মুখে দু'পাশে বাজুর গায়ে সমান্তরাল সরল রেখায় আলোর রেখা ফুটে রয়েছে। সেখানে কেউ গান করছে। বাজারের (Buzzer) সামনে ডিউটিতে ব'সে বোধ হয় কোন এক বিচিত্র মানসিকতার মধ্যে বেচারার গান জেগে উঠেছে।

বিজয়দা বেশ ঘুমুচ্ছেন। কানাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গীতার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে বিজয়দার ওপর তান মন বিরূপ হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে কর্ত্তাবাবুর আহ্বানেই সাড়া দেবে, তাঁর সাহায্যই গ্রহণ করবে।

(দশ)

ভোরবেলায় উঠেই সে ছাত্রের বাড়ী গেল। অন্য দিন অপেক্ষা সকালেই পৌঁছুল সে। নূতন কর্ম্মজীবন আরম্ভ করবার আগ্রহের আবেগ তাকে অধীর ক'রে তুলেছিল। ছাত্রের বাড়ীর কাছে এসে তার সে কথাটা মনে হ'ল। অদূরবর্ত্তী ফটকটার ভিতর দিয়ে তার নজরে পড়ল বাড়ী ধোয়া-মোছার কাজ চলছে। কর্পোরেশনের ঝাড়ু-দারটি পর্য্যন্ত এখনও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় নি। কানাইয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় সাড়ে সাতটা; সাড়ে সাতটার সবচেয়ে বড় সঙ্কেত রেডিও-প্রোগ্রাম আরম্ভ; বাঙলায় সংবাদ ঘোষণা। রেডিও এখনও নিস্তব্ধ। মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েই সে চ'লে এসে দাঁড়াল বউবাজার-কলেজ স্ট্রীট জংশনে। এসপ্লানেডের ট্রাম যাচ্ছে। সে উৎসুক হয়ে উঠল। নীলার অফিসের বিশৃঙ্খল ফাইলের স্তূপ কি একদিনেই গোছগাছ হয়ে গেছে? পশ্চিম দিকের ফুটপাথ থেকে সে পূর্ব্ব দিকে এসে দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন্থরগতিতে এসে ট্রামখানাও দাঁড়াল। নাঃ; নীলা নেই। কিছুক্ষণ পরেই আবার ট্রাম এল। ওঃ, এটা ডালহৌসীর

ট্রাম! আবার এসপ্লানেডের ট্রাম এল। ট্রামখানার পূর্ব্বের চেয়ে ভিড় বেশী, কিন্তু নীলা নেই। ওই আর একখানা আসছে। ওখানা নিশ্চয় ডালহৌসী, তার পিছনে অনেকটা দূরে ওই আর একখানা।

—নমস্কার! অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে—বাঙলায় খবর বলছি।

কানাই চকিত হয়ে উঠল। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু তবুও সে দাঁড়িয়ে রইল। পেছনের ট্রামখানা আসতে তিন-চার মিনিটের বেশী লাগবে না। মাত্র তিন-চার মিনিট।

—"বাঙলায় খবর বলছি। গতকাল অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে প্রচারিত মিত্রপক্ষীয় সামরিক বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, পরশু অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ওপর শত্রু অর্থাৎ জাপানী বিমান আবার হানা দিয়েছিল। দুবার হানা দেয়, সকালে একবার এবং পুনরায় হানা দেয় সন্ধ্যার পর। দুবারই অবশ্য তারা অল্প কয়েকটি বোমা ফেলে যথাসম্ভব সত্বর চম্পট দেয়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিক জানা যায় নি; তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। কারণ, সমস্ত বোমাগুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এদিকে সেদিকে পড়েছে। ঐ তারিখেই জাপানী প্লেন ফেণীর উপরেও হানা দিয়েছিল। সেখানেও ক্ষতি অতি সামান্য।"

এই সংবাদ-ঘোষকটির ঘোষণা শুনলেই কানাইয়ের মনে হয়, এই ব্যক্তিটির হওয়া উচিত ছিল কোন সামন্ত নরপতি, অথবা থিয়েটারের অ্যাক্টর। যে রকম গুরুগম্ভীর স্বরে এবং রাজকীয় ঢঙে খবর বলে, তাতে শুনে মনে হয়—লোকটি যেন বিপুল গুরুত্বপূর্ণ কোন চার্টার ঘোষণা করছে বা আধুনিক কায়দায় আলমগীর পাঠ করছে। ডালহৌসীর ট্রামটা মোড় ফিরল।

—"আমাদের বিমানবহরও গতকাল রাত্রে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ

চালিয়ে এসেছে। সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর সরাসরি বোমা পড়তে দেখা যায়। সামরিক দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ট্রেনের উপর বোমা প'ড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আগুনের শিখায় সমস্ত স্থানটা আলো হয়ে ওঠে। আগুন বোধ হয় এখনও জ্বলছে। আমাদের সব ক'টি বিমানই নিরাপদে ফিরে এসেছে।"

এস্‌প্লানেডের ট্রামখানা এসে দাঁড়াল। ওই যে, হ্যাঁ, ওই যে ও-পাশের লেডিস্ সিটে ব'সে রয়েছে নীলা। কিন্তু ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ব্যগ্র কানাই চেয়ে রইল। কিন্তু নীলা এদিকে মুখ ফেরালে না। ট্রামখানা চলতে আরম্ভ করলে। একবার তার ইচ্ছে হ'ল ট্রামে চড়ে বসে। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে সে। ট্রামখানা চলতে আরম্ভ করলে। কানাই ফিরল ছাত্রের বাড়ীর দিকে।

অশোকদের বাড়ীতে চট্টগ্রাম ও ফেণীতে বোমাবর্ষণের আলোচনা চলেছে। কর্ত্তা গম্ভীর মুখে বলছেন,—ডিসেম্বরেই তিন দিন বম্বিং হ'ল চাটগাঁর ওপর—ফিপ্‌থ্, টেন্‌থ, ফিপ্‌টিন্‌থ্, ঠিক পাঁচ দিন অন্তর।

সে প্রায় একটা কনফারেন্স ব'সে গেছে। কর্ত্তার চারিদিকে ব'সে আছে—তাঁর বড়ছেলে, মেজছেলে, দু'তিনজন কর্ম্মচারী। অশোকও ছিল, সে-ই তাকে ডেকে নিয়ে গেল সেখানে। কর্ত্তা বললেন—বসুন মাস্টার মশাই। তারপর বললেন—আমি সাইগন, টোকিও রেডিও শুনেছি। আমার বিশ্বাস, ওরা সত্যিই এবার বেশ বড় রকম এয়ার অ্যাটাক আরম্ভ করবে।

বড়ছেলে অমলবাবু বললে—সমস্ত হেড অফিসই তো বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জরুরী কাগজ দলিল সমস্তই সেখানে। কিন্তু গোডাউনের মাল তো সরানো মুখের কথা নয়।

মেজছেলে অসীম বললে—সে সব যখন ইন্সিওর করা আছে, তখন সরিয়ে আর বেশী লাভ কি হবে ?

—হবে। আমি যা বলি শোন। সুবার্বের দিকে গোডাউন পাওয়া যায় কি না চেষ্টা ক'রে দেখ। আমাদের বাগানবাড়ীর কারখানায় একটা গোডাউন হয়েছে। যত শীগগির হয়, আর দু'টো গোডাউন তৈরী করে নাও। মেজছেলের দিকে চেয়ে বললেন—বউমাদের নিয়ে বেনারসে রেখে এসো। অশোক এখন সেখানে থাকবে। মাস্টার মশাই, আপনিও যান না অশোকের সঙ্গে। মাসে একশো টাকা হিসেবে পাবেন আপনি।

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে, আমার পক্ষে তাতে অসুবিধে আছে। আর—আপনি আমাকে কাল বলেছিলেন—চালের ব্যবসাতে—

ও ইয়েস! ভুলে গিয়েছিলাম আমি। অমল, তুমি কানাই-বাবুকে আমাদের একজন এজেণ্ট ক'রে নাও। কেনা-বেচার ওপর কমিশন পাবেন। মানে ওঁকে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। নিজের হাতে ওঁকে তৈরী ক'রে নাও। জান তো, উনি কত বড় বংশের ছেলে! আর উনি স্বাধীন ভাবে যদি কোন মাল কেনাবেচা করেন, তবে পার্টি দেখে, ওঁকে ক্রেডিটে মাল দিয়ো।

অমলবাবু সস্নেহে হেসে বললে—বেশ। আজ থেকেই আসবেন অফিসে। যদি পারেন তো চলুন—এক্ষুনি বেরুব আমি। আমার সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করবেন আপিসে।

খাওয়াদাওয়ার কথাটা মুহূর্তের জন্য কানাই ভেবে নিলে। ও-প্রস্তাবটাতে তার দ্বিধা ছিল, কিন্তু সে দ্বিধা করতে গেলে কর্ম্মারম্ভের প্রথম পদক্ষেপেই যেন বাধা প'ড়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, এই একদিনের খাওয়াটা জীবনে নিশ্চয়ই খুব একটা বড় ঋণ নয়, অন্তত যে

অনুগ্রহ সে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে, তার চেয়ে নয়। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সে বললে, তাই যাব।

—আপনি অপেক্ষা করুন আমি আসছি। ব'লেই অমলবাবু বললে—আপনি ততক্ষণ ও-ঘরে বসুন। অশোক, তোমার যদি কিছু জেনে নেবার থাকে, মাস্টার মশাইয়ের কাছে জেনে নাও ততক্ষণ।

অশোকের আনন্দ সব চেয়ে বেশী। প্রাণময় স্বাস্থ্যবান ছেলেটির চোখ দুটি শুভ্র উজ্জ্বলতায় ঝকমক করছিল। আপনি বিজনেস করবেন?

কানাই হাসলে।—দেখা যাক্ চেষ্টা ক'রে।

—ঠিক হবে সার্, দেখবেন ঠিক এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে মোটরে কিনতে হবে। নইলে কাজ ক'রে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।

—বল কি!

—দেখবেন। তখন আমাকে বলবেন।

ছেলেটির আন্তরিক শুভেচ্ছা দেখে কানাই বড় তৃপ্তি অনুভব সত্যিই অশোক তাকে ভালবাসে।

—কিন্তু আমারই মুস্কিল হ'ল সার্।

—কেন?

—আবার নতুন মাস্টার আসবে। আপনার মত পড়াতে পারবে না।

—আমার চেয়ে ভাল মাস্টার আসবেন হয়তো।

—নাঃ। অশোক বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলে।

কানাই হেসে বললে,—বেশ, বিজনেস করলেও আমি তোমাকে পড়িয়ে যাব।

অশোক হাসলে—সে তখন আর ভাল লাগবে না সার্। আর টাইমই পাবেন না। বাবা বলছিলেন কি জানেন? ওয়ার-মার্কেটে

সব চেয়ে লাভের সময় এইবার আসছে। এতদিন তো শুধু তোড়জোড় করতে গেল। বিশেষ, চাল, আটা, চিনি—এই সবের ব্যবসাতে। বাবা হাসতে হাসতে বলছিলেন—আমাদের গুদোমের চাবি যদি এক সপ্তাহ খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে আট দিনের দিন বাংলা দেশে উনোন জ্বলবে না।

—বল কি!

—উঃ, বাবা যা স্টক করেছেন চাল!

অর্থবিজ্ঞান কানাই মোটামুটির চেয়েও ভাল ভাবেই পড়েছে, তবুও এই ব্যবসায়ীর ঘরের ছেলেটির শুনে-শেখা ব্যবসায়-জ্ঞান দেখে ত হ'ল।

'লবাবু বাইরে থেকে ডাকলে মাস্টার মশাই! কানাই বেরিয়ে হেসে বললে—তিনবার ডাকলাম মিঃ চক্রবর্ত্তী ব'লে। বোধ খেয়াল করেন নি! এবার থেকে খেয়াল রাখবেন। বিজনেস-ারে মাস্টার মশাই নাম শুনলে লোকে—মানে, তাদের এস্টিমেটে হয়ে যাবেন আপনি।

নিজে ডালহৌসী স্কোয়ারের চারিধারে এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাগুলোর চারিপাশে ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা দিয়ে তৈরী বিরাট বিশাল বাড়ীগুলো সে বাইরে থেকে অনেকবার দেখেছে। আকাশস্পর্শী চারতলা, পাঁচতলা, সাততলা বাড়ীগুলোর অতিকায় আকার, অতি কঠিন দৃঢ়তা, অত্যুচ্চ ভঙ্গির মধ্যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় আছে, কিন্তু কোন আনন্দময় শ্রীর আবেদনে কোন দিন কানাইয়ের চিত্তকে আকর্ষণ করেনি। আজও অমলের সঙ্গে যখন পাঁচতলা বাড়ীটার প্রথমতলায় ঢুকল, তখন তার সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা কম্পন সে অনুভব করলে। সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটি চমকে। কানাই চমকে উঠল। অতি তীক্ষ্ণ একটা অনুনাসিক শব্দ উঠছে মাথার ওপরে। পরক্ষণেই

সে আপনাকে সংযত করলে। উপরতলা থেকে লিফ্‌ট্‌ নেমে এসে প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই তাদের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল; লিফ্‌ট্‌ম্যান দরজা খুলে দিয়ে অমলকে সেলাম করলে।

অমল আপিসে ব'সে ডাক দেখে কতকগুলো মন্তব্য লিখে উঠে পড়ল। কানাইকে বললে—চলুন, কতকগুলো বড় আপিসে আমায় যেতে হবে সব দেখে আসবেন চলুন।

আজ তার অমলবাবুকে অদ্ভুত লাগল। তার এ রূপ কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারে নি। বাড়ীতে অনেক সময় তার সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বলেছে, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে মধ্যে মধ্যে এমন অজ্ঞতার, এমন কি, মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে যে, কানাই মনে মনে হেসেছে; উপমা খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে—স্বর্ণক্ষুর গর্দ্দভ। আজ কিন্তু দেখলে তার এক অদ্ভুত রূপ। তাদের বাড়ীতে যে ঐশ্বর্য্য, সে বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়, অমলবাবুর উপর যার প্রভাব শুধু প্রসাধনে এবং প্রমোদেই আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য এখানে এক বিরাট শক্তি; অমলবাবুর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, স্বচ্ছন্দ সাহসিক পদক্ষেপের মধ্যে সেই শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখে সে বিস্মিত হ'ল, অমলবাবুর উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। বড় বড় সাহেব-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তার অসঙ্কোচ সমকক্ষতার ব্যবহার দেখে সে মুগ্ধ হ'ল। আরও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এই অঞ্চলের ইঁট-কাঠ লোহা-পাথরের পুরীর ভিতরের পরিচয় পেয়ে। কুবের এবং লক্ষ্মীতে জুয়াখেলা চলেছে। লক্ষ্মী ক্রমাগতই হেরে চলেছেন, খেলার দান দিতে তাঁর অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডারের সকল দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে রাখতে তিনি বাধ্য হয়েছেন; পৃথিবীর শস্যক্ষেত্র, চাষীর খামার, দুর্গম অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, উত্তপ্ত অন্ধকার ভূগর্ভ—যেখানে যত কিছু সম্পদ্‌ তাঁর আছে, সমস্ত স্থান থেকে সেই সমস্ত সম্পদ এসে ঢুকেছে কুবেরের ভাণ্ডারে। পাশার প্রতি দানেই লক্ষ্মী

হেরে চলেছেন। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে, পায়ে হেঁটে, শহরতলী থেকে যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে ছুটে আসে, তারা বিশীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, কুব্জ দেহ নিয়ে ঘাড় গুঁজে কাজ ক'রে চলেছে;—কুবেরের সঙ্গে লক্ষ্মীর জুয়াখেলার হিসেব রাখছে। দানের মোট বইছে।

অমলবাবু বাইরের কাজ সেরে এসে সমস্ত অফিসটা একবার ঘুরে এল। অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি! কোথায় কোথায় যে কাজের গতি শ্লথ, সে তার দৃষ্টি এড়ায় না। কয়েকজনের কাজ তলব ক'রে সে-সত্য দেখিয়ে দিয়ে নোট পাঠিয়ে দিলে ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌চার্জের কাছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অমলবাবু বললে—চলুন, আমাদের বাগান দেখে আসবেন।

কানাই মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার নিজের কাজ এখনও কিছুই হয় নি। অমলবাবু সে কথা মুহূর্ত্তে বুঝে নিলেন, হেসে বললেন—এর মধ্যে দিয়েই আপনার কাজের হাতেখড়ি হচ্ছে কানাইবাবু। স্থান কাল পাত্র—তিন নিয়ে পৃথিবী; আগে কোন্ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন—সেই ক্ষেত্রটা চিনে নিন।

কানাই একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক কথা।

গাড়িতে চ'ড়ে অমলবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললে—আপনি সিগারেট খান না, না? ধরুন মশাই, অ্যাট লিস্ট, টু কীপ কম্পানি—ব'লে হাসলে। কানাইও হাসলে। অমলবাবু আবার বললে—আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কানাইবাবু। আমি আমার মনের মত একজন অ্যাসিস্টাণ্ট খুঁজছি; অ্যাসিস্টাণ্ট নয়—পার্টনার—আমার বন্ধু। আমার নিজের একটা সেপারেট বিজনেস আছে; অবশ্য বাড়ীর কেউ জানে না, বাবাও না। আমি জানাতেও চাই না। আমি একজন বিশ্বাসী বন্ধু চাই—তাঁকে আমার পার্টনার করব।

গাঢ়স্বরে কানাই বললে—অবিশ্বাসের কাজ আমি কখনই করব না। তবে বন্ধু তো হব বললেই হওয়া যায় না।

স্টীয়ারিং ধ'রে অমল সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই একটু হাসলে—বললে—আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। তোষামুদে লোক আমি পছন্দ করি না। আমি আপনার বন্ধু হয়েছি, আপনি আমার বন্ধু হবার চেষ্টা করবেন।

কানাই হেসে বললে—উইথ অল মাই হার্ট!

এক হাতে স্টীয়ারিং ধ'রে অন্য হাতে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের ক'রে খুলে সামনে ধ'রে অমলবাবু হেসে বললে—তবে আসুন পাপের সঙ্গী হয়ে বন্ধুত্বটা গাঢ় এবং পাকা ক'রে নিন।

অমল আবার বললে—আর একজন আমার বন্ধু আছেন—আমাদের কারখানায় যাচ্ছি—সেই কারখানার ম্যানেজার। ভারি মজার লোক।

কলকাতা থেকে মাইল পনের দূরে শহরতলীর একখানা পল্লীতে তাদের যেতে হবে। বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তায় মোড় ফিরল। এ রাস্তাতেও মিলিটারী লরী চলেছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটা বাগানে পল্টনের ছাউনি পড়েছে। নূতন ঘরবাড়ী তৈরী হচ্ছে। দু'চার জায়গায় বস্তী ভেঙে ফেলে জায়গা পরিষ্কার হচ্ছে—সেখানেও ছাউনি পড়বে। রাস্তার ধারে বড় বড় বাগানে মিলিটারী লরী সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। পথে গ্রাম্য লোকের আনাগোনা। জঙ্গল এবং গাছের ভিড়ের মধ্যে ছিটেবেড়ার ঘর দেখা গেল; পথের পাশে ডোবার মত পুকুর, শীতের রবিশস্যসমৃদ্ধ ক্ষেত; মটরশুঁটির লতায় সাদা বেগুনী ফুল ফুটেছে; গম যব সর্ষের গাছগুলি হয়ে রয়েছে গাঢ় সবুজ। জনবিরল পথে গাড়িখানা হু-হু ক'রেই চলছিল; হঠাৎ একটা জনতা সম্মুখে পড়ায় গাড়ির গতি মন্থর করলে অমলবাবু। মেয়ে-পুরুষের একটি

দল চলেছে ;—মাথায় কাঁকালে রাজ্যের জিনিস, কয়েকজনের কাঁধে ভার ; ছোট ছেলেরা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কতকগুলি গরু এবং ছাগল। তাদের দিকে চেয়ে দেখেই অমলবাবু গাড়ী থামা'ল। একজন বৃদ্ধকে ডেকে বললে—তোমাদের বুঝি বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে হচ্ছে? গ্রামে পল্টনের ছাউনি পড়েছে ?

বৃদ্ধ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিতে পারল না, ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে উঠল, আর চোখ হতে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুটি বিশীর্ণ অশ্রুধারা। সমস্ত দলটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়েগুলি সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল অমল এবং কানাইয়ের দিকে। একটি বেশ সুশ্রী তরুণী মেয়ে চেয়ে দেখছিল কানাইকে।

অমলবাবু আবার প্রশ্ন করলে—তোমরা সব ঘরের দাম পেয়েছ ?

একটি বৃদ্ধা বললে—তা পেয়েছি বাবা। কিন্তু দাম্ নিয়ে কি করব? কোথায় যাব, কনে যাব বল দিকিনি? পিত্তি-পুরুষের গেরাম! বৃদ্ধা চোখ মুছলে। আর একজন তার অসমাপ্ত কথার সুর ধ'রে বললে—ঘরদোর, পুকুর-ঘাট, গাঁয়ে-মায়ে সমান কথা বাবু। টপ টপ ক'রে তার চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়ল। এবার শুধু সে নয়, সকলেই চোখ মুছলে আঁচলে। কানাইয়ের অন্তরটাও টন টন ক'রে উঠল।

অমলবাবু বললে—কি করবে বল? দেশে লড়াই লেগেছে। এখন মানুষকে কষ্ট তো করতেই হবে। সেপাই থাকবার জায়গা না দিলে—তারা থাকবে কোথায়? কত বড় বড় বাড়ীও তো নিয়েছে, দেখেছ তো ?

হেসে একটি বৃদ্ধ বললে—যাদের পাঁচখানা আছে, তাদের একখানা গেলে অন্য খানায় থাকবে তারা। আমরা কি করব? কনে যাব ?

—তোমরা যদি থাকবার জায়গা চাও তো আমি জায়গা দিতে পারি। ···পুর জান?

···পুর? জানি।

—ওখানে রায়বাহাদুর বিভূতিবাবুর বাগানে যেয়ো। আমি যাচ্ছি সেখানে। সেখানে থাকবার জায়গা পাবে। এখন আমাদের টিনের ছাউনির তলায় থাকবে। তারপর ঘর ক'রে নেবে। আমাদের ওখানে বাড়ীঘর তৈরী হচ্ছে। সেখানে তোমরা খেটেও খেতে পারবে।

সকলে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে।

—কি বলছ?

—দেখি বাবা বুঝে।

একখানা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে অমলবাবু বললে —ছেলেদের খাবার কিনে দিয়ো। যদি ভালো মনে কর তবে যাবে। ···পুরে বিভূতিবাবুর বাগানে; সেখানে জায়গা পাবে তোমরা।

গাড়ীতে উঠে অমলবাবু বললে—হতভাগ্যের দল!

কানাই চোখ মুছলে। অমলবাবু বললে—ওই সুশ্রী মেয়েটিকে কিন্তু ওদের মধ্যে মানাচ্ছিল না।

প্রকাণ্ড বড় বাগান। এককালে কোন শৌখীন ধনী পরম যত্নে প্রমোদ-বাসর সাজিয়েছিলেন। সমাজের আদিকাল থেকে মায়াবাদ, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতির অজস্র মহিমা প্রচার সত্ত্বেও মানুষের সমাজে বশিষ্ঠ-বুদ্ধের সংখ্যা একটি দুটি; মুনি-ঋষিরাও সংখ্যায় নগণ্য, অনুপাত কষলে কোটিতে একজন হবে কি না সন্দেহ। আসলে ব্যবহারিক জগতে ইন্দ্রত্বের জন্যই তপস্যা চ'লে আসছে। কোনমতেই ইন্দ্রত্বের প্রলোভন এবং আদর্শকে মানুষের কাছে খর্ব্ব করা যায় নি। পিটুলি গোলায় দুধের

আস্বাদ লাভের আগ্রহের মত—দেশে সাধারণ মানুষের নাম খুঁজলে দেখা যাবে ইন্দ্রত্বযুক্ত নামের দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী। হরিদাস ইত্যাদিও আছে কিন্তু কামনা তাদের হরেন্দ্র হবার। ইন্দ্রত্বের ঐশ্বর্য্যগৌরব এবং লোভনীয় অধিকারের মধ্যে নন্দনকানন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ; ওর সঙ্গে অপ্সরা এবং সোমরসের সম্বন্ধ প্রায় অবিচ্ছেদ্য। তাই বাস্তব জগতে আধতোলা কি একতোলা ইন্দ্রত্ব সঞ্চয় করতে পারলেই তদুপযুক্ত একটা নন্দনকানন রচনার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক। তেমনি কোন ছটাকী ইন্দ্রের নন্দনকানন, রায়বাহাদুর বি. বি. মুখার্জীর ব্যবসায়ের অশ্বমেধের ফলে—এখন পূর্ব্ব ইন্দ্রের হস্তান্তরিত হয়ে তাঁর দখলে এসেছে।

বাগানের মাঝখানে 'সরোবর' অর্থাৎ পুকুর। পুকুরের ঠিক সামনেই চমৎকার একখানী বাড়ী। বাড়ীর মেঝেটার মার্বেলের জোড়ের ফাঁকে-ফাঁকে—মর্ত্ত্যসুলভ সোমরস এবং নর্ত্তনরতা অপ্সরার পায়ের ধূলো আজও বোধ হয় রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে ব'লেই কানাইয়ের ধারণা হ'ল। তবে সে শ্রদ্ধান্বিত হ'ল মুখোপাধ্যায় মশায়ের উপর, বিশেষ ক'রে অমলবাবুর উপর। কারণ তাঁদের সাধনা ইন্দ্রত্বের হ'লেও—নন্দনকাননের উপর ঝোঁকটা কম। বাড়ী এবং পুকুর বজায় রেখেও তাঁরা নন্দনকাননে বিশ্বকর্ম্মার আসর বসিয়েছেন—বাগানটাকে পরিণত করেছেন কারখানায়।

বাগানে ঢুকেই চোখে পড়ে পাঁচ-ছটা বড় বড় টিনের শেড।

অমলবাবুর মোটর দাঁড়াতেই ছুটে এল কারখানার ম্যানেজার। সুস্থ সবল লোকটি, কপালের নীচে নাকের উপরে পাঁচের খাঁজের মত একটা খাঁজ লোকটির চেহারার বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য তার মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য। ছুটে এসে নিজে মোটরের দরজা খুলে দিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে হেসে বললে—গুড মর্নিং সার্!

অমলবাবু হেসে তার হাত চেপে ধ'রে বললে—গুড মর্নিং! কেমন আছেন জিতুদা?

—আপনাদের দয়াতেই বেঁচে আছি ভাই! জিতুদা হাসলে।

—কাজ কেমন চলছে?

—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছি ভাই। আজ নিজে হাতুড়ি ধরেছিলাম। লোকের অভাব হচ্ছে। লেবার পাচ্ছি নে।

অমল বললে—কি খাওয়াবেন বলুন? আমি আপনার লেবারের ব্যবস্থা—অবশ্য অল্পস্বল্প, ক'রে এসেছি। পারমানেণ্ট লেবার, এইখানেই থাকবে। জন দশেক পুরুষ, জন বারো মেয়ে, আর ছেলেও কতকগুলো আছে, তার মধ্যেও কয়েকজন দিয়ে কাজ চলবে।

অমল বললে সমস্ত বিবরণ।

ম্যানেজার জিতুবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠল। লোকটির উৎসাহ অসাধারণ।

অমল আবার বললে—ভারি দুঃখ হ'ল জিতুদা! আশ্রয়হীন হয়ে চলেছে বেচারারা। ভাবলাম আশ্রয় দিলে ওদেরও উপকার হবে, আমাদেরও হবে।

জিতুবাবুর দৃষ্টি সকরুণ হয়ে উঠল, বললে—আপনার কল্যাণ হবে ভাই।

অমল হাতের ঘড়ি দেখে বললে—চালের গুদোমটা দেখব। আপনি দেখছেন তো? খারাপ না হয়!

—আমি দু' বেলা দেখি! আসুন নিজের চোখে দেখুন।

টিনের শেডের মধ্যে একটা গুদাম; উপরে টিনের ছাউনি—চারিপাশে ইঁটের দেওয়াল। দরজাটা খুলতেই কানাই বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেল। একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চালের বস্তায় ঠাসা।

অমলবাবু নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে ঘুরে দেখলে। কানাই দেখলে অমলের চেহারা পাল্টে গেছে—জিতুবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সমস্ত প্রকাশ নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে তার অবয়ব থেকে।

বেরিয়ে এসে বললে—ঠিক আছে।

আবার কয়েক পা এসে প্রশ্ন করলে—আড়াই হাজার বস্তা আছে না?

জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বললে—হ্যাঁ।

বাকী পাঁচটা শেডের তিনটের মধ্যে ছোটখাটো একটা লোহার কারখানা। লেদ যন্ত্রে কাজ চলছে। নাট কাটাই হচ্ছে। দু'তিনটে বিভিন্ন মাপের হাজার হাজার নাট। মিলিটারী কনট্রাক্টের মাল।

বাকী দুটো টিনের শেড নতুন তৈরী হয়েছে। তার চারিপাশ ইঁট দিয়ে গাঁথা হচ্ছে।

অমলবাবু প্রশ্ন করলে—এ দুটোতেও বোধ হয় আড়াই হাজার ক'রে পাঁচ হাজার বস্তা ধরবে, কি বলেন?

জিতুবাবু বললে—বেশী ধরবে। মাপে ওটার চেয়ে লম্বায় পনেরো ফুট বেশী আছে।

অমল হেসে বললে—আপনি একজন ওয়াণ্ডারফুল লোক জিতুদা!

আবার অমলবাবু পাল্টে গেছে।

জিতুবাবু বললে—আপনাদের কাজ একদিকে, আমার প্রাণ একদিকে। —আপনার বাবা আমার কাছে দেবতা।

অমল হেসে বললে—দেবতার ছেলেকে চা খাওয়াবেন চলুন। পরমুহূর্তেই সজাগ হয়ে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুলেছি। ওঃ, আমার ভুল হয়ে গেছে। ইনি আমার বন্ধু—কানাই চক্রবর্তী। আর ইনি আমার স্বনামধন্য জিতুদা—জিতেন্দ্র বোস।

জিতু বোস সামনে ঝুঁকে প'ড়ে সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে বললে—আমার সৌভাগ্য!

কানাই নমস্কার করতে যাচ্ছিল—কিন্তু জিতু বোসের প্রসারিত হাত দেখে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে।

অমল বললে—উই আর ফ্রেণ্ড্স্, বুঝলেন জিতুদা!

অমলবাবু অদ্ভুত! অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলেছে হাসিমুখে। কানাই অবাক হয়ে গেল।

আপিসে ফিরেই অমল আবার বের হ'ল। সরবরাহ বিভাগের প্রকাণ্ড আপিস। কানাইকে সে সঙ্গে নিলে। চারিদিকে সামরিক পোশাকে ভূষিত আর্দ্দালী কর্ম্মচারী গিস্‌গিস্ করছে। কানাই বিস্মিত হয়ে গেল একজন বামন আর্দ্দালী দেখে। লোকটা লম্বায় বোধ হয় তিন ফুটের চেয়েও কম। অমলকে দেখে সসম্ভ্রমে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। অমল অভিজাত হাসি হেসে প্রত্যভিবাদন করলে তাকে এবং হাতে যেন কিছু গুঁজেও দিলে। তারপর কানাইকে বললে—বাইরেই একটু অপেক্ষা করুন আপনি। আমি আসছি। বামনটা সসম্ভ্রমে কানাইকে বসতে দিলে একখানা চেয়ারে।

কানাই ওই বামনটার কথা ভাবছিল। মনে পড়ল লঙ্কার যুদ্ধে সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের কথা। যন্ত্র, পায়রা. ঘোড়া, অশ্বতর, গরু, উট, হাতী—কত শক্তি যে নিয়োজিত হয়েছে এই যুদ্ধে! মানুষের তো কথাই নাই! আজ ওই বামনটার শ্রমশক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—আজ চল্লিশ কোটি লোকের শক্তি কি অসাধ্য-সাধনই না করতে পারত!

—মিস্টার চক্রবর্ত্তী!

অমল ডাকছে। কানাই এগিয়ে গেল। অমল তাকে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। সামরিক পোশাক পরা একজন সাহেবের সঙ্গে তার

আলাপ করিয়ে দিয়ে অমল বললে—আমি নিজে নেহাৎ আসতে না পারলে এঁকেই পাঠাব।

সাহেব সাগ্রহে কানাইয়ের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে—আমি ভারি খুশী হলাম মিঃ চক্রবর্ত্তী!

বেরিয়ে এসে অমল গাড়ীতে চ'ড়ে হেসে একটা ঘড়ি বের ক'রে দেখিয়ে বললে—সাহেবের কাছে ঘড়িটা কিনলাম! কত টাকায় জানেন?

ঘড়িটা সোনার।

অমল হেসে বললে—এক হাজার টাকায়।

তারপর বললে—আপনার পয় ভাল! একটা বড় অর্ডার পেয়েছি।

আপিসের শেষ ঘণ্টায় অমল বললে—কানাইবাবু, ও ঘরে কয়েকজন কামার এসেছে। জঙ্গল কাটিং ছুরি তৈরীর অর্ডার নিতে। আমরা লোহা দেব, ওরা তৈরী ক'রে দেবে, আমরাই কাঠের হাতল দেব—সেগুলো ফিট ক'রে দেবে। আমরা তৈরীর খরচ ছুরি পিছু দেড় টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। আপনি দেখুন কততে ওদের সঙ্গে সেট্‌ল্‌ করতে পারেন।

দেশী লোহার কারিগর। কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের খবর রাখে। তারা বললে—দু'টাকার কম পারব না। আমাদের দু'টাকা দিলেও আপনাদের অনেক লাভ থাকবে।

কানাই নিজের কৃতিত্ব দেখাতে বদ্ধপরিকর। দর করার বিদ্যাটায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও 'দর করিতে হয়' কথাটা, 'কখনও কাহাকেও বঞ্চনা করিও না' কথাটার আগেই তার কানে এসেছে এবং কি ক'রে দর করতে হয় তার পদ্ধতিও শুনেছে। সে বললে—এক টাকা বারো আনার বেশী কোম্পানী দিতে পারবে না। তোমরা না পার কি করব, অন্য লোক দেখব আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ দৃঢ় ভাবেই উঠে দাঁড়াল সে।

ওরা এবার কানাইয়ের দৃঢ়তা দেখে দ'মে গেল, একজন বললে—যাক্ বাবু, এক টাকা চৌদ্দ আনা ক'রে দেন। আর আপত্তি করবেন না।

দ্বিধা ভরেই কানাই এসে সেই কথা অমলকে জানালে। অমলবাবু হেসে বললে—একটু চেপে ধরলে আরও কম হ'ত! যাক গে! সঙ্গে সঙ্গে এল এক ভাউচার—সাড়ে বাষট্টি টাকা দালালী হিসাবে পাওনা হয়েছে কানাইয়ের। কানাই বিস্মিত হয়ে গেল।

অমল বললে—মেকিং চার্জ আমাদের ধরা ছিল দু'টাকা। আপনি দু'আনা কমিয়েছেন, সুতরাং তার অর্দ্ধেক এক আনা আপনি পাবেন—এই আমাদের নিয়ম।

কানাই টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে এল মোহগ্রস্তের মত।

সাড়ে বাষট্টি দ্বিগুণে একশো পঁচিশ টাকা! টাকাটা পাওয়ার কথা ছিল ওই কামার দু'জনের। তার মন কেমন যেন অশান্ত হয়ে উঠছিল।

অমল বললে—কাল এগারোটার মধ্যে আসবেন কিন্তু।

কানাই কার্জন পার্কে এসে বসল।

কিছুক্ষণ পর তার মনে হ'ল অমলের কথা। আরও কমে হ'ত! অর্থাৎ কানাইয়ের জন্যই তারা বেশী পেয়েছে! এতে সে খানিকটা সান্ত্বনা পেলে। সে উঠল। আপিস ভেঙেছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড় ধরছে না। এস্প্ল্যানেডের ট্রামের শেডে এসে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল নীলার সঙ্গে। মুহূর্ত্তে তার মনের অবসাদ কেটে গেল।

নীলা দাঁড়িয়ে ছিল সাময়িক পত্রের স্টলের ধারে। সে তার পিছনে এসে সকৌতূহলে দাঁড়াল। নীলা কিন্তু একমনে সাজানো কাগজগুলোর

উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। সে আরও একটু ঝুঁকে পড়ল, তার উষ্ণ নিশ্বাস গিয়ে লাগছে নীলার গলার পিছনে।

নীলা এবার দেহখানা ঈষৎ বাঁকিয়ে পিছনের দিকে ফিরে চাইল। শ্যামল মুখশ্রীতে দৃপ্ত ভ্রূভঙ্গী চমৎকার ফুটে উঠেছে! মুহূর্ত্তে ভ্রূভঙ্গী মিলিয়ে গেল, সস্মিত প্রসন্নতায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আপনি!

—হ্যাঁ, কমরেড। সে আজ মিস্ সেন বললে না, প্রথমেই বললে কমরেড। পরমুহূর্ত্তেই সে আশেপাশের জনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বললে—এখানে নয়, কফিখানায় চলুন। আজ আমি কফি খাওয়াব।

নীলা হেসে বললে—শোধ দিচ্ছেন?

—না। শোধ নয়। আমি আজ প্রথম উপার্জ্জন করেছি। চলুন অনেক কথা আছে।

—চাকরী করছেন? সে কি! পড়া ছেড়ে দিয়েছেন আপনি?

পড়া ছেড়েছি। তবে চাকরী নয়। ব্যবসা—বিজনেস।

—বিজনেস?

—হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু কফিখানাতে বিষম ভিড়। সেখানে কানাই বলতে পারলে না তার কথা। তার জীবনে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে এসেও দিয়ে গেছে পরম কল্যাণকর মুক্তি, সেই কথা সে এখানে বলতে পারলে না। খেতে খেতে হ'ল অন্য কথা। পার্টির কথা।

বেরিয়ে এসে নীলা বললে—কই, আপনার কথা তো কিছু বললেন না?

কানাই বললে—পার্কে যাবেন?

চারিদিকে ধূসর হয়ে এসেছে, রাস্তার আলো জ্বলছে; নীলা সেই দিকে তাকিয়ে বললে—অন্ধকার হয়ে গেছে। বাবা হয়তো ভাববেন।

—তবে? আমার যে অনেক কথা!

—সংক্ষেপে বলুন।

কানাই বললে—সংক্ষেপে বলা যায় না। সে অনেক কথা। সেদিন বলি নি; এইবার বলতে চাই আপনাকে।

নীলা বললে—তা হ'লে পরশু—শনিবার। কার্জন পার্কে দেখা হবে। তারপর বরং ইডেন গার্ডেনে যাব। কেমন?

—বেশ। আমি অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকব!

নীলা হেসে বললে—হয়তো আমাকে দেখতে পাবেন অপেক্ষা ক'রে থাকতে। কারণ, শুনবার আগ্রহ আপনার বলার আগ্রহের চেয়ে বেশী।

কানাই বললে—তবে একটু বলি। ব'লে সে আবেগ ভরেই বললে—আমি মুক্তি পেয়েছি কমরেড। বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। আমি বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি।

নীলা সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

কানাই বললে—আমি শুধু মানুষ আজ, মুক্ত মানুষ; মুক্ত পৃথিবীতে নূতন ক'রে গড়ব—আমার ঘর—আমার জীবন। তারই পরামর্শ চাই আমি তোমার কাছে নীলা। তোমাকে 'তুমি' বলছি—তুমি কি রাগ করবে?

নীলা হেসে বললে—না।

ট্রাম এসে পাশে দাঁড়াল।

বাসায় অর্থাৎ বিজয়দার বাসায় এসে কানাই দেখলে বিজয়দা ভয়ানক ব্যস্ত। নীচে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ষষ্ঠীকে হাঁকডাক শুরু ক'রে দিয়েছেন। ষষ্ঠী গেছে ট্যাক্সি আনতে।

একটি ভিক্ষুক শ্রেণীর মেয়ে কোন দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; গীতা তাকে বাতাস করছে। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে দু'টি ছেলে; ওই

মেয়েটির ছেলে সে দেখেই বুঝতে পারা যায়। তারা কাঁদছে মায়ের যন্ত্রণা দেখে বোধ হয়।

মেয়েটি আসন্নপ্রসবা, প্রসববেদনায় অধীর হয়ে উঠেছে।

জাতিতে মুসলমান; বাড়ী দক্ষিণ-বঙ্গে। গত ঝড়ে স্বামী মারা গেছে; সামরিক বিভাগের নির্দ্দেশে গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে এসেছিল মহানগরীতে অন্ন এবং আশ্রয়ের সন্ধানে, দুটি ছেলের হাত ধ'রে এবং একটিকে গর্ভে নিয়ে। গর্ভের শিশু আজ ধরিত্রীর বক্ষ স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

বিজয়দার আপিস চারটের পর। তিনি আপিসে যাবার জন্যে বের হয়ে বাড়ীর সামনেই মেয়েটিকে দেখতে পান, অল্প আবর্জ্জনা ভরা একটা ডাস্টবিনে মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাতরাচ্ছিল; পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ছেলে দু'টি। বিজয়দা ষষ্ঠীকে পাঠিয়েছেন ট্যাক্সি আনতে। হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

তিনি শুধু প্রশ্ন করলেন—সকালে গিয়ে সমস্ত দিন কোথায় ছিলি? গীতার কথা তোর ভাবা উচিত ছিল।

একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার উপর ষষ্ঠী।

(এগারো)

কানাই ডাকলে—গীতা!

কোন সাড়া এল না।

সে আবার ডাকলে। এবারও সাড়া না পেয়ে সে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কাল রাত্রে এসে থেকেই গীতা রান্নাঘরের মধ্যেই বেশীর ভাগ থাকবার চেষ্টা করছে। রাত্রে বিজয়দা হুকুম ক'রে তাকে এ ঘরে শুতে বাধ্য করেছিলেন। হুকুম অমান্য করবার মত শক্তি গীতার নাই। গীতার স্বভাবই অবশ্য কোমল, তবু এ নমনীয়তার মধ্যে দারিদ্র্যজনিত

ভীরুতার প্রভাবটাই বেশী। অল্পক্ষণের আচরণের মধ্যে—ও যে এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, ও যে এখানে একান্তভাবে দয়ার উপর নির্ভর ক'রে রয়েছে, সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানাইয়ের মন করুণায় ভ'রে উঠল। রান্নাঘরের দরজা ঠেলে সে ডাকলে—গীতা!

এখানেও গীতা নাই। ষষ্ঠী ব'সে ব'সে বিড়ি টানছে। কানাইকে দেখে সে বিড়িটা মুখ থেকে নামালে।

কানাই উদ্বিগ্ন হয়েই বললে—গীতা কোথায় গেল ?

ষষ্ঠী তার মুখের দিকে চেয়ে এবার উত্তর দিলে—আমাকে বলছেন ?

বিরক্তিভরেই কানাই বললে—আবার কাকে বলব ?

ষষ্ঠী বললে—চানের ঘরে গিয়েছে। চান করছে।

—স্নান করছে ? শীতের দিনে সন্ধ্যাবেলা স্নান করছে কেন ?

—তা জানি না আমি। জিজ্ঞেস তো'করি নাই! বললে—ষষ্ঠী-দাদা, আমি চান ক'রে আসি।

গীতা বেরিয়ে এল স্নানের ঘর থেকে। পরনে তার একখানা ধুতি, মাথার চুল ভিজে এলানো পিঠের উপর আছে। সে একটু বিনীত ম্লান হাসি হাসলে।

কানাই বললে—তুমি স্নান করলে গীতা এই সন্ধ্যাবেলা ?

মৃদুস্বরে গীতা বললে—ওই মেয়েটিকে ছুঁলাম নাড়লাম, তাই।

কানাই স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মানুষকে তুমি এত অপবিত্র ভাবো গীতা ? ছি!

গীতা একবার মুহূর্ত্তের জন্য তার ভীরু দৃষ্টি তুলে কানাইয়ের দিকে চেয়ে পরক্ষণেই নিতান্ত অপরাধীর মত দৃষ্টি নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল; স্থির মূর্তি, সর্ব্বাঙ্গে তার অপরাধের স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে। কানাই তাকে আর কিছু বলতে পারলে না। বরং তার করুণা হ'ল। এবং এই করুণাবিষ্ট মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টিতে গীতার পরনের

ধুতিখানা চোখে পড়ল বিশেষ অর্থ নিয়ে। তাই তো! গীতা তো এক-কাপড়ে চ'লে এসেছে! তার তো কাপড়-জামার প্রয়োজন! শুধু গীতা নয়, তার নিজেরও জামাকাপড় চাই! সকালে উঠেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল; আজ দিনে স্নানের অবসর হয় নাই। সুতরাং নিজের জামাকাপড়ের প্রয়োজনের কথাও মনে হয় নাই।

গীতাকে সস্নেহে সে বললে—উনোনের ধারে আগুনের আঁচে ব'স একটু। এই শীতের দিন। তাই বলছিলাম। তা ছাড়া গীতা, ছোঁয়া-নাড়ার বিচারটাকে একালে আমরা ভুল বলি—ওইটাকেই আমরা অপরাধ বলি।

গীতা চুপ ক'রেই রইল। কানাই তাকে আবার বললে—যাও উনোনের কাছে একটু ব'স।

কোনক্রমে এবার গীতা বললে—রান্না হচ্ছে উনোনে।

—হোক না।

—আমার ছোঁয়া প'ড়ে যাবে হয়তো!

বিদ্যুৎচমকের মত কানাইয়ের মাথায় গীতার কথার ইঙ্গিত খেলে গেল। সে নিজে প্রাচীন চক্রবর্ত্তী-বংশের ছেলে। সেখানে পাপকে কেউ মানুক আর না-ই মানুক—পাপ-পুণ্যের বিধান সে বাড়ীর সকলের মুখস্থ। একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে তার দেহের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, প্রচলিত দেশাচারের বিধানে গীতা তাতে নিজেকে অস্পৃশ্য ভাবছে। কানাই ব'লে উঠল—না না গীতা। না!

গীতা তার মুখের দিকে এবার চোখ তুলে চাইলে।

কানাই বললে—তুমি দেবতার পূজোর ফুলের মত পবিত্র। তুমি ওসব ভেবো না। নিষ্পাপ তুমি। সে পরম স্নেহভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—উনোনের ধারে গিয়ে ব'স। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি। কাপড় জামা চাই তো!

কানাই পথে বেরিয়ে ভাবছিল—গীতাকে নিয়ে সে কি করবে? তার জীবনের এই অকারণ অপরাধবোধ—হীনতাবোধ কি কখনও কাটবে?

গীতা কানাইয়ের কথা অমান্য করলে না। শীতেও বেলায়-অবেলায় স্নানে সে অনভ্যস্ত নয়—তবুও শীত করছে। গায়ে জামা পর্য্যন্ত নাই। উনোনের ধারে ব'সে সে আরাম বোধ করলে। গন্‌গনে কয়লার আঁচ। আগুনের রক্তাভ দীপ্তির দিকে চেয়ে সে ব'সে রইল। এমনি ভাবে উনোনের ধারে ব'সেই তার সন্ধ্যে কাটত। বাড়ীতে রান্না করত সে-ই। অবশ্য কিছুদিন থেকে অভাবের দরুন সব দিন ঘরে উনোন জ্বলত না। আজ বাড়ীতে উনোন জ্বলেছে কি না কে জানে? সে শিউরে উঠল। তাকে বিক্রী ক'রে সংসারে উনোন জ্বালবার ব্যবস্থা কতখানি পেটের জ্বালায় প'ড়ে যে তার বাপ-মা করেছিলেন, ভেবে তার বুকের ভেতরটা টনটন ক'রে উঠল মমতায়-দুঃখে-ধিক্কারে। মনে পড়ল তার মায়ের কথা—তার মা সুশ্রী ছিলেন—তাঁর বুকের প্রতিটি পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তিনি হয়তো কাঁদছেন, তারই জন্যে কাঁদছেন। হীরেন, তার ভাই, হয়তো ঘরেই আসে না, সে বাড়ীতে নাই ব'লেই আসে না।

তার বাপ—কাশি-হাঁপানীর রোগী—বিছানার উপর ব'সে বিড়ি টানছেন, কাশছেন, হাঁপাচ্ছেন।

গীতার কল্পনা কল্পনা নয়। বাস্তবে দেখা ছবি। সে যেমন মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছিল, বাস্তবেও তার পুনরাবৃত্তি ঠিক ঘটছিল। গীতার বাবা সত্যই হাঁপাচ্ছিল। বরং গীতার কল্পনাকে বাস্তবের চেয়ে খানিকটা কমই বলতে হবে। কারণ গীতার বাপ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল—ঠিক এই সময়ে। নিষ্ঠুর ভাবে রোগটা আক্রমণ করেছিল তাকে। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। গীতার মা সরোজিনী খানিকটা

গরম তেল নিয়ে বুকে মালিশ ক'রে দিচ্ছেন। ছেলে হীরেন ভাগ্যক্রমে ঘরে এসে পড়ছিল—সে পাখা নিয়ে হাওয়া করছিল। ঘরটা অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ,—কারও মুখে কথা নাই। প্রদ্যোত ভট্চাযের হাঁপানী এত বেশী যে হাঁপানীর অবসরে একটু কাতর শব্দও বেরিয়ে আসতে পারছে না। বাইরে রাত্রের আকাশে প্লেন উড়ছে।

অনেকক্ষণ পর ঈষৎ সুস্থ হয়ে প্রথমেই প্রদ্যোত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল শব্দায়মান প্লেনগুলোর ওপর। দাঁত খিঁচিয়ে সে প্রথমেই ব'লে উঠল—দে—দে গোটা কতক বোমা আমার ওপর ফেলে দে! আমি ম'রে বাঁচি! আঃ—আঃ—আঃ!

গীতার মা প্রশ্ন করলে—একটু জল খাবে?

—জল? দাও।

জলের গ্লাস পরিপূর্ণ ক'রেই রাখা ছিল—সরোজিনী গ্লাসটি তুলে ধরলে মুখের কাছে, সাগ্রহে চুমুক দিয়েই প্রদ্যোত বিকৃত মুখে ফু-ফু ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে বললে—ক্লোরিনের গন্ধ! কলের জল কেন?

সরোজিনী চুপ ক'রে রইল। প্রদ্যোত চীৎকার করে উঠল—তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

এবার সরোজিনী বললে—টিউবওয়েলের জল কে আনবে? ওই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করা হ'ল গীতার। গীতাই আনত টিউবওয়েলের জল। প্রদ্যোত টিউবওয়েলের জল খায়।

প্রদ্যোৎ এবার মাথা হেঁট ক'রে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর অকস্মাৎ কপালে হাত রেখে আর্ত্তস্বরে ডেকে উঠল—ভগবান!

সরোজিনীর চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে আসছিল—দুটি শীর্ণ ধারায়; হীরেনের চোখেও জল এসেছিল—পাখাটা রেখে সে হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছলে। প্রদ্যোত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হীরেনের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়ে বললে—তুমি পারো না?

রাস্তার ধারে টিউবওয়েল, নবাবপুত্তুর—তুমি এক কুঁজো জল আনতে পারো না?

একলাফে হাত দুয়েক পিছনে স'রে এসে হীরেন চীৎকার ক'রে উঠল—না, পারব না—পারব না আনতে।

হীরেনের চীৎকার শুনে মা-বাপ দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। হীরেন ব'লেই চলেছিল—কেরোসিনের লাইনে দাঁড়াতে হবে, চিনির লাইনে যেতে হবে, পয়সা পর্য্যন্ত আমাকেই দিতে হবে। অ্যাঃ, আবার মারছে দেখ না!

হীরেন নিজেই কিছু এখন উপার্জ্জন করতে শিখেছে। একদা সে বাড়ী থেকে চুরি ক'রে সংগ্রহ করেছিল বারো আনা পয়সা; সেই পয়সাকে মূলধন ক'রে সে নিত্য নিয়মিত সকালে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে সিনেমা হাউসে সাড়ে চার আনার টিকিট-ঘরের সামনে। বিকেলবেলা সেই টিকিট সে চড়া দামে বেচে। আজকাল সরকারের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অনুযায়ী চিনি বিক্রী হয়—মাত্র কয়েকটি দোকানে; দোকানের সামনে 'কিউ' ক'রে লোক দাঁড়ায়; সেই 'কিউয়ে' দাড়িয়ে হীরেন কন্‌ট্রোলের দরে চিনি কিনে চড়া দামে বেচে দেয় চায়ের দোকানে। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত তার এলাকা। চলন্ত ট্রামে সে ওঠে নামে অবলীলাক্রমে; বিশখানা ট্রাম বদল ক'রে বিনা ভাড়ায় তার যাতায়াত চলে অবাধগতিতে। কয়েকজন বাস-কণ্ডাক্টারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা আছে, তাদের বাস পেলে সে অবশ্য বাসেই যায়, ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে সে কণ্ডাক্টারকে সাহায্য করে; চীৎকার করে—লেক, কালীঘাট, আসুন বাবু আসুন! চলন্ত বাসে যারা চড়ে তাদের সে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নেয়, ডবল ডেকারের উপরতলায় যেতে অনুরোধ করে—উপর যাইয়ে বাবু, উপর যাইয়ে,—একদম খালি, একদম খালি।

হীরেনের রূঢ় নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে হিংস্র বিদ্রোহ যেন ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে

জ্বলছিল। বাড়ীর অসহনীয় অভাব-দুঃখ তাকে ইদানীং অবশ্য প্রত্যক্ষ-ভাবে স্পর্শ করে না; অনাহারে সে থাকে না—বাইরে খেয়ে আসে; জামা হাফপ্যাণ্টও তার জীর্ণ নয়, চোরাবাজার থেকে জামাকাপড়ও সংগ্রহ করেছে। তবুও যতটুকু সময় সে বাড়ীতে থাকে সেই সময়টুকুর মধ্যে মা-বাপ বিশেষ ক'রে দিদি গীতার দুঃখকষ্ট তাকে পীড়া দেয়। মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে; বাড়ী থেকে পালাবার জন্যে সে অস্থির হয়। সব চেয়ে তার বেশী রাগ হয় বাপের ওপর। মনে হয়—অক্ষম, অপদার্থ চিররোগীটাই সকল দুঃখকষ্টের মূল! অতি দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতির পর সে যেদিন বাড়ী ফিরত, সেদিন রুগ্ন প্রদ্যোত নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রহার করত। হীরেন দাঁতে দাঁত টিপে সে প্রহার সহ্য করত আর মনে মনে বলত—মর, মর, তুমি মর। পরশু পর্য্যন্তও সে এর বেশী কিছু করতে সাহস করে নি। পরশু রাত্রে গীতার নিরুদ্দেশের পর থেকে আজ দু' দিন সে ক্রমাগত ঘুরেছে তার দিদির সন্ধানে। এই নিরুদ্দেশ হওয়ার অর্থ সে তার বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বুঝেছে। গীতার সন্ধানে সে নানা বস্তীর গলি-ঘুঁজি ঘুরে অত্যন্ত তিক্ত চিত্ত নিয়ে আজ বাড়ী ফিরেছিল, এবং এর জন্য সে মনে মনে গীতাকে কানাইকে অভি-সম্পাত দিয়েছে, কিন্তু দায়ী করেছে তার অক্ষম অপদার্থ বাপকে;—কেন সে গীতার বিয়ে দেয় নি? সেই অবস্থায় ওই পাখার এক আঘাতেই সে বিস্ফোরক বস্তুর মত ফেটে পড়ল।

কয়েকটি দ্রুততম মুহূর্ত্ত পরেই স্তম্ভিত ভাবকে অতিক্রম ক'রে সরোজিনী সভয়ে কাতর অনুরোধে ব'লে উঠল—হীরেন! হীরেন!

গর্জ্জন ক'রে হীরেন বললে—না।

রোগের তীব্রতার তিক্ত-চিত্ত প্রদ্যোত অপমানক্ষুব্ধ পিতৃত্বের দাবী নিয়ে মুহূর্ত্তে বিছানা ছেড়ে পাখাটা হাতে উঠে দাঁড়াল।—খুন ক'রে ফেলব তোকে।

সরোজিনী দু'হাত দিয়ে তাকে আটকাল—কাতর অনুরোধে বললে—না না, ওগো না।

স্থির হিংস্র তির্য্যক্ দৃষ্টিতে চেয়ে হীরেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে, এক চুল সে নড়ল না, প্রতি ভঙ্গিমার মধ্যে আক্রমণের উদ্যত ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; প্রদ্যোত থমকে গেল। সরোজিনী এবার তার পা জড়িয়ে ধরলে, বললে—তোমার পায়ে ধরি গো, আর সর্ব্বনাশ ক'রো না।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রদ্যোতের ক্রোধ ফেটে পড়ল সরোজিনীর উপর। হাতের পাখাটা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে বললে—তুই—তুই—তুই আমার সকল দুর্ভাগ্যের মূল! তুই—তুই—তুই!

মুহূর্ত্তে হীরেন লাফিয়ে পড়ল বাপের ওপর। এক ধাক্কাতেই প্রদ্যোত মাটিতে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হীরেন প্রচণ্ড টানে বাপের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তাকেই নিষ্ঠুরভাবে প্রহার আরম্ভ করলে।

—ওরে হীরেন! হীরেন—হীরেন! চীৎকার ক'রে সরোজিনী ছুটে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে। হীরেন মুখ ফিরিয়ে একবার মায়ের দিকে চেয়ে একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলে হাতের পাখাটা ফেলে দিলে, বললে—ছেড়ে দাও আমাকে।

—না। সরোজিনী আবার চীৎকার ক'রে উঠল—তুই পালিয়ে যাবি!

সবল বাহু দিয়ে ঠেলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে হীরেন বললে—হ্যাঁ। ব'লেই হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপর এসে-পড়া চুলগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে সে বেরিয়ে চ'লে গেল। কোথায় সে যাবে, কি সে করবে, সে চিন্তা তার মুহূর্ত্তের জন্য হ'ল না। সে-জন্য সে নিশ্চিন্ত। উপার্জ্জনের বহু পন্থা সে জানে, আরও বহুতর পন্থার কথা সে শুনেছে। অন্ধকার গলিতে দুর্ব্বলের কাছে তার যথাসর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়া যায়; লোককে ঠকিয়ে উপার্জ্জন করা যায়; যে পল্লীতে অবাধে চলে ব্যভিচার, সে পল্লীতে গলিঘুঁজি চিনে বাবুদের পথ দেখাতে

পারলে, গভীর রাত্রে গোপন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মদ এনে দিতে পারলে টাকা মেলে।

অন্ধকারের মধ্যে মিশে গলি-পথে ঘুরে সে এসে উঠল বড় রাস্তার ধারে একটা উন্মুক্ত জায়গায়। এখানে ওখানে স্লিটট্রেঞ্চ। ওপাশে কয়েকটা খিলেন করা এয়ার-রেড শেল্টার; সে নিঃশব্দে গিয়ে ওই একটা শেল্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গোল খিলেনের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার; সঙ্কীর্ণ-পরিসর জায়গা। সন্তর্পণে সে অগ্রসর হ'ল। ভিতরটায় একটা উগ্র গন্ধ উঠছে। মেঝেটা পিছল। সম্মুখে ওপাশে কতকগুলো জ্বলজ্বল করছে কি? ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠছে। মুহূর্ত্তের জন্য হীরেন চঞ্চল হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই সে ব'লে উঠল—শালা! গরু! শীতের প্রকোপে গরুগুলো এর মধ্যে ঢুকেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে সে জ্বেলে দেখলে তার অনুমান সত্য। দেশলাইয়ের কাঠির আলোতে এপাশ ওপাশ ভাল ক'রে দেখে একটা শুকনো কোণে সে ঠেস দিয়ে বসল, যাতে গরুগুলো তাকে রাত্রে না মাড়িয়ে দেয়।

আকাশে প্লেন উড়ছে। একটি বিড়ি ধরিয়ে সে বিকৃত মুখে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠল—দূ-র শা-লা! দে, বোমা ফেলে পৃথিবী চুরমার ক'রে দে, তবে তো বুঝি! তার বাপের মতই সে সমস্ত পৃথিবীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে যা কিছু তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখ-তৃপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সব চুরমার হয়ে গেলে—সে অবাধে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে ভোগ ক'রে নেবে। এ কামনা তার আজ নতুন নয়; কতদিন সে কামনা করেছে, ভূমিকম্প হয়ে সব ভেঙেচুরে যাক, অথবা মহামারী হয়ে ম'রে যাক অধিকাংশ মানুষ! কখনও কখনও মনে এই কামনা অতি বিচিত্র আকারে উদিত হয়েছে—তখন সে কামনা করেছে, আজ যদি সে এমন অলৌকিক শক্তি

লাভ করে, যাতে বন্দুক কামানের গুলি তার বুকে ঠেকে পাপকের মত প'ড়ে যায় যাকে সে বলে; 'মরে যাও' সেই ম'রে যায়; যাকে সে বলে 'বেঁচে ওঠ' সেই বেঁচে ওঠে—আঃ! তবে কেমন হয়! আজ মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ শুনে সেই তিক্ত কামনাতেই তার মনে হ'ল বোমার কথা।

(বারো)

কানাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। বিজয়দা ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। গত রাত্রির মত তারা দুজনে বাইরের বারান্দাতেই শুয়েছিল। গীতা শুয়েছিল ঘরের মধ্যে।

বিজয়দার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে ব'সে কানাই বললে—ইস্, বড্ড বেলা হয়ে গেছে!

হাসিটা বিজয়দার অভ্যাসের চেয়েও বেশী, মুদ্রাদোষ বললেই যেন ঠিক বলা হয়। কৌতুকে তো হাসা স্বাভাবিক, বিজয়দা দুঃখেও হাসেন, রাগলেও হাসেন, কাঁদবার সময়ে হাসেন কি না বলা যায় না, কারণ কাঁদতে তাকে কেউ দেখে নি। হেসে বিজয়দা বললেন—তুই ভাই, একটা স্লিপিং গাউন আর একজোড়া ঘাসের চটি কিনে ফেল্; তা হ'লে সাড়ে আটটায় ঘুম ভাঙলেও লজ্জা পাবে না তোর। আর যদি পাইপ ধরতে পারিস তবে তো দশটাতেও দোষ হবে না। ধূসর মধ্যবিত্ত থেকে খাঁটি মধ্যবিত্তত্বে পৌঁছে যাবি। খাঁটি পেটি বুর্জোয়া।

কাল রাত্রে বিজয়দাকে কানাই বলেছিল—তার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অভিযানের কথা।

কানাই অপ্রস্তুত হয়েই বললে—আচ্ছা, কাল দেখব তুমি সকালে ওঠ, না আমি উঠি।

—বাজি রাখিস নে, হেরে যাবি কিন্তু।

—তা হ'লে আমি বাজিই রাখছি।

হেসে বিজয়দা বললেন—দেখ্, আমি খুব বড় আয়ুর্ব্বেদবিদের কাছে শুনেছি যে, রোগের দু' রকম উপসর্গ আছে, একরকম উপসর্গ হ'ল প্রকট যন্ত্রণাদায়ক, সেগুলো সাধারণ চিকিৎসকেও বুঝতে পারে; আর একরকম উপসর্গ আছে সেগুলো অপ্রকট, সহজ দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না। যেমন ধর্, ডিস্পেপ্সিয়ার রোগীর বদ্হজম, পেটব্যথা, ঢেকুর তোলা—এগুলো হ'ল প্রকট উপসর্গ। কিন্তু অপ্রকট উপসর্গ হ'ল, অম্বুলে জিনিসগুলোর ওপর রুচি, লোভ, আর পেঁপে পলতার ওপর অরুচি। তারপর ধর্, টাকের রোগীর কথা। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া চক্চক্ করা ওগুলো হ'ল, প্রকট লক্ষণ; অপ্রকট লক্ষণ হ'ল, টাকে হাত বুলানো। সুখেও হাত বুলোচ্ছে; চিন্তা থাকলে তো কথাই নাই, নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও, মানে চিন্তার অভাবেও হাত বুলোয়। তেমনি টাকার অর্থাৎ বুর্জ্জোয়াত্বের প্রকট লক্ষণ হ'ল, দাম্ভিকতা কর্ত্তৃত্বাভিলাষ ইত্যাদি, আর অপ্রকট লক্ষণ হ'ল দেরীতে ওঠা, বড় বড় কথা বলা, পাইপ, স্লিপিং গাউন ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় বলে, লক্ষ টাকার ঘুম! তোর বাষট্টি টাকাই কি কম নাকি?

কানাই বিজয়দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে!

বিজয়দা বললেন—কি? চ'টে গেলি নাকি?

—না। কিন্তু তুমি কি বল এ কাজ আমি করব না?

—যা, আগে মুখ হাত ধুয়ে আয়। ওই দেখ্ গীতা চা নিয়ে এসেছে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে গীতা আসছে, তার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

বিজয়দা বললেন—গীতাকে আজ কাজে লাগিয়েছি। দেখ্ তো কেমন সুন্দর শান্ত মেয়ে!

কানাই হাসলে স্নেহের হাসি। গীতা শীতের দিনে এই সকালেই

স্নান ক'রে ফেলেছে। পরণে তার নতুন রঙীন ডুরে শাড়ী; কাল রাত্রে কানাই কিনে এনেছে। গীতা এসে চায়ের কাপটি নামিয়ে দিলে।

কানাই তাড়াতাড়ি উঠে বললে—মুখটা ধুয়ে আসি।

মুখ ধুয়ে এসে কানাই দেখলে নেপী এসে হাজির হয়েছে। চায়ের কাপটা তার হাতে। মুখচোরা নেপীর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভ'রে উঠেছে; কোন অঘটন ঘ'টে গেছে নিশ্চয়, নেপী অকস্মাৎ নিশ্চয় কোনো পরমানন্দ বা পরম দুঃখের স্পর্শ পেয়েছে। মূক নেপী বাচালের মত কথা ব'লে যাচ্ছে, বিজয়দা চুপ ক'রে ব'সে শুনছেন। গীতা ও-ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল, তার হাতে আর এক কাপ চা। চায়ের কাপটি সে কানাইয়ের হাতে তুলে দিলে।

নেপী বলছে অভিজ্ঞতার কথা। রিলিফে গিয়ে সে চোখে দেখে এসেছে। সাইক্লোনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একটি ভদ্র পরিবার ভাবী জীবনে ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছে। পরিবারে ছিল স্বামী-স্ত্রী এবং একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা, তিনজনে গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

বিজয়দার ঠোঁটে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে রয়েছে, নীরবে সিগারেটে টান দিয়ে চলেছেন। গীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

নেপী বললে—শুনে এলাম ছেলেমেয়েও বেচছে লোকে। বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী মেয়ে।

কানাইয়ের শরীর ঝিম-ঝিম ক'রে উঠল।

বিজয়দা বললেন—গীতা, কানাই আপিসে যাবে, ষষ্ঠীকে তাগাদা দাও, নইলে সে বারোটা বাজিয়ে দেবে যাও—যাও।

গীতা চ'লে গেল।

নেপী বললে—আরও রিলিফ পাঠাতে হবে বিং

বিজয়দা হাসলেন।

নেপী আবার বললে—বিজয়দা!

—আচ্ছা।

নেপী ওই একটি কথাতেই আশ্বস্ত হয়ে চ'লে গেল। কানাইয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু বললে না, শুধু তার দিকে চেয়ে একটু সশ্রদ্ধ হাসি হাসলে। ওইটাই নেপীর পক্ষে স্বাভাবিক।

কানাই বললে—বিজয়দা!

হেসে বিজয়দা নীরবে তার দিকে চাইলেন।

—তুমি কি বল, বিজনেস করা উচিত নয়?

—তুই পাগল কানাই। ও আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম। টাকার প্রয়োজন আছে ভাই। আর দুনিয়া জুড়ে যেখানে চলেছে কাঁড়াকাড়ি, সেখানে তুই কাড়বি না বললে—তোর ভাগই কাড়া যাবে, তুই ফাঁকি পড়বি। আমার কথাই ভেবে দেখ না, আমি পাই দেড়শো টাকা মাইনে, প্রেসের কম্পোজিটর পায় ত্রিশ টাকা, পিওনে পায় পনেরো টাকা। সেখানে আমিও তো কেড়ে খাই। ওটা আমি ঠাট্টা করেছিলাম তোকে।

কানাই চুপ ক'রে রইল।

বিজয়দা বললেন—টাকার অনেক প্রয়োজন কানাই। উপস্থিত আমারই একখানা আলোয়ান চাই।

কানাই এবার একটু হাসলে।

বিজয়দা আবার বললেন—গীতার ভবিষ্যৎ আছে। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

গীতা! হ্যাঁ, গীতার একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কিন্তু ওই শান্ত, সঙ্কুচিত, শত সংস্কারের ভারে পঙ্গু মেয়েটি যে পথ চলতেই অক্ষম! তার কি ব্যবস্থা সে করবে? সেই কথাই সে গতরাত্রে ভেবেছে;

প্রায় সমস্ত রাত্রিই তার ঘুম হয় নাই। শেষ রাত্রে একটু ঘুম এসেছিল, সকালে উঠতে তাই আজ দেরী হয়ে গেছে। সে বললে—ওই কথাই কাল সমস্ত রাত্রি ধ'রে ভেবেছি বিজয়দা! কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। ওকে নিয়ে কি করি বল তো বিজয়দা? ওর দ্বারা কি হতে পারে, তা আমি ভেবে পেলুম না।

শান্ত হাসি হেসে বিজয়দা বললেন—যাতে ওর সব চেয়ে ভাল হয় সে কথা তো তোকে বলেছিলাম কানু। কিন্তু তুই যে 'না' বলেছিস।

কানাইয়ের মনে প'ড়ে গেল বিজয়দার কথা। গীতার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল নীলার কথা। আজ শুক্রবার। কাল শনিবার আপিসের পর নীলার সঙ্গে তার দেখা হবার কথা হয়ে আছে। সর্ব্ব দেহে তার একটা চাঞ্চল্য প্রবাহিত হয়ে গেল।

বিজয়দা বললেন—কথাটা ভেবে দেখ্ কানাই।

—না, সে হয় না বিজয়দা।

বিজয়দা আর কোন কথা বললেন না।

গীতা এসে বললে—খাবার হয়ে গেছে। স্নান করুন কানুদা।

অমল কানাইকে দেখে বললে—বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে।

কাল সন্ধ্যার সময় কানাই যে নতুন কাপড়-জামা কিনেছিল—সেই পোশাক পরেছিল সে। অমলের কথা শুনে সে একটু হাসলে।

অমল বললে—এ কিন্তু আপনার আপিসের পোশাক হয় নি। স্যুট করিয়ে ফেলুন।

কানাই বললে—দরকার হ'লে করাতে হবে বৈকি।

—দরকার হবে। আজই দরকার ছিল। আপনাকে আজ কয়েক জায়গায় পাঠাব।

কানাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। কাজ নিয়ে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ফিরল বেলা চারটের সময়—হাসিমুখে। কাজগুলি সে ভাল ভাবেই ক'রে এসেছে। এসে দেখলে—অমলের টেবিলের সামনে ব'সে আছে জিতু বোস—কারখানার ম্যানেজার। গম্ভীর মুখে ব'সে আছে। সে হেসে বোসকে নমস্কার করলে। বোসও প্রতিনমস্কার জানালে।

অমল কানাইকে জিজ্ঞাসা করলে—কাজগুলো সব হ'ল ?

কানাই সমস্ত বিবরণ বললে। অমল খুশী হ'ল। বললে—এইবার আপনার কাজ। বাবা যা বলেছেন। চালের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে দেব। বসুন আপনি।

কাজ শেষ ক'রে কলম ফেলে অমল বললে—বাস্। সঙ্গে সঙ্গে চেহারাও যেন পাল্টে গেল তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললে—গুঁইবাবুকে পাঠিয়ে দে।

তারপর হেসে জিতু বোসকে বললে—আজ আপনাকে নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যাব জিতুদা।

জিতুদা সসম্ভ্রমে বললে—ওরে বাপ রে! সে তো আমার সৌভাগ্য ভাই।

—আজ কিন্তু বাড়ী ফেরা হবে না। এখানেই থাকতে হবে।

—বাড়ী! আমার আবার বাড়ী! যেখানে আমি সেইখানেই আমার বাড়ী।

—এইবার একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন।

—বিয়ে ? সর্ব্বনাশ!

—কেন?

—কেন? তবে বলি শুনুন। উর্দ্দুতে একটা কথা আছে "আশিকো পতা কাঁহা?" অর্থাৎ একজন জিজ্ঞাসা করছে—ভালবাসার লোকের ঠিক কি? না—"সুবা কঁহি, সাম কঁহি, দিন কঁহি, রাত কঁহি, কাটি জিন্দগী হোটেলোমে, মরি যা কর—হাসপাতলমে।" অর্থাৎ উত্তর দিলে, ভালবাসার লোক যে,—সকাল কোথাও, সন্ধ্যে কোথাও, দিন কোথাও, রাত কোথাও কাটে আমার; যতদিন বাঁচি থাকি হোটেলে, মরবার সময় যাই—হাসপাতালে। আমাদের বাড়ী আর বিয়ে বারণ ভাই।

অমল হাসতে লাগল। কানাইয়ের মুখে ফুটে উঠল ধারালো হাসি। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—সূত্রটা শুধু সুস্বাদুই নয়, রঙীনও বটে।

নক্সীপাড় কাপড়, পাশ-বোতামে পাঞ্জাবি পরা, পাকানো চাদর গলায় এক প্রৌঢ় এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল। অমলবাবু বললেন—ইনি মিঃ চক্রবর্ত্তী, আমাদের নতুন এজেণ্ট; এঁকে নিয়ে কাল থেকে তুমি বাজারে ঘুরবে। সমস্ত হালহদিশ্ শিখিয়ে দেবে। বুঝলে?

—যে আজ্ঞে। গুঁই সঙ্গে সঙ্গে কানাইকে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার করলে। কানাইও সবিনয়ে প্রতিনমস্কার করলে অমলবাবু চট ক'রে এক টুকরো কাগজে কি লিখে কানাইয়ের হাতে এগিয়ে দিলে, তাতে লেখা ছিল—Return his salute by nod only.

অমলবাবু মৃদুস্বরে গুঁইকে বললে—আমার বিজনেসও উনি দেখবেন। একজন পার্টনার হবেন। বুঝেছ?

—আমি আজ্ঞে সব দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব। উনি বুঝে নিলেই—

—উনি একজন এম-এস্-সি। ব'লে অমলবাবু হাসলেন। —তা

ছাড়া শ্যামবাজারের সুখময় চক্রবর্ত্তীর নাম জানো—মস্ত বড় ধনী ছিলেন ?

—ওরে বাপ রে! তা আর জানি না ? তাঁর ছেলেদের জুড়ী যখন চিৎপুর দিতে যেত তখন সোরগোল প'ড়ে যেত। একছড়া বেলফুলের মালা কিনে, দিতেন—একটা টাকা। তামার পয়সা হাতে কখনও ছুঁতেন না।

—তাঁরই প্রপৌত্র ইনি।

—ওরে বাপ রে! ব'লে গুঁই এবার একেবারে কানাইয়ের পায়ের ধূলো নিতে অগ্রসর হ'ল।

কানাই বললে—থাক্।

অমলবাবু একটু বিস্মিত হ'ল। পরমুহূর্ত্তেই সে একটু হাসলে। কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হ'ল, গুঁইয়ের স্তাবকতার ধরনটা কানাই ঠিক বরদাস্ত করতে পারে নি।

গুঁই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে ? অর্থাৎ আমার কি অপরাধ হ'ল ?

অমলবাবু আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে কাজের আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা সহজ ক'রে নিলে। বললে—হ্যাঁ, একশো মণ চালের একটা বিক্রী রসিদ ক'রে আন দেখি। স্ট্যাম্প দিয়ে—রসিদ লিখে দেবে—এই রসিদ দেখালেই আমাদের দু'নম্বর গো-ডাউন থেকে মাল ডেলিভারী পাবে। মাল আমরা কানাইবাবুকে বেচছি।

গুঁই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—একশো মণ ? পঞ্চাশ বস্তা ?

হেসে অমলবাবু বললে—হ্যাঁ। কানাইবাবুর জন্যে ওটা বাবার স্পেশাল পারমিশন।

গুঁই তবুও বললে—খুচরো কাজে বড় অসুবিধে বাবু, একেবারে হাজার মণ ক'রে দিলেই হ'ত।

—না, না। একশো মণই ক'রে আন তুমি।

রসিদ নিয়ে অমল কানাইকে বললে—আসুন, চালটা বিক্রী করতে হবে। গুঁই, এস। অমলের গাড়ীতেই তারা রওনা হ'ল—জিতু বোস, গুঁই, সে এবং অমল। আশ্চর্য্যের কথা—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুঁই চালটা আড়াই টাকা বেশী দরে বেচে ফেললে বাজারের একটা দোকানে। মায় টাকাটা এনে সে কানাইয়ের হাতে তুলে দিলে; অমলবাবু হেসে বললে—মণকরা আড়াই টাকা মুনাফা হয়েছে আপনার একশো মণে—আড়াইশো টাকা রেখে বাকীটা আমাকে চালের দাম হিসেবে দিয়ে দিন। তারপর অতি মৃদুস্বরে কানে কানে বললে—গুঁইকে দিয়ে দিন মণকরা চার আনা হিসেবে—পঁচিশ টাকা। আমার সামনে নয়, ওদিকে ডেকে নিয়ে দিন।

কানাই গুঁইকে দিলে পঁচিশ টাকা। গুঁই তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে চুপি চুপি বললে—একশো মণটাকে অন্তত পাঁচশো মণ ক'রে নিন স্যার। আর ক্রেডিটের কড়ারটা এক হপ্তা ক'রে নিন। দেখুন না, কি করে দি!

কানাই একটু হাসলে—চেষ্টা ক'রে টেনে আনা কৃত্রিম হাসি। কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দুটো দিন সে যা দেখেছে, তাতে তার জীবনের সহজ স্ফূর্ত্তি যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে; মাথায় খাটো ওই অমলবাবুটি তার চোখে এক বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। জুয়োখেলার মধ্যে যেটা অন্যের কাছে অদৃষ্ট, সেটা তার কাছে জুয়াচুরি ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। বিজয়দার তীক্ষ্ণ রসিকতা তার মনে পড়ছে।

ওদিকে গাড়ী থেকে অমলবাবু ডাকলে—মিঃ চক্রবর্ত্তী, আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

কানাই সবিনয়ে বললে—না না, আপনি বাড়ী যান। আমি ট্রামে কি বাসে চ'লে যাব।

—চলুন না, আমার নিজেরও দরকার আছে আপনাদের ওদিকে। গাড়ীখানা সে ঘুরিয়ে ফেললে পূর্ব্বমুখে—অর্থাৎ কানাইদের নিজেদের বাড়ীর দিকে।

কানাই বললে—আমি তো ওখানে যাব না।

—কোথায় যাবেন ?

বিজয়দার ঠিকানা বললে কানাই। অমলবাবু বললে—আচ্ছা, ওখানেই পৌঁছে দিচ্ছি।

গাড়ীখানা হু-হু ক'রে চলল। অমলবাবু বললে—মুস্কিল হয়েছে পেট্রোলের। ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে প্রয়োজন মত সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে এজেন্ট হিসেবে একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী কোম্পানী থেকে আপনাকে দিতাম।

—এই বাঁয়ে—এই গলির মধ্যে যাব আমি।

সুদক্ষ নাবিকের হাতের নৌকার মত মুহূর্ত্তে গাড়ীখানা মোড় ফিরে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

কানাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, ধন্যবাদ দেবার মত সমকক্ষতার সাহস যেন তার ফুরিয়ে গেছে। অমলবাবু গাড়ী থেকে মুখ বার ক'রে হেসে বললে—আচ্ছা। কাল ঠিক দশটার সময় যাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ বের করলে জিতু বোস, সে এক মিলিটারী সেলাম ঝেড়ে দিলে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাড়ীর দরজা খুলে গেল। গীতা বোধ হয় ওপর থেকে কানাইকে মোটর থেকে নামতে দেখেছিল। দরজা খুলে দরজার মুখে দাঁড়িয়েই গীতা কেমনে হয়ে গেল। অপরিসীম ভয়ে বিবর্ণ মুখে সে থরথর ক'রে কাঁপছে, হয়তো বা সে পরমুহূর্ত্তে প'ড়ে যাবে। কানাই ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তার দুই বাহু ধরে ডাকলে—গীতা! গীতা!

গীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোটরের দিকে। মোটরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে কানাই।

অমলবাবুর চোখেও অদ্ভুত দৃষ্টি। সে বললে—ও মেয়েটি কে মিঃ চক্রবর্ত্তী?

—আমার বোন।

মুহূর্ত্তে অমলবাবুর গাড়ীটা গর্জ্জন ক'রে উঠল এবং দ্রুতগতিতেই গলিপথের ভিতর দিয়ে চ'লে গেল, পিছনের লাল আলোটা ক্রমশ ছোট হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

গীতা বললে—ও কে? ও কে কানাইদা?

—উনি অমলবাবু, ওঁরই আপিসে আমি ব্যবসা শিখছি। ওঁকে তুমি চেন নাকি?

আতঙ্কিত মুখে গীতা ব'লে ফেললে—ঘটকীর বাড়ীতে, ওই ওই—ওই—কানুদা—। সে আর বলতে পারলে না।

কানাইয়ের সমস্ত অন্তর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল—তার মনের ভিতরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ডালহৌসী স্কোয়ারে তার কল্পনার বিশাল সৌধখানা কাঁপতে কাঁপতে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে। অমলবাবু! অমলবাবুর মধ্যে এতবড় পাপ? মাথার মধ্যে তার আগুন জ্ব'লে উঠল। মুহূর্ত্তে মনে পড়ল তার পূর্ব্বপুরুষদের কথা। এক ইতিহাস। কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চনা ক'রে যে সম্পদ সঞ্চয় করে মানুষ, সে সম্পদ গুপ্ত ব্যাধি! সেই ব্যাধির তরুণ উপসর্গ আজ অমলবাবুর মধ্যে দেখা দিয়াছে। কালে ওই বংশটাও হবে তাদেরই অর্থাৎ চক্রবর্ত্তীবংশের মত। অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তার হাত পড়েছিল জামার পকেটের উপর। পকেটের ভিতরের ওই দুশো পঁচিশ টাকার নোট—পকেটের মধ্যে ইনসেণ্ডিয়ারি বোমার মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—জ্ব'লে উঠবে এইবার। বাড়ী থেকে বেরিয়ে নোট কখানা

হাতের মুঠোয় পিষে পাকিয়ে সম্মুখের ডাস্টবিনের মধ্যে সে ফেলে দিলে।

(তেরো)

বিজয়দার ফেরার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। তবে রাত্রি দশটার এদিকে তিনি কখনই ফেরেন না। আজ কিন্তু আটটা না বাজতেই তিনি ফিরলেন। তখনও কানাই স্তব্ধ হয়ে ব'সে। ও ঘরে গীতা উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কানাইয়ের সঙ্গে অমলবাবুকে দেখে গীতা আশঙ্কায় চমকে উঠেছিল, তারপর কানাইদার এই স্তব্ধ ভাব দেখে আশঙ্কায় সেও প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর কোনো কথা সে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে নি, রান্নাঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে প'ড়ে ক্রমাগত নিঃশব্দে নিরুচ্ছ্বসিত কান্না কাঁদছে, তার কণ্ঠনালীর মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগ পাথরের মত আটকে রয়েছে; সেটাকে সে সংবরণও করতে পারছে না, আবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় প্রকাশ করতেও পারছে না। কি হবে? ঐ লোকটা কানুদাকে কি বলেছে? তার ওপর হয়তো উপযাচিকাত্বের অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। তার মিথ্যা অপবাদে সাক্ষ্য দিয়েছে হয়তো সেই ঘটকী। তার কথা মনে ক'রে তার সর্ব্বশরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে। মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা। অসহায় অবস্থার মধ্যে প'ড়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল—ঘটকীর মিষ্ট কথায় নানা প্রলোভনেও তার কান্না থামে নাই। তখন ঘটকী বলেছিল,—ন্যাকামি করিস নে বাছা, ঢং আমি দেখতে নারি। চুপ কর্, নইলে এবার আমি নোক ডেকে বলব যে, ছুঁড়িকে বাবু পছন্দ করে নি, তাই কাঁদছে, দেখ।" মুখে বীভৎসতার ছাপ আঁকা, সেই স্থূলাঙ্গী ঘটকীর অসাধ্য কিছুই নাই।

বাসার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ষষ্ঠীচরণ, সে নিতান্তই নিরুৎসুক মানুষ; একবার মাত্র কানাইকে সে প্রশ্ন করেছিল—চা ক'রে দি?

কানাই নীরবে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

ষষ্ঠী আর কোন প্রশ্ন না ক'রে বাইরে ব'সে বিড়ি টানছে। সন্ধ্যা থেকে রান্নাবান্নার উদ্যোগ আরম্ভ করেছে। গীতার কান্না দেখে একবার প্রশ্ন করেছিল—কি হ'ল বাছা?

গীতাও নীরবে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

যার অর্থ হ'তে পারে—'কিছু হয় নি' অথবা 'বলব না'। ষষ্ঠীও এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করে নি। আর একবার একটি প্রশ্ন করেছিল—দেখ তো গো, তরকারিতে এই নুনটা দোব?

গীতা ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতেই উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ।

কানাইকে ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বিজয়দা বললেন,—কি রে? কি হ'ল?

কানাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বিজয়দা হেসে বললেন—ওরে বাপ্ রে, এতবড় দীর্ঘনিশ্বাস! কুম্ভক যোগ ক'রে ব'সে ছিলি নাকি? হাতের অ্যাটাচি কেসটা বিছানায় ফেলে নিজেও তার উপর গড়িয়ে পড়লেন বিজয়দা। কানাইয়ের কোন উত্তর না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি আবার বললেন—সকাল থেকে বেরিয়ে তোর পাত্তা নেই। খুব ব্যবসা করছিস যা হোক! এদিকে আমার বিপদ। একদিকে গীতা আর একদিকে নেপী। তুই চ'লে যাওয়ার পর গীতা আজ আবার কাঁদতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ শ্রীমান নেপী এসে হাজির। এসেই চারিদিকে চেয়ে বেচারীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে মুখ দেখে মনে হ'ল, পৃথিবীর বোধ হয় অন্তিম কাল উপস্থিত। কি ব্যাপার? না—কানুদা কই? তিনি কোথায় গেছেন? বললাম—ভেবো না, কানুদা আসবেন। তোমাদের ব্রজরাখাল দলকে কাঁদিয়ে তিনি মথুরায় রাজা হ'তে যান নি। নেপীটা বোকার

মত একটু হাসলে। তারপর বললে—জনসেবা কমিটির মিটিংয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল। আমাদের অনেক কমপ্লেন আছে। বললাম—মাভৈ! কানাই এলে তাকে বলব আমি; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার নৃপেন্দ্র! কিন্তু নেপী ব'সেই থাকে—ব'সেই থাকে। অন্যদিকে গীতার চোখ থেকে জল পড়ে। খায় না। নেপীও তাই। খেতে বললে, বলে—না। অবশেষে অনেক কষ্টে গীতার সঙ্গে পাতালাম 'হাসি-ভাই', নেপীর সঙ্গে 'খুশি-ভাই'। তোমার অভাবে আমাকেই যেত হ'ল মিটিংয়ে, নতুন সম্বন্ধের মাশুল দিতে। যাক্, ব্যাপার কি বল্ দেখি? এমন ভাবে ব'সে কেন? ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিস না কি আজ? না—খুব মোটা রকম লার্ভ ক'রে গম্ভীর ভাবে গভীর তত্ত্ব চিন্তা করছিস? তিনি হাসতে লাগিলেন।

বিজয়দার মধ্যে একটা সবল ছোঁয়াচ শক্তি আছে। আপন সাহচর্য্যে অল্পসময়ের মধ্যেই পাশের লোকদের আপন ভাবে প্রভাবিত ক'রে তুলতে পারেন। কানাই এতক্ষণে কথা বললে, বিজয়দার সাহচর্য্যে তার মূক মূঢ় ভাব কেটে গেল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অদৃষ্টকে মানতাম না বিজয়দা; কিন্তু আজ কর্ম্মবিপাকের মধ্যে এমন একটা অতি সূক্ষ্ম নিষ্ঠুর পরিহাসরসিকতার পরিচয় পেলাম, যাকে অ্যাক্সিডেণ্ট বলতে পারি না। নাটকের মত রচা ছক যেন; আর অ-দৃষ্ট-প্রম্পটারের নির্দ্দেশমত সেই ছকে ছকে ঘুরেছি আমি আজ। অদ্ভুত!

বিজয়দা গভীর আরাম এবং আশ্বাস ভ'রে ব'লে উঠলেন—আঃ! তারপর বললেন—তাই মেনে নে ভাই, অদৃষ্টকে মেনে নে। অনেক দুঃখ থেকে বেঁচে যাবি।

—দুঃখ থেকে বাঁচব? তার রসিকতার সকল আয়োজনই দেখলাম দুঃখ দেবার জন্যে।

—উঁহু। একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঐ দুটি কথা ছাড়া আর কিছু বলবার অবসর বিজয়দার হ'ল না।

উঁহু! মানে?

—দুঃখদাতা যদি রসিক হয় এবং দুঃখদানের মধ্যে যদি রসিকতা থাকে, তবে তো হাসতে হাসতে সে দুঃখ ভোগ করা যায়। এখন আমার বক্তব্য—অদৃষ্টকে মেনে নে—তা হ'লে তুই ছাড়া আরও দুটি লোক দুঃখের হাত থেকে বাঁচে—গীতা এবং আমি। "জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন অদৃষ্ট নিয়ে"—অদৃষ্টকে স্বীকার ক'রে, তার যোগাযোগ মেনে নে, গীতাকে তুই বিয়ে কর্।

অসহিষ্ণু হয়ে কানাই এবার ব'লে উঠল—বিজয়দা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর।

বিজয়দা একটু চুপ ক'রে থেকে কণ্ঠস্বর উচ্চ ক'রে ডাকলেন—হাসি-ভাই! গীতা!

গীতা ম্লানমুখে এসে দাঁড়াল। বিজয়দা তার দিকে চেয়ে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কানাইয়ের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন গীতাকে, তুই তো আমার সঙ্গে কথা ছিল না হাসিভাই।

গীতা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজয়দা বললেন—হাসিভাই পাতাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আমার মধ্যে কণ্ট্রাক্ট হয়েছে যে, দেখা হ'লেই আমাদের দুজনকে হাসতে হবে। হাস', হাস', হাস'! দ্যাট্'স রাইট! গীতার মুখে এবার একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। বিজয়দা এবার বললেন—একটু চা খাওয়াও দেখি। ষষ্ঠীকে বল, দু' টাকা পাউণ্ডের চা, যা আড়াই টাকা পাউণ্ড দিয়ে—ধুলো ঝাড়াই ক'রে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ও নিয়ে এসেছে, সেই চা বের ক'রে দিতে। বুঝলে?

গীতার মুখের মৃদু হাসি আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল। সে মৃদুস্বরে

বললে—হ্যাঁ! ব'লে সে চ'লে গেল। বিজয়দা নীরবে সিগারেট টানতে আরম্ভ করলেন।

কানাই বললে—বিজয়দা!

—বল্।

—আজকের ঘটনাটা তোমাকে আমি বলতে চাই।

—বলে যা।

কানাই আবেগের সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করলে—বলছিলাম না বিজয়দা, কর্ম্মবিপাকের মধ্যে—

বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—আমি খবরের কাগজের লোক কানু, আমরা ও-সব ভূমিকা ভণিতা বাদ দিয়ে চলি। স্রেফ ঘটনাটুকু ব'লে যা তুই।

কানাই এবার একটু হাসলে। তারপর সে আরম্ভ করলে। ধীরে ধীরে আজকের সমস্ত ঘটনা ব'লে শেষ ক'রে সে বললে—কাল রাত্রে আমি তোমাকে বলছিলাম—আমার বা গীতার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। চেয়েছিলাম—বিজনেস-ফিল্ডে এত বড় একটা লোকের ব্যাকিং যখন বল, তখন গীতাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যধারের শক্ত শিক্ষিতা মেয়ে ক'রে গ'ড়ে তুলব। কিন্তু যে লোকটা গীতার ওপর চরম অত্যাচার করেছে—না-জেনে তারই সাহায্য নিলাম। এই দু'শো পঁচিশ টাকা—

—দে, টাকাগুলো আমাকে দে। বিজয়দা হাত বাড়ালেন।

—সে টাকা আমি ওই সামনের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি।

ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছ! বিজয়দা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। ডাকলেন—ষষ্ঠী, ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী এসে দাঁড়াতেই বিজয়দা বললেন—দেখ, কানুবাবু বাজে কাগজের সঙ্গে পকেট থেকে দুশো, পঁচিশ টাকার নোট ওই সামনের ডাস্টবিনে ফেলে

দিয়েছেন। খুঁজে বের করতে যদি টাকা ক'মে গিয়ে দুশো পনের টাকাও হয়ে যায় তাতেও আমি খুশী হয়ে তোমাকে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেব। পারবে তুমি খুঁজতে?

ষষ্ঠী বললে—কেমন ছেলেমানুষী দেখেন দেখি। দাঁড়ান লণ্ঠনটা নিয়ে আসি।

—উঁহু। বড় টর্চ্চটা নিয়ে এস।

কানাই বাধা দিয়ে বললে—না বিজয়দা।

—আঃ! পাগলামি করিস নে। বিলাস ক'রে জলে টাকা ছুঁড়ে খেলা করাও যা, ঘৃণা ক'রে টাকা ডাস্টবিনে ফেলাও তাই, সমান অপব্যয়। বিজয়দা ধমকের স্বরেই কথাগুলি বললেন।

কানাই বললে—টাকাটা আমার; আমি ওটা ফেলে দিয়েছি।

—আমার ভাগ্যি যে, পুড়িয়ে ফেল নি নোট ক'খানা। কাল গীতাকে নার্সেস ট্রেনিংএ ভর্ত্তি করতে হবে। টাকা চাই। অথচ ব্যাঙ্কে আমার ব্যালেন্স আটাশ টাকা কয়েক আনা। এস ষষ্ঠী!

—ওই টাকা দিয়ে তুমি গীতাকে ভর্ত্তি ক'রবে? তুই

—নিশ্চয়। তা-ছাড়া লোকটার সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন পড়ার সমস্ত খরচ আমি ওর কাছ থেকেই আদায় করব।

কানাই কঠিন স্বরে বললে মান-মর্য্যাদা একেবারে ভূয়ো প্রত্যাখ্যান বিজয়দা। তোমার অপমানবোধ না থাকতে পারে, কিন্তু ঐ গীতার পড়ার ব্যবস্থা করলে তার চরম অপমান করা হবে। কে স্ত্রীরূপে

বিজয়দার দু-চোখ ধ্বক ক'রে এবার জ্ব'লে উঠল—কিন্তু তিনি আমার বলবার পূর্ব্বেই দু'হাতে দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল গীতা; মুহূর্ত্তে সে হয় আত্মসংবরণ ক'রে হাস্যস্মিত মুখে কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি ক'রে তাকে অভ্যর্থনা করলেন—

"প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তব নত
স্তম্ভিত মেঘের মত
তৃষ্ণা হরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।"

গীতা, তোমার ঠিক নাম হওয়া উচি● ছিল কাজলী।

গীতা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে বিজয়দার মুখের দিকে চাইলে; বিজয়দা আবার আবৃত্তি করলেন—

"কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছ
স্তব্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথী
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি;
যেন তাহা দেবতারি করুণা-অঞ্জলি,—
—নাম কি কাজলী?"

চ'·তোমার নাম দিলাম কাজলী! ওই নামেই তুমি খ্যাত হবে সেবিকারূপে। বল', ·ামেই তোমাকে ভর্ত্তি ক'রে দেব। বলতে বলতেই তিনি তার শিক্ষিতা·ত হাত দুখানি হ'তে চায়ের কাপ দু'টি নিয়ে একটা দিলেন চরম অত্ত্ক, অপরটায় চুমুক দিয়ে বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে! তুমি পাঁচিশ টা·হাসিভাই?

—দে·লর প্রান্তদেশটি ধ'রে অবনতমুখে গীতা বললে—বিজয়দা!

—সে ·কে মনোযোগ আকর্ষণের তো প্রয়োজন নেই হাসিভাই; আমি ডাস্ট মুখের দিকেই চেয়ে আছি।

ডাকলেন যুদ্ধের নার্সের কথা বলছিলেন না? কম সময় লাগে আর প্রথম থেকেই মাইনে পাওয়া যায়?

—হ্যাঁ।

—আমাকে ওইতেই ভর্তি ক'রে দিন।

বিজয়দা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কানাই ব'লে উঠল—না। ও-সব মতলব তুমি ক'রো না গীতা।

গীতা বললে—না, আপনি মানা করবেন না কানাই-দা। ব'লেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ঠিক এই সময়েই সর্ব্বাঙ্গে ময়লা ধূলো মেখে এসে ঘরে ঢুকল ষষ্ঠীচরণ। টেবিলের ওপর কাগজের একটা তাস রেখে বললে—এই লেন।

গম্ভীরভাবে বিজয়দা বললেন—তোমার কাছেই রাখ। পরে নেব আমি।

কানাই বললে—বিজয়দা!

—টাকাটা আমি পার্টির কাজে দিয়ে দেব—চাঁদা বলে।

—সে তুমি যা খুশী করগে। কিন্তু গীতাকে ওয়ার সার্ভিস নিতে দিয়ো না তুমি।

কানাই চুপ ক'রে ব'সে রইল।

বিজয়দা বললেন—গীতায় সবচেয়ে বড় অপমান করেছিস তুই কানাই।

কানাই তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

—গীতা তোকে ভালবাসে, তুই তার সে ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করলি।

—কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি না বিজয়দা। কখনও তাকে স্ত্রীরূপে পাবার কল্পনা আমি করি নি। তুমি বিশ্বাস কর—আমি ওকে আমার বোন উমা থেকে পৃথক দেখি না। তা ছাড়া···না বিজয়দা, সে হয় না।

বিজয়দা চুপ ক'রে রইলেন।

কানাই বললে—গীতার ভার তুমি নিলে, আমি নিশ্চিন্ত। এখন একটা চাকরী দেখে দিতে পার ?

—চাকরী ! বিজয়দা সবিস্ময়ে বললেন—কেন, ব্যবসা—?

—নাঃ, ব্যবসা আমি আর করব না। নিজে কিছু 'তৈরী ক'রে যদি সেই জিনিসের ব্যবসা করতে পারতাম তো করতাম। আমি তাই আমার পরিশ্রম বেচতে চাই।

—হুঁ। বিজয়দা আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

—বিজয়দা !

—ভাবছি কানাই। আমাদের বাংলা কাগজের নিউজ ডিপার্টমেণ্টে একজন অ্যাসিস্টাণ্ট চাই, নাইট ডিউটি ; পারবি ?

—পারব।

—সামান্য চেষ্টাতেই কাজ শিখে নিবি তুই। বাংলা তুই বেশ লিখিস। মাইনে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ।

—তাই করব বিজয়দা। এই রকম কাজই আমি চাই।

—তাই হবে। ব'লে বিজয়দা নির্বিকারভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ ছাড়তে ছাড়তে বললেন—কালকের মত বাইরে বিছানা ক'রে ফেল্ দেখি।

আকাশে চাঁদ ডুবছে ; পৃথিবীর বুক থেকে অন্ধকার ক্রমশ উপর দিকে উঠেছে। রাস্তাগুলোর ভেতর অন্ধকার গাঢ়তর, বড় বড় বাড়ীগুলোর ছাদের ওপর এখনও অস্তমিতপ্রায় চাঁদের ম্রিয়মাণ জ্যোৎস্নার আভাস জেগে রয়েছে ; পুরনো কালিপড়া চিমনীর লালচে আলোর মত প্রভাহীন পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ; তারই মধ্যে বাড়ীগুলোর ছাদের আলসের সারি—রক্তাভ পটভূমির উপর গাঢ় কালো রঙে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। শীতও আজ যেন কালকের চেয়ে তীক্ষ্ণতর। নিত্যকার

মত দূর আকাশে আজও কোথাও প্লেন উড়ছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে চলেছে বোধ হয়; কিংবা মহানগরীর টহল-দারীতে ফিরছে। ডিসেম্বর মাসেই পনের দিনের মধ্যে চট্টগ্রামে তিন দিনে চারবার' বম্বিং হয়েছে। সেখানকার মানুষেরা দীপশূন্য ঘরে বিনিদ্র চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে ব'সে রয়েছে উৎকর্ণ হয়ে! মোটরের সেল্‌ফ স্টার্টারের শব্দেও চমকে উঠছে। হতভাগ্য মানুষের দল! এই অবস্থার মধ্যেও রাস্তার একপ্রান্তে হয়তো বাড়ীর বাইরের দিকে শোবার জন্য নির্ম্মিত সামান্য পরিমিত আচ্ছাদনীর তলায় ছেঁড়া চট গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ভিক্ষুকেরা। বিজয়দা বাইরে এসে বললেন—তাই তো রে, আজ বেশ শীত পড়েছে! কনকনে বাতাস বইছে। ভাল ক'রে লেপ জড়িয়ে বিছানার উপর ব'সে বললেন—বাঃ, আজ জমবে ভাল! শোন্—গত কাল রয়টার লেলিনগ্রাদের যুদ্ধের ভারি চমৎকার একটুকরো ছবি দিয়েছে। তোকে শোনাবার জন্যেই এনেছি।—

'It was the dead of night. Frost and blizzard. With a hiss and a clang shell after shell passed over-head. Somewhere from around the corner red flames shot up-wards and thunderous explosion reverberated through the street.'

একজন নার্স আর একজন লোক সঙ্গে ক'রে বরফের গাদার মধ্যে দিয়ে চলেছে—তারা খবর পেয়েছে রাস্তায় একটি মেয়ে অকস্মাৎ প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে প'ড়ে রয়েছে—সেইখানেই' তার সন্তান ভূমিষ্ঠ

'They ran from snowpile to showpile, sto[illegible] listened.' প্রসবযন্ত্রণা-কাতর মায়ের কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতম জন্য তারা কান পেতে আছে।

দুজনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। ঘরের মধ্যে টাইম্‌পিস ঘড়িটি টিক-টিক ক'রে চলছে, তার আওয়াজ আসছে। গীতারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! আকাশে আর এখন প্লেন উড়ছে না। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ বিজয়দা প্রশ্ন করলেন—তুই কি অন্য কাউকে ভালবাসিস্ কানু? সেই রকম আভাস যেন আমি পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

কানাই কোন উত্তর দিলে না।

তার মনে পড়ল—কাল শনিবার। তিক্তহাসি তার মুখে ফুটে উঠল। না, নীলার সঙ্গে দেখা সে করবে না। তার জীবনের বিষে তাকে সে জর্জ্জরিত করবে না। দেহের মধ্যে তার রক্ত বিষ-জর্জ্জরিত; বাইরে তার জীবন দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত। না। কাউকে ভালবাসার অধিকারই তার নাই। শনিবার এসপ্লানেডের দিকে সে যাবে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "মন্বন্তর"
M.

(চৌদ্দ)

শনিবার। ভোরে উঠেই নীলার মনে হ'ল আজ শনিবার। মনে পড়ল—কার্জ্জন পার্কের সেই বেঞ্চখানা। হঠাৎ তার কানে এল তার বাপের কণ্ঠস্বর।

দেবপ্রসাদ গৃহিণীকে ডেকে বলছিলেন—দেখ, আমার হজমের গোলমালটা বেড়েছে। রাত্রে রুটিটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

ছাদে
জেগে রা জিনিসের দর আজ নাকি হঠাৎ একটা লাফ দিয়েছে। চালের দর
পাণ্ডুর জ্যোৎ টাকা পঁচিশ, চিনি মেলে না, কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে
রক্তাভ পটভূমি এ-বেলায় গেলে ও-বেলার আগে ফেরা যায় না।
দেখাচ্ছে। শীতও কার শুরু করেছে—'মাগ্‌গী ভাতা দাও'। কেরাণীরা

নির্ব্বাক। নিজেদের জলখাবার তারা আগেই বন্ধ করেছিল, এইবার ছেলেদের জলখাবার বন্ধ করতে হবে তাদের। নীলার মন মুহূর্ত্তে যেন একটা ঘা খেয়ে গেল। শনিবারের অপরাহ্ণের কল্পনাটাও স্তিমিত হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মত ধীরে ধীরে নিভে গেল। সে খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। ভোরবেলায় তার বাবা কাগজখানা নিজে প'ড়ে নীলাকে দিয়ে যান। আজ দিয়ে গেছেন একটু বেশী সকালে।

গৃহিণীর মুখে অতি সূক্ষ্ম ম্লান হাসি ফুটে উঠল। তিনি কোন উত্তর না দিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবপ্রসাদ বললেন—এক মুঠো ক'রে ভাতই খাব আজ থেকে।

এবার গৃহিণী বললেন—তিন ছটাক ময়দা; ওতে আর তোমার কত টাকা বাঁচবে?

—উঁহু, বাঁচবার কথাই নয়। ওটাতে বরং বাচ্চাগুলোর জলখাবার ক'রে দিয়ো।

খবরের কাগজওয়ালা এসে দাঁড়াল।—বাবু, কাগজখানা?

—কাগজ কি হবে? গৃহিণী প্রশ্ন করলেন।

হেসে দেবপ্রসাদ বললেন—ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, ভোরবেলা কাগজ দিয়ে যাবে, আবার আটটার সময় নিয়ে যাবে, দাম অর্দ্ধেক। ব'লেই তিনি ডাকলেন—নীলা!

ভিতর থেকে উত্তর এল—বাবা।

—খবরের কাগজখানা হল তোর?

নীলা কাগজখানা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—পড়া হয়েছে তোর?

—ভাইসরয়ের স্পীচটা পড়ছিলাম।

ম্লান হেসে দেবপ্রসাদ বললেন—খুব বড় কথাই বলেছেন! অথণ্ড

ভারতের পরিকল্পনা ; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা 'full justice to the rights and legitimate claims of the minorities.'

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার! কাগজওয়ালা তাগাদা দিলে।

—দিয়ে দে মা কাগজখানা।

নীলা বাপের মুখের দিকে তাকালে। অকারণে পায়ের নখের দিকে মনঃসংযোগ ক'রে দেবপ্রসাদ বললেন—ওর সঙ্গে আজ থেকে বন্দোবস্ত করেছি—সাড়ে আটটায় কাগজ ফেরত নেবে—দাম অর্দ্ধেক পাবে।

নীলার মা নীলার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে এগিয়ে দিতে গিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—পরশু আবার চাটগাঁ-ফেণীতে বোমা পড়েছে! ১৫ই তারিখে চট্টগ্রাম ও ফেণীতে বিমান-হানা!

অসহিষ্ণু কাগজওয়ালা অনুনয়ের আবরণে আবার তাগিদ দিলে—মা!

স্বামীর ওপরেই বোধ হয় ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে গৃহিণী কাগজখানা ফেলে দিলেন। কাগজওয়ালা মুহূর্ত্তে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল—জোর খবর! চাটগাঁয়ে বোমা, ফেণীতে বোমা! জোর খবর!

—দুপুরবেলা কাগজখানা নেড়ে-চেড়ে কাটাতাম, তাও ঘুচে গেল! আমরা কি মানুষ! ব'লে দ্রুতপদে গৃহিণী বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলেন। দেবপ্রসাদ একটু হাসলেন। নীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সন্ধ্যেবেলায় আপনি কাগজ নিয়ে থাকতেন—কাগজটা রাখলেই হ'ত বাবা।

—দুনিয়ার খবর অনেক ঘাঁটলাম মা, দেখলাম, বাজে। কিছু হয় না মা। মা, দুগ্ধপোষ্য নাতী-নাতিনীগুলোর জলখাবার বন্ধ হয়েছে, তোকে চাকরী নিতে হয়েছে—

—আমি চাকরী নিয়েছি তাতে কি আপনি খুশী হননি বাবা ?

—খুশী ?

—কেন এতে দোষের কি আছে ?

—থাক্ মা, ও আলোচনা থাক্।

নীলা সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার বাবার মুখ থেকে এ কথা শুনতে সে যেন প্রস্তুত ছিল না। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

'আলোচনা থাক্'—এ কথা ব'লেও দেবপ্রসাদই আবার বললেন—এবার তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্ছ্সিত,—ঈষৎ উচ্ছ্সিত কণ্ঠস্বরে বললেন—নতুন জীবনে নিজের ঘর বেঁধে তুই যদি চাকরী করতিস মা, তবে আমি হাসিমুখে চেয়ে দেখতাম, অহঙ্কার ক'রে বলতাম—কেমন মেয়ে আমি গ'ড়ে তুলেছি দেখ। কিন্তু আমার সংসারের জন্যে তোর উপার্জ্জন আমায় নিতে হচ্ছে—অক্ষমতার এ লজ্জা এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না মা।

এক মুহূর্ত্তে নীলার মনের সমস্ত ক্ষোভ গ'লে জল হ'য়ে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—আজ শনিবার। কমরেড আজ তাকে তার কথা বলবে। দুই ভাবের সংঘাতে চোখে তার জলও এল। সে-চোখের জল নীলা বাপের কাছে গোপন করলে না। বাপের কোলের কাছে ব'সে ছোট মেয়ের মত তাঁর কাঁধের ওপর চিবুকটি রেখে বললে—ছেলে আর মেয়ে সংসারে কি সত্যই ভিন্ন বস্তু বাবা ? কই দাদা যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন তাতে তো আপনি একবারও 'আহা' বলেন না। তাঁর টাকা নিতে হয় আপনাকে—এতে তো আপনি কুণ্ঠিত হন্‌ না !

দেবপ্রসাদ কোন উত্তর দিলেন না। যে প্রশ্ন নীলা তাঁকে করেছে তার কোন আবেগময় উত্তর বা মনস্তুষ্টিজনক মিথ্যা উত্তর দিতে তাঁর

প্রবৃত্তি হ'ল না। সত্যই নীলার উপার্জ্জন গ্রহণ করতে তাঁর কুণ্ঠা হয়। যেখানে কন্যাকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন—এম্-এ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন, সেখানে নারীজাতির অর্থ-উপার্জ্জনকারী অধিকারকে তিনি যুক্তিসঙ্গত ব'লে স্বীকার করেছেন। পুরুষের উপার্জ্জনের আওতায় মেয়েরা ঘরের মধ্যে গৃহকর্ম্মকেই শুধু মাথায় ক'রে রাখলে গৃহকর্ম্ম শ্রী সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে এ কথা সত্য, স্বামী সন্তান তাতে কর্ম্ম-জীবনে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে এও সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ পদ্ধতির পরিণতিতে নারীজাতির পরাধীনতা সেখানে অনিবার্য, এও সত্য। জীবনে সহধর্ম্মিণীর এবং সিংহাসন-ভাগিনীর অধিকার সত্ত্বেও সীতা বনবাসে গিয়েছিলেন; পাশার বাজিতে দ্রৌপদীকে পণ থাকতে হয়েছিল। এ সব যুক্তিকে স্বীকার করেন দেবপ্রসাদ। কিন্তু তবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিছুতেই 'তিনি এ কুণ্ঠাকে জয় করতে পারেন নি। অন্তরে অন্তরে যে ক্ষোভ তাঁর পাক খেয়ে ফিরছিল—আজ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ সে আত্মপ্রকাশ করলে।

—নীলা আবার ডাকলে—বাবা!

—মা।

—আমার কথায় জবাব দেবেন না বাবা?

—যুক্তিতে তোর কথাই ঠিক মা, মনে মনে কতবার ওই যুক্তি দিয়েই মনকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিই। কিন্তু আমি যাঁদের আমলে মানুষ হয়েছি, তাঁদের আদর্শ আমাদের ভেতর সংস্কার হয়ে বেঁচে রয়েছে, সে মানে না। এই ধর—' বলেই তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

নীলা প্রশ্ন করলে—কি বাবা?

—থাক্ না মা।

—না আপনি বলুন।

একটু ইতস্তত ক'রে দেবপ্রসাদ বললেন—নেপী কম্যুনিস্ট পার্টির

মেম্বর। মনে হচ্ছে তুইও বোধ হয় যোগ দিয়েছিস। তোমাদের যুক্তি আমি মানি, কিন্তু কোন রকমেই অন্তরকে বোঝাতে পারিনে—ভুলতে পারিনে গান্ধীজীর মত লোককে জাপানের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ব'লে অপবাদ দিয়ে—তাঁকে বন্দী ক'রে রেখে—তিনি অর্দ্ধপথেই চুপ করে গেলেন।

নীলার চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, সে বললে—এ অপবাদের প্রতিবাদ আমরা বোধ হয় সকলের চেয়ে করি বাবা। অন্তরে অন্তরে এর জন্যে দুঃখ পাই। নেতাদের মুক্তি আমাদের প্রধান দাবী। কিন্তু ওদিকে যে জাপান এসে আসামের বর্ডারে থাবা গেড়ে বসেছে; অভিমান ক'রে তাকে ঢুকতে দিলে যে সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ হবে। বাবা, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে রাণী ভবানী বলেছিলেন—সায়রের রাঘব বোয়ালকে মারতে নদী থেকে খাল কেটে কুমীর এনো না। আমাদের স্বাধীনতা—

দেবপ্রসাদ বাধা দিলেন—থাক্ মা। রাজনীতি আমার আর ভাল লাগে না। তোদের নূতন জীবন, তাজা রক্ত—তোরা যা ভাল বুঝিস কর্। আমার কাছে আজ ম্যালথাসের কথাই সত্য। পৃথিবীতে স্বাধীন শক্তিমান জাতিদের মধ্যে ফুলবাগানে আগাছার মত আমরা অনাবশ্যকভাবে জায়গা জুড়ে রয়েছি। যুদ্ধে মহামারীতে ধ্বংস হওয়াই আমাদের নিয়তি।

তাঁর কথার মধ্যে এমন একটি সকরুণ বেদনার সুর ছিল যার স্পর্শে নীলা ব্যথিত হয়ে উঠল, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গভীর হতাশায় সেও স্তব্ধ হয়ে রইল।

দেবপ্রসাদ বললেন—কিন্তু এমন তিল তিল ক'রে মৃত্যু, এ সহ্য হচ্ছে না মা। বিশেষ ক'রে ঐ শিশুগুলোর দুঃখ আর দেখতে পারছি না।

নীলার মা এসে পিতা-পুত্রীর আলোচনায় বাধা দিলেন—তুই কি আজ আপিস-টাপিস যাবি নে?

চকিত হয়ে নীলা বললে—ক'টা বাজল?

—সে জানি নে বাছা, অমরের স্নান হয়ে গেছে।

—দাদার স্নান হয়ে গেছে? নীলা উঠে ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চ'লে গেল। নীলার মা আপন মনেই বকতে আরম্ভ করলেন—চাকুরে মেয়ের আপিসের ভাত জোগাতে হচ্ছে; অদৃষ্ট বটে আমার! তারপরই স্বামীকে বললেন—তোমার বুঝি কোর্ট-টোর্ট নেই আজ? পরমুহূর্ত্তেই হেসে বললেন—না থাকলেই ভাল, ভূতের ব্যাগার তো। দেবপ্রসাদও একটু হাসলেন।

বাড়ীর ভেতর দুটি শিশুতে কলরব ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। অমরের পাতের ভাত নিয়ে মারামরি। গিন্নী বললেন—বউমা, ভাগ ক'রে খাইয়ে দাও তুমি। ছোট খোকাকেও একটু একটু ভাত-ডাল মেখে মুখে দিয়ো। গোয়ালাটা সুর ধরেছে, দুধের দর বাড়াবে।

পাউডার ফুরিয়েছে। নীলা পাউডার যে-ভাবে মাখে সে না-মাখারই সামিল। স্নান করার পর মুখের চক্‌চকে তৈলাক্ততাটুকু ঘুচাবার জন্য পাউডারের প্যাডটা শুধু বুলিয়ে নেয়। ক'দিন থেকেই আপিস যাবার সময় তার পাউডার কেনার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু ফেরবার সময় আর মনে হয় নি। আজ সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। তার বাপের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তাটুকু হ'ল তার সবটাই দুঃখের কথা—হতাশার কথা। কিন্তু ওর ভেতরের একটি কথা তার মনে বিচিত্রভাবে একটি সলজ্জ পুলকিত সুর তুলে দিয়েছে। "নতুন জীবনে নিজের ঘর বেঁধে তুই যদি চাকরী করতিস"—ওই কথাটি তার

মনে যেন গুঞ্জন ক'রে ফিরছে। বার বার মনে হচ্ছে, আজ শনিবার। সে আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখলে। চুলের সামনের দিকটায় আবার একবার চিরুণী দিয়ে ঈষৎ একটু পরিবর্ত্তন করলে। পাউডারের কৌটোটা কয়েকবার ঠুকে নিয়ে প্যাডটা সযত্নে মুখের উপর বুলিয়ে আয়নার দিকে চাইলে স্থির দৃষ্টিতে। তার রূপের দৈন্য সম্বন্ধে সে অচেতন, কিন্তু আজ নিজের ছবি তার নিজে ভালো লাগল।

নতুন জীবন—তার নিজের ঘর! ছোট একটি ফ্ল্যাট, হাল্কা অথচ সুন্দর অল্প কতকগুলি আসবাব, চারিদিকে পরিচ্ছন্নতার উজ্জ্বলতা, অনাড়ম্বর দুটি জীবনের প্রয়োজনে যতটুকু লাগে—শুধু ততটুকু; তার বেশী সে চায় না। ট্রামখানা দাঁড়াতেই সে উঠে পড়ল।

—উঠুন মশাই। লেডিস সিট। লেডি। শুনছেন?

ভদ্রলোক মুখ না ফিরিয়েই পিছনে হাত দিয়ে 'লেডিস' লেখা প্লেটটা আছে কি না পরখ ক'রে দেখলেন। আবার কানাইকে তার মনে প'ড়ে গেল। কানাইবাবুও সেদিন এমনিভাবে পিছনে হাত দিয়ে প্লেটটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন।

কানাইবাবুকে বরাবরই তার ভাল লাগে। অভিজাত বংশের কান্তিমান সবলদেহ তরুণটিকে দেখে সকলেরই ভাল লাগার কথা। মনে পড়ল তার কলেজ-জীবনের কথা। আজ বিকেলে কার্জ্জন পার্কে যে ফুলটি তার জীবনে ফুটবে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই কলেজ-জীবনে। তার সহপাঠিনীমহলে কানাইকে নিয়ে কত রহস্যালাপই হ'ত! বি-এ পর্য্যন্ত তারা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়েছিল; তখন তাকে তার সঙ্গে আলাপ হয় নাই; কারণ কানাই ছিল বিজ্ঞানের ছা[illegible] কেউ। ছাড়া কথাবার্ত্তা, আলাপেও সে বরাবরই অত্যন্ত সংযত। দাম্ভিক বিবাহ অনেকে অপবাদ দিত। কিন্তু তবুও তাকে নিয়ে আপনাদে ব্রাহ্মণ

রসিকতা করতে তারা ছাড়ত না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা পর্য্যন্ত এ রহস্যালাপে যোগ দিত। একদিন কলেজের ছাত্র-সমিতির একটি সভায় কানাইয়ের ব্যঙ্গশ্লেষভরা তীক্ষ্ণ যুক্তিসম্পন্ন বক্তৃতা শুনে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বলেছিল—আমি তো আজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছি। অবিশ্যি চক্রবর্ত্তীর চেহারা দেখেই অর্দ্ধেকটা পরাজিত হয়েছিলাম আগেই, আজ তার বক্তৃতা শুনে আমার পরাজয়টা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

একটি মুখরা এবং প্রখরা বাঙালী সহপাঠিনী বলেছিল—দেখ, তুমি যদি বল, তবে চক্রবর্ত্তীকে আমি কথাটা বলি।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ছিল নির্লজ্জ রকমের রসিকা, বলেছিল—দেখ, যে বাদাম ভাঙা যায় না—সে বাদাম দেখে জিভে জল পড়লেও, সে লোভ সংবরণ করাই ভাল। দাঁত ভেঙে আমি হাস্যাস্পদ হতে চাই নে। তার চেয়ে তোমার সুপুরীখেগো দাঁত, তুমি চেষ্টা কর। ভাঙতে যদি পার তো তখন দেখা যাবে। তা হোক না তোমার এঁটো।

নীলার প্রকৃতি অবশ্য কোন কালেই এ ধরণের নয়, কানাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ কলেজে কোনদিন হয় নি; কোনদিন এ ধরণের রহস্যালাপের মধ্যে সে বাক্যব্যয় করে নি, তবে শুনেছে; এবং উপভোগ ক'রে হয়তো মৃদু হাসিও হেসেছে। কানাইয়ের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ বাংলা দেশের ছাত্রসভার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে। তারপর পার্টির আপিসে। সেদিন এই ট্রামেই হয়ে উভয়ের সঙ্গে তার প্রথম ছাত্র-সমিতির এবং পার্টির গণ্ডীর বাইরে—দুঃখের পরস্পরকে উপলক্ষ্য ক'রে আলাপ হয়েছিল। তারপর কিছু মনে বা মধ্যেই আলাপ আজ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। কানাইয়ের জীবনে f উষ্ণ স্পর্শ সে অনুভব করেছে। কানাই আজ তাকে তার

জীবনের কথা বলবে। তার ওপর আজ বাপের ওই বেদনাদায়ক কথাটির মধ্য থেকে—অতি বিচিত্রভাবে তার মনে এক অভাবিত পুলকিত কল্পনা রসায়িত হয়ে উঠেছে, বিদ্যুদ্দীর্ণ আকাশের বর্ষণে সিক্ত পৃথিবীর বুকের মত।

শনিবারে আপিসের ছুটি অপেক্ষাকৃত সকালে।

তবুও সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ছুটির জন্য। ছুটি হতেই সে দ্রুত এল কার্জন পার্কে। প্রত্যাশা করেছিল, কানাই ব'সে থাকবে। কিন্তু কই কানাই? সে ক্ষুণ্ণ হয়েও নিজেকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলে—কানাই এলে সে বলতে পারবে—সে-ই আগে এসেছে। সে বসল। কিন্তু কানাই কই? ধীরে ধীরে আলো ম্লান হয়ে এল। লেড ল' কোম্পানীর ঘড়িটায় প্রায় ছ'টা বাজে। সে বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল। কেন সে এমন ভাবে প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে? তবু সে আরও কয়েক মিনিট ব'সে রইল—অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে এসে সে ট্রামে চ'ড়ে বসল।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় তার একাগ্র চিন্তান্বিত অন্তরের কল্পনা ভেঙে গেল। সত্যকারের ধাক্কা। ধর্ম্মতলা ও এসপ্লানেডের মোড়ে সারি-বন্দী ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ট্রামের ড্রাইভারের হিসেবের ভুলে ট্রামখানা বাঁধতে বাঁধতে আগের ট্রামের পেছনে বেশ জোরেই ধাক্কা খেয়েছে। নীলা মাথায় একটু আঘাত পেলে, পাশের জানলার কাঠে ঠুকে গেছে। তবু ভাগ্য যে, লোহার বিটে ধাক্কা লাগে নি। ট্রামসুদ্ধ লোক ড্রাইভারের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। নীলা কিন্তু একটু মৃদু হেসে নেমে পড়ল। তার মনে হ'ল—তাকে সচেতন ক'রে তুলবার জন্যই কৌতুক ক'রে এ ধাকাটা দিয়ে গেল কেউ। বাংলা দেশে গরীব বাপের কালো মেয়ের নীড় রচনার কল্পনা—বিবাহ নিয়ে সুখস্বপ্ন—এমনিভাবেই ভেঙে যাওয়া উচিত। অভিজাত ব্রাহ্মণ

বংশের সন্তান কানাই মুখে যে কথাই বলুক, ছাত্রাবস্থায় যত বড় আদর্শবাদের বড়াই করুক, ঘর তাকে বাঁধতে হবে জড়োয়া গয়না এবং বহুমূল্য বেনারসী পরা পায়ে আলতা আঁকা বাহুত নতমুখী কোন এক অভিজাত স্বজাতীয়ের কন্যাকে নিয়ে। সে মেয়ে হয়তো থার্ড ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছে, বাঁকা অসমান আখরে ইংরেজী এবং বাংলাতে নাম লিখতে পারে, হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু'চারখানা সিনেমা-সঙ্গীত গাইতে পারে, থিয়েটারের বইয়ের সমালোচনা করতে পারে, ঝি-চাকরদের কঠোর শাসন করতে পারে; তখন সে মেয়ের চোখে সত্যিই আগুন জ্ব'লে ওঠে; দয়া ক'রে ভিক্ষুককে উচ্ছিষ্ট বিতরণ করতে পারে অকাতরে অন্নপূর্ণার মত। এবং ব্রত ক'রে দূর্ব্বাগুচ্ছবাঁধা রাখী ধারণ ক'রে কামনা করে, এই সৌভাগ্য যেন তার জন্ম-জন্ম হয়, এমনইভাবে দীনদরিদ্র কাঙাল ভিক্ষুককে যেন সে জন্ম-জন্মান্তর তার সম্পদসমৃদ্ধ সংসারের উচ্ছিষ্টাবশেষ দিয়ে কৃতার্থ, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতকে ধন্য, জন্মকে সার্থক ও জন্মান্তরের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে পারে। তার সৌভাগ্য এবং পুণ্যকে সার্থক করবার জন্য যেন কাঙাল ভিক্ষুকরা জন্ম-জন্মান্তর থাকে। আপনার মনেই সে একটু হাসলে। অন্যমনস্ক ভাবেই সে আবার চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে চলছিল। বাড়ী ফিরতে ভাল লাগছে না।

ধর্ম্মতলায় রাস্তার ফুটপাথে সারিবন্দী ছেলের দল ব'সে গেছে জুতো পালিসের সরঞ্জাম নিয়ে। যুদ্ধের বাজারে এই একদল বালক-ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে। বিদেশী সৈনিকের দল চলেছে ভিড় ক'রে। তাদের জুতো পালিস ক'রে দিয়ে তারা জীবিকার্জ্জন করছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপঘাত-সমাপ্তি, বোধ করি, এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই ছেলেদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুচি এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশী—কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলে বাঙালীর মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও মধ্যে

মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বর্ণহিন্দু এমন কি ব্রাহ্মণ বৈশ্য কতজন আছে তার হিসেব কেউ রাখে নি। রাখবার আগ্রহও নেই—কারণ এ যেন এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু—স্নায়ু শিরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় জরায় জীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক বিলম্বিত মৃত্যু মরছে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ সমস্তের অতীত, ধরিত্রীর বুকের রূপ হতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বহমান প্রাণশক্তির প্রবাহ একান্ত নিরাসক্তভাবেই মুক্তির আগ্রহে নবকলেবরে প্রয়াণ করেছে। এস্‌প্লানেডের মোড়ের দক্ষিণ দিকের ফুটপাথের বাঁকের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে পথের উপর একটা ভিড় জ'মে গেছে। একটা লোক এখানে নিয়মিতভাবে কোন সস্তা সেন্টের বিজ্ঞাপন প্রচার করে গন্ধসিক্ত এক টুকরো অয়েল-পেপার হাতে দিয়ে; সে লোকটা হাত বাড়িয়ে কাগজ দিতে এল; বিরক্তিভরেই নীলা তার হাতটাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। আবার একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট।

একখানা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী মিলিটারী লরীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। গাড়ীর বা গাড়ীর আরোহীদের কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু একটা ঘোড়া—অস্থি-কঙ্কালসার মর্কট জাতীয় খোড়া—ঘোড়ার জুড়ি আবদ্ধ রাখবার লোহার ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেছে, গোটা গাড়ীটা এখন ওই হতভাগ্য জীর্ণ জানোয়ারটার ওপর চেপে পড়েছে। ঘোড়াটার পিছনের পায়ের উপরের অংশ থেকে গড়িয়ে পড়েছে রক্তের ধারা। সদ্য সদ্য ঘটেছে অ্যাক্‌সিডেন্টটা। গাড়োয়ানটা সবে নীচে নামছে তার আসন থেকে। একটি বাঙালীর ছেলে কিন্তু এরই মধ্যে চাকা-খানা ধ'রে প্রাণপণে গোটা গাড়ীখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। কে ও? নেপী! হ্যাঁ, নেপীই তো। এই তো সামনেই প'ড়ে রয়েছে নেপীর মান্ধাতার আমলের সাইকেলটা। আনন্দে অহঙ্কারে তার মনটা ভ'রে উঠল। কিন্তু একা নেপী বোঝাই গাড়ীটা তুলতে পারছে না।

আর কেউ যাচ্ছে না। অথচ চার পাশে ভিড় জমতে আরম্ভ হয়েছে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক দাঁড়িয়ে নেপীর বীরত্ব দেখছে। তার ইচ্ছে হল—হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে যায়। কাপড়ের আঁচলটা সে কোমরে জড়াতে শুরু করলে। কিন্তু তার আগেই দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল দুজন সৈনিক। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কেউ নয়, এরা দুজন নূতন আগন্তুক। নেপীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে মুহূর্ত্তে তারা গাড়ীটা আলগোছে তুলে ফেললে।

রাস্তার ধারের জানোয়ারদের জল খাবার জন্য তৈরী চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে ঘোড়াটার রক্তের ধারা মুছিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে জল খাইয়ে, তারা ধুলো রক্ত এবং জল মাখা হাত বাড়িয়ে দিলে নেপীর দিকে। লাজুক নেপীও হাত বাড়িয়ে দিলে সলজ্জ হাসিমুখে। ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে নীলা নেপীর পিছনে এসে ডাকলে—নেপী!

পিছনের দিকে তাকিয়ে নেপীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—দিদি! সৈনিক দুজন সম্ভ্রম ভরেই নীরবে নীলার দিকে চেয়ে রইল। নেপী এতক্ষণে যেন বলবার কথা খুঁজে পেলে—হাসিমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললে—আমার দিদি।

তারা মাথা নীচু ক'রে নীলাকে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বললে—আপনার ভাই খুব সাহসী ছেলে!

নীলা বললে—আপনারা যেভাবে কালা-আদমির বিপদে সাহায্য করেছেন—আমি দেখেছি; আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাদের একজন বললে—আমাদের দেশবাসী ওই যারা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাসছিল, তাদের ব্যবহারে আমরা লজ্জিত। তবে ওরা পেশাদার সৈনিক—টমিজ।

অপর জন বললে—আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বোধ হয় লোকের ভিড় জমাচ্ছি। একটু স'রে গিয়ে ঐ পার্কের মধ্যে দাঁড়ালে হয় না?

সৈনিকদের একজনের নাম জেম্‌স স্টুয়ার্ট—অপরের নাম হেরল্ড ম্যাকেঞ্জি। যুদ্ধের পূর্ব্বে তারা ছিল অক্সফোর্ডের ছাত্র। হেরল্ড হেসে বললে—ছেলেবেলায় শুনেছিলাম ভারতবর্ষের নাম—বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সে দেশ নাকি এক অদ্ভুত দেশ! সেখানকার মানুষ সম্বন্ধে শুনতাম অদ্ভুত গল্প, সে দেশের জঙ্গলে নাকি অসংখ্য বাঘ, পথে চলতে পায়ে-পায়ে সাপ বের হয়। তখন থেকেই ইচ্ছা ছিল—বড় হ'লে ভারতবর্ষে যাব। অক্সফোর্ডে পড়বার সময় মহাকবি টেগোর, মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইভাবে ভারতবর্ষে আসতে হবে, তা ভাবি নি।

নীলা হেসে বললে—কেমন দেখছেন আমাদের দেশ?

জেম্‌স বললে—খুব ভাল লেগেছে আপনাদের দেশ। বিশেষ যখন ট্রেনে কোন দূর জায়গায় যাই তখন—মনে হয় জাদুর দেশ।

—মানুষ? গল্পের মানুষের সঙ্গে মিল পেয়েছেন?

হেরল্ড বললে—যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন সত্যিই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। অসভ্য বর্ব্বর ইত্যাদি যে সব বিশেষণ আমাদের দেশের রাজনীতিকরা প্রয়োগ ক'রে থাকেন, তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে দেখছি আপনাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের দেশের শিক্ষিত পণ্ডিতদের চেয়ে কোন অংশে ছোট বা খাটো নন। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের হার অবশ্য বেশী; সেটা পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। আর···কথা শেষ না ক'রেই হেরল্ড যেন সঙ্কোচভরেই একটু হাসলে।

নীলাও হেসে প্রশ্ন করলে—অনুরোধ করছি—বলতে সঙ্কোচ করবেন না।

হেসে হেরল্ড বললে—আপনাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা বড়

গরীব, এবং গরীব ব'লে তাদের আপনারা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছেন। যার ফলে তারা অত্যন্ত ভীরু; এমন কি তারা নিজেরা নিজেদের মানুষ ব'লে ধারণা করতে পারে না।

লাজুক নেপী এবার মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল, বললে—কিন্তু আমাদের দেশে এককালে, এই ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব্বে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল।

জেম্‌স এবার বললে—এই বিতর্কের ভয়েই বোধ হয় হেরল্ড কথাটা বলছিলেন না।

হেরল্ড বললে—কিন্তু মিঃ সেন, আমার ধারণা, যারা অস্পৃশ্য তাদের অবস্থা, তোমাদের দেশ যখন সমৃদ্ধিশালী ছিল, তখনও ভাল ছিল না; তারা চিরদিনই গরীব।

—ধনী-দরিদ্র আপনাদের দেশেও আছে। এবং ধনীর চাপে দরিদ্রেরা চিরদিনই ভয়ে বোবা হয়ে থাকে। পরাধীন দেশে সেটা আরও বেশী হয়েছে। দেখবেন লক্ষ্য ক'রে একজন অশিক্ষিত গরীব দেশী খ্রীষ্টান তারই মত অশিক্ষিত গরীব হিন্দু বা মুসলমানের চেয়ে বেশী সাহসী। তার কারণ তারা আমাদের শাসকদের ধর্ম্মাবলম্বী।

নেপী মুখ চোখ লাল ক'রে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নীলা বাধা দিয়ে বললে—ও আলোচনা আজ থাক্; যদি আবার কোনদিন দেখা হয় আলোচনা করব। আজ আমি এইবার বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছে।

জেম্‌স বললে—আর কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে বলছি, মার্জ্জনা করবেন। একটা খবর জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে।

—বলুন।

একখানা খবরের কাগজ খুলে নীলার সামনে ধ'রে বললে—এই সমালোচনাটা কি নির্ভরযোগ্য? আপনাদের দেশের নাটক দেখতে চাই আমরা। এই বইটা কি আপনি দেখেছেন?

সংঘর্ষ' নামক একখানি নাটকের সমালোচনা। আগামী কাল রবিবার বইখানার শততম অভিনয় হবে, সেই সংবাদ জানিয়ে বইখানির যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। এই নাটকের অভিনয় নীলা দেখে নি, তবে বইখানি পড়েছে। বইখানি সত্যিই ভাল বই, এবং অভিনয়ও নাকি ভাল হয়েছে ব'লে শুনেছে।

কাগজখানি ফেরত দিয়ে সে বললে—হ্যাঁ। বইখানি সত্যিই ভাল বই, আমি পড়েছি। এবং অভিনয়ও ভাল হয়েছে ব'লে শুনেছি।

—আপনি দেখেন নি ?

—না।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত ক'রে জেম্‌স নেপীকে বললে—সেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নাটক দেখ—তবে ভারি খুশী হব। আমরা অবশ্য বাংলা পড়ছি, কিন্তু এখনও কিছুই বুঝতে পারি না। তুমি যদি বুঝিয়ে দাও আমাদের। অবশ্য অনুরোধ করতে পারি না—

নীলা বললে—আপনারা যদি আমাদের অতিথি হিসাবে আসেন থিয়েটারে তবে নেপীর সঙ্গে আমি আসতে পারি।

মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে তারা দুজনেই বললে—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছি।

বাড়ীতে এল নীলা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। কিছুই যেন ভাল লাগছে না। কাপড় না ছেড়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা এলেন।

—কি, তুই অমন ক'রে শুলি যে ?

—এমনি।

মা বললেন—ও ঘরে অমর শুয়েছে মাথা ধরেছে ব'লে। তুই শুলি —এমনি। একমাত্র বাঁদী আমি—জলখাবার পৌঁছে দি। আমার যেমন—

বাধা দিয়ে নীলা বললে—দাদার মাথা ধরেছে ?

বেরিয়ে যেতে যেতে মা বললেন—মাথা ধরেছে কি না সেই জানে, তবে কপালে আগুন লেগেছে। চাকরীতে আজ জবাব হয়েছে।

(পনেরো)

রবিবার। ঘুম ভেঙে নীলা উঠল।

নীলা অবশ্য ভোরেই ওঠে। বাঙালীর গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এটা আবহমান কালের অভ্যাস। শহরের বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা রাত্রি থাকতেই উঠে থাকে। নীলারও সেই অভ্যাস। আজ কিন্তু নীলা বাইরে এসে দেখলে তখনও রাত্রি রয়েছে। সে বারান্দায় দাঁড়াল। রাত্রে তার ভাল ঘুম হয় নি। কালকের দিনটা তার পক্ষে বড় খারাপ দিন গেছে।

দাদার চাকরী গেছে। পঁয়ত্রিশ টাকা আয় ক'মে গেল। অথচ দাদার ছেলেমেয়ে নিয়েই সংসার। একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। মেয়েটির বয়স ছয়, তার জন্যে খরচ খুবই কম, তার দুধ এরই মধ্যে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, খায় সে অনেকবার—দাদুর পাতে, পিসীমার অর্থাৎ নীলার পাতে, ঠাকুমার পাতে—মোট কথা পাতের খেয়েই তার চ'লে যায়। নীলা প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু নীলার মা বলেছিলেন—থাক্ মা, ওকে আর আমি ইস্কুলমুখো হতে দেব না। ভয় নেই—ওর কোন কষ্ট হবে না।

নীলা জানে, তার মা তার এই এতটা বয়স পর্য্যন্ত কুমারীত্ব পছন্দ করেন না—মনে মনে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করেন। তাঁর ধারণা সে অর্থাৎ নীলা যদি ইস্কুল-কলেজে না পড়ত তবে এতদিন কখনই অবিবাহিত থাকত না।

তার বউদিদিও গোপনে নীলাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন যেন মেয়ের পাতের কুড়িয়ে খাওয়া নিয়ে সে কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে।

নীলা দুঃখিত হয়েও চুপ ক'রে থাকে। তার বউদিদির মনও সে বুঝতে পারে। বউদিদি নিজের স্বামীর অল্প উপার্জ্জনের জন্য লজ্জিত।

দাদার মুখ দেখে সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয় তার। শান্ত মানুষটির হাসিও নেই, দুঃখেরও কোন প্রকাশ নেই—বোবার মত থাকেন। ঘরে থাকলেও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। বাইরে এসে বাপের কাছেও কখনও বসেন না। ব্যর্থতার যেন জীবন্ত মূর্ত্তি। কাল থেকে এসে ঘরে ঢুকেছেন আর বের হন নাই। রাত্রে খান নাই। মাথা ধরেছে বলে শুয়েছিলেন—ওঠেন নাই। বাবা নিজে এসে একবার ডেকেছিলেন। মৃদুস্বরে দাদা উত্তর দিয়েছিলেন—সত্যিই মাথা ধরেছে বাবা।

দেবপ্রসাদ আর কিছু বলেন নাই। খেতে ব'সে হেসে স্ত্রীকে বলেছিলেন—সাপে ব্যাঙ ধ'রে খায় দেখেছ?

নীলার মা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। দেবপ্রসাদ বলেছিলেন—আমাদের সংসারটা ব্যাঙ—আমাদের সাপে ধরেছে। প্রথমটা ব্যাঙগুলো লাফাতে চেষ্টা করে, চেঁচায়, ক্রমে সাপটা যত গিলতে থাকে ধীরে ধীরে ব্যাঙটা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে, চ্যাঁচানির বদলে কাত্‌রায় আস্তে আস্তে; তারপর সব চুপ।

নীলার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল; কানাইয়ের ব্যবহারে সে আঘাত পেয়েছে। কানাই যে হৃদ্যতা এবং আবেগের সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল তাতে সে অনেক কল্পনা করেছিল। তার উপর বাপের কথা শুনে দুঃখ পাওয়ার চেয়েও বেশী কিছু পেলে—সারা অন্তরটা সকরুণ ভাবে শোকার্ত্ত হয়ে উঠল। যতবার সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে—দীর্ঘনিশ্বাসগুলি কেঁপে বেরিয়ে এসেছে। অনেকবার সে ভাবতে চেয়েছে, কানাইয়ের সঙ্গে যে তার দেখা হয় নাই সে ভালই হয়েছে। নীড় গড়াবার সকল কল্পনা মুছে ফেলে ভেবেছে, সে আজীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে যাবে; দাদার ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে

তুলবে। সেই হবে তার জীবনের একমাত্র কাজ। মধ্যে মধ্যে ভেবেছে রাজনীতির সংস্রব সে ত্যাগ করবে।

এরই মধ্যে আর একটা চিন্তা তাকে পীড়িত করেছে। আজ সে উত্তেজিত মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ একটা বড় ভুল ক'রে বসেছে। জেম্‌স এবং হেরল্ড ব'লে যে সৈনিক দুজনের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়েছে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট এবং নেপীকে উপলক্ষ্য ক'রে—তাদের সে কাল অর্থাৎ রবিবারের বাংলা নাটকের অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করেছে। বার বার মনে হ'ল, অন্যায় হয়েছে—অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বিদেশী সৈনিক, নিতান্তই অপরিচিত, একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে একটা আচরণ দেখে তাদের বিচার করা যায় না। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে সৈন্যদের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিশেষ অধ্যায় রচনা ক'রে আসছে। আজ সেটা হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয়েছে এমন ভাবনার কারণ নাই। তা ছাড়া বাবা শুনলে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন। তিনি যতই উদার হোন, মেয়েদের সহশিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করতে চান না। বিশেষ ক'রে বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শুনলে হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

নীলা বাপের মতে সায় দিতে না পারলেও তাঁকে দুঃখ দিতে চায় না। তারা যখন লাখে লাখে এদেশে এসেছে, পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন পথে বের হ'লে আলাপ হবেই। পরিচয়ে বন্ধুত্বে নীলা দোষ দেখে না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে সেও নারাজ। ওদের মধ্যে ভদ্র শিক্ষিত সত্যকার ভাল লোক আছে, কিন্তু অশিক্ষিত অভদ্র মানুষেরও তো অভাব নাই। যারা ভদ্র শিক্ষিত তাদেরও তো জীবন আজ স্বাভাবিক নয়! যুদ্ধের আবহাওয়ায় জীবন-মরণের অনিশ্চয়তার দোলার মধ্যে নিষ্ঠুর হতাশার মধ্যে সর্ব্ববিশ্বাস হারিয়ে জীবনের পেয়ালা ভোগরসে পূর্ণ ক'রে নিয়ে পান করতে চাওয়াটা তো তাদের পক্ষেও অস্বাভাবিক নয়। হয়তো অনেকে সাময়িক ভাবে প্রেমেও অভিভূত

হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পরে—সে প্রেম নেশাভঙ্গের মত ভেঙে যেতে পারে এবং যাওয়াই স্বাভাবিক। নীলা জীবনের ও সমস্যাটাকে এমন লঘুভাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়।

—কে? নীলা? দেবপ্রসাদ উঠেছেন।

—হ্যাঁ বাবা! নীলা সচেতন হয়ে উঠল। ফরসা হয়ে এসেছে। সে ঘরের কাজে যাবার জন্য উদ্যত হ'ল।

দেবপ্রসাদ বললেন—এত সকালে উঠেছিস মা?

হেসে নীলা বললে—আজ একটু বেশী ভোরেই ঘুম ভেঙেছে বাবা।

"আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার—জোর খবর!" খবরের কাগজের হকারেরা বেরিয়েছে। ময়লার গাড়ী চলেছে। প্রথম ট্রামখানা চ'লে গেল। অদূরস্থ ট্রামরাস্তা থেকে ঘর্ঘর শব্দ আসছে।

—আ-গিয়া বাবু! আ-গিয়া!

খবরের কাগজওয়ালা তাদের বাড়ীতেই ডাকছে। 'আ-গিয়া হাঁকটি ওর নিজস্ব।

নীলা দরজা খুলে কাগজখানা নিলে।

কাগজওয়ালা বললে—খুচরো পয়সা তিন আনা যদি দিতেন।

নীলা বললে—দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি। কিন্তু টাকার ভাঙানি দেবে তো?

—ভাঙানি? ভাঙানি কোথায় পাব?

—তবে?

লোকটা বকতে বকতে চলে গেল—ভাঙানি, ভাঙানি আর ভাঙানি! সবাই চায় ভাঙানি। ভাঙানি কি দেশে আছে রে'বাবা!

নীলা একটু হাসলে। সত্যই দেশে এক মহা-সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেজগী দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। বাসে ট্রামে ভাঙানি না থাকলে

নামিয়ে দেয় ; বাজারে গেলে খুচরো না থাকলে—জিনিস কেনা যায় না। কিনতে হ'লে পুরো টাকায় কিনতে হয়। কাল, তাদের বাড়ীতেই সাগু আনতে হয়েছে এক টাকার। তাদের ঠিকে ঝিয়ের নাকি কাল খুচরোর অভাবে বাজার হয় নাই।

বাবার হাতে সে খবরের কাগজটা তুলে দিলে।

দেবপ্রসাদ কাগজ খুলে বসলেন, বললেন—ঝি তো এখনও আসে নি।

হেসে নীলা বললে—উনোন ধরিয়েই চা ক'রে আনছি বাবা।

দেবপ্রসাদের ওই চায়ের নেশাটিই একমাত্র নেশা।

চা তৈরী ক'রে বাপের কাছে কাপটি নামিয়ে দিলে।

দেবপ্রসাদ বললেন—তোর ?

নীলা নিজের চা নিয়ে এসে বসল। দেবপ্রসাদ কাগজখানা এগিয়ে দিলেন।

'আরাকান অঞ্চলে জাপানীদের সঙ্গে সংঘর্ষ।' 'রুশিয়ায় তুমুল সংগ্রাম।' 'আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের কৃতিত্ব।'

দেবপ্রসাদ বললেন—মিঃ বি আর সেনের রিপোর্টটা পড়্।

প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান ডিভিশনের অ্যাডিশনাল কমিশনার মিঃ বি আর সেন আই-সি-এস্ মহোদয় মেদনীপুরের সাইক্লোন-বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।

"একটি গ্রামের একশো পঞ্চাশ জন অধিবাসীর মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে আছে। অন্য একটি গ্রামে একশো ছত্রিশ জনের মধ্যে বেঁচে আছে চার জন ; একশো বত্রিশ জন মারা গেছে। শতকরা পঞ্চাশ জন লোক পানীয় জলের অভাবে বাসভূমি ছেড়ে চ'লে গেছে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে মানুষ বাস করছে। পানীয় জল, শীতবস্ত্র, পরনের কাপড়

আর অন্নের জন্য মানুষ হাহাকার করছে। বহু মাইল অতিক্রম ক'রেও একটা গরু আমি দেখতে পাই নাই।"

নীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

দেবপ্রসাদ বলেন—আমরা তো স্বর্গসুখ ভোগ করছি মা!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে 'থেকে বললেন—তাই তো কাল রাত্রে শুয়ে নিজেই লজ্জা পেলাম নিজের কাছে। আমার বাবা বলতেন, কখনও উপরের দিকে চেয়ো না, মানে তোমার চেয়ে বড়লোক যারা তাদের দেখে নিজের অবস্থা বিচার ক'রো না, দুঃখের আর সীমা থাকবে না। চেয়ে দেখো নীচের দিকে। মানে, কতশত লোকের তোমার চেয়ে অবস্থা খারাপ সেই দিকে চেয়ে দেখো। তা হ'লে আক্ষেপ থাকবে না। সেই কথাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ল—"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি আমি ভয়।" লজ্জা পেলাম নিজের কাছে।

বাপের কথায় নীলাও সান্ত্বনা পেলে। খবরের কাগজটা সে ওল্টালে। আমোদ-প্রমোদের বিজ্ঞাপনগুলো বড় বড় হরফে বিচিত্র ছাঁদে সন্নিবিষ্ট হয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে তার নজরে পড়ল—"— থিয়েটার। — প্রণীত অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'সংঘর্ষ'। শততম অভিনয় উৎসব। দেশপ্রেমিক পণ্ডিতপ্রবর — সভাপতিত্ব করবেন।"

সে অন্যায় করেছে। সে বিদেশীয়দের নিমন্ত্রণ করেছে। উচিত হয় নাই তার। তবুও এক্ষেত্রে উপায় নাই। সে যদি না যায় তবে বিদেশী দুটি কি ভাববে? দেশে গিয়ে কি বলবে? তার সম্বন্ধে বি হীন ধারণা করবে এবং করলে অন্যায় হবে না।

সে কুণ্ঠিতভাবে বললে—বাবা!

—কি মা?

—আমি একটা কাজ ক'রে ফেলেছি।

—কি? দেবপ্রসাদ বিস্মিত হলেন।

আমার দুটি বন্ধুকে কথা দিয়েছি আজ থিয়েটার দেখাব। সংঘর্ষ নাটকখানা নাকি খুব ভাল হয়েছে। আজ তার একশো রাত্রির উৎসব। — সভাপতিত্ব করবেন।

বন্ধু বলতে দেবপ্রসাদ বান্ধবীই বুঝলেন। হেসে বললেন—বেশ তো। কথা যখন দিয়েছ, যাবে।

নেপীকে নিয়ে যাব বাবা।

—বেশ।

নীলা উপার্জ্জন ক'রে সব তাঁকে এনে দেয়। এতে দেবপ্রসাদের গোপন লজ্জা এবং বেদনা দুই অনুভব করেন। আজ সে থিয়েটার দেখে কয়েকটা টাকা অপব্যয়, হ্যাঁ তাঁর মতে অপব্যয়, করতে অনুমতি চাওয়ায় তিনি খুশী হলেন; সম্মতি দিয়ে যেন তৃপ্তি বোধ করলেন।

বাবার সম্মতি পেয়ে নীলা আশ্বস্ত হ'ল—কিন্তু তবুও বার বার অন্য কারণে সে নিজেকে অপরাধী না ভেবে পারলে না। নিমন্ত্রণ ক'রে অভিনয় দেখাবার তার সামর্থ্য কোথায়? চারজনের অন্তত আট টাকা লাগবে। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তাদের বাড়ীর কচি বাচ্চাদের যেখানে দুধ বন্ধ হয়েছে, দাদার চাকরী গেছে, সেখানে এই বিলাসের জন্য ব্যয়—নিজে সে কোনমতে সমর্থন করতে পারলে না।

তার আরও অনুতাপ হ'ল অভিনয় দেখতে গিয়ে। ভিড়ে বুকিং আপিসের কাছে পৌঁছানো যায় না। চারিদিকে সাজসজ্জার সমারোহ। কোনমতে টিকিটের জানালায় গিয়েও নেপী ফিরে এল। দু'টাকার টিকিট নেই। কয়েকখানা আছে তাও একসঙ্গে নয় এবং সে সিটগুলির সামনে আছে থামের প্রতিবন্ধক। কৃতকার্য্যের জন্য নীলার আত্মগ্লানির সীমা রইল না। কিন্তু তার পাশেই দাঁড়িয়ে

আছে জেম্‌স এবং হেরল্ড। নীরবেই সে আরও একখানি পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে নেপীর হাতে দিলে।

তিন টাকার সিট অনেকটা আগে। সৌভাগ্যক্রমে সিটও পাওয়া গেল দ্বিতীয় সারিতে একেবারে, মাঝখানে, বিদেশীদের পাশে নীলা বসল। কিন্তু সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, অভিনয় দেখার আনন্দের চেয়ে মনের গ্লানি তার প্রবল হয়ে উঠেছে।

জেম্‌স তাকে প্রশ্ন করলে—আপনি কি অসুস্থ মিস্ সেন?

নীলা চমকে উঠল। আপনার দুর্ব্বলতা বুঝে সে আপনাকে সংযত করলে। হেসে বললে—না তো।

—কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

নীলা হেসে বললে—দেখুন, আমাদের দেশে মানুষের জীবন এত দুঃখকষ্টে ভরা যে এর ওপর বিয়োগান্ত নাটক আমাদের সহ্য হয় না। আমি বইখানার বিয়োগান্ত পরিণতির কথা মনে ক'রে পীড়িত হয়ে উঠেছি।

ওদিকে তখন মঞ্চের পর্দা অপসারিত হচ্ছিল।

নেপী তার হাত ধ'রে আকর্ষণ ক'রে ব'লে উঠল—কানুদা!

আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের উপর সভাপতি এবং সম্ভ্রান্ত অতিথিরা বসেছেন। শততম অভিনয় উপলক্ষ্যে আনন্দ-অনুষ্ঠান হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হবে, নাট্যকারকেও অভিনন্দন জানিয়ে উপহার দেওয়া হবে। ওই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাবেশের মধ্যে ব'সে আছে কানাই।

মুহূর্ত্তের জন্য সকল বিষণ্ণতা তার দেহ-মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য পর-মুহূর্ত্তে গভীরতর বিষণ্ণতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

প্রথমে সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল—কানাই একদিনেই এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে? পর-মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কি সে তার সঙ্গে দেখা করবার অবসর পায় নাই অথবা দেখা করে নাই? কি সে বৈশিষ্ট্য? কানাই বলেছিল, সে ব্যবস্থা করছে। একদিনেই প্রাচীনকালের ধনী-বংশের সন্তান ধনোপার্জ্জনের আস্বাদ পেয়েছে! তার রক্তের সুপ্ত ধনিজনোচিত মনোভাব ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, যার জন্যে তার অভিজাত আত্মীয় বা বান্ধবদের সহায়তায় ওইখানে বসবার আসন সংগ্রহ করতে তার দ্বিধা হয় নাই;—সংগ্রহে বেগ পাবার অবশ্য কথা নয়।

তার পাতলা ঠোঁট দুখানির মিলনরেখাটি ধনুকের মত বক্র হয়ে উঠল।

(ষোল)

কানাই কিন্তু এসেছিল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হয়ে। বিজয়দার প্রতিভূ হিসেবে। তাই সে আসন পেয়েছিল মঞ্চের উপর বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে।

গত কাল থেকে অর্থাৎ শনিবারেই সে খবরের কাগজের চাকুরীতে ভর্ত্তি হয়েছে। বিজয়দা'দের সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশিষ্ট এবং বড় প্রতিষ্ঠান। একখানা ইংরিজী এবং একখানা বাংলা দৈনিক পত্র বের হয়। এ ছাড়া আছে মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্র। বাংলা দৈনিক পত্র 'স্বাধীনতা'-র 'নাইট এডিটার' হিসেবে কানাই চাকরী পেয়েছে। রাত্রি দশটা থেকে ভোরবেলা পর্য্যন্ত তার কাজের সময়।

বিজয়দা তাকে বলেছিলেন—দেখ্ পারবি তো? রাত্রিতে কাজ। রাতিকে কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। অথচ এর মধ্যে সঞ্জীবনী সুধা প্রেম বা বিরহ নেই। দেখ্।

রাজি হ'ল না। বিয়ে ও কিছুতেই করবে না। দ্বিপদকে চতুষ্পদ করার ভার তা হ'লে আপনার ওপরেই রহিল।

গুণদা-দা বললেন—সে বিষয়ে অযোগ্যতা আমার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই বাঁদর দুটোকে কিছুতেই বিয়েতে রাজি করতে পারি নি। অগত্যা গরুর বদলে বাঁদর বানিয়েছি। হাত পেতে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য ক'রে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। ওকেও তাই ক'রে নেব। আর পারি তো—। তিনি হাসলেন।

বিজয়দা হেসে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

কানাইয়ের বেশ ভাল লাগল নূতন জীবন। পরম হৃদ্যতার মধ্যে আসরটি বসেছে। গুণদা-দা রসিকতার পর রসিকতা ক'রে আসর জমিয়ে রেখেছেন। তবে তাঁর রসিকতাগুলি কিছু আদিরসাত্মক। এগুলি কিন্তু আসরের লোকেদের কাছে নেশার মত অভ্যাস হয়ে গেছে। গুণদা-দা গম্ভীর হ'লেই তাদের কারও ঘুম আসছে, কেউ হাই তুলছে, কেউ আড়ামোড়া ছাড়ছে। কানাই লজ্জিত ভাবেই দ্রুতবেগে কাজ ক'রে যেতে লাগল। গুণদা-দা বললেন—কানাই তো বিয়ে কর নি। হ্যাঁ, বিজয় তো তাই বললে।

কানাই হাসলে।

—প্রেমেও পড় নি কখনও? সত্য কথা বল ভাই।

—না।

—তুমি অতি হতভাগ্য। এমনভাবে তিনি কথাটা বললেন যে, কানাইও না হেসে পারলে না।—আরে ছি ছি! এই নারীপ্রগতির যুগ, কো-এডুকেশনের সমারোহের মধ্যে ছ'টি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরলে ফিরলে কি জন্যে তবে? তারপর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললেন—এই দেখ, এই একেই বলে পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব। কানাইকে আবার বললেন—দেখ ভাই, এদের চার জনের দুজনে বিবাহিত। একজন

প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। একজন খাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। এদের এই রাত্রি-জাগরণের বিরহের আসরে আমাকে রসিকতা করতে হয়—প্রেমপত্র-বাহক পিওনের মত। নইলে ওদের ঘুম আসে। তুমি যেন এদিকে কান দিয়ো না।

মধ্যে মধ্যে চা আসে, বিড়ি সিগারেট চুরুটের—গুণদাবাবু চুরুট খান—ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে; রসিকতা চলে—কাজ চলে; রয়টার, এ-পি, ইউ-পি প্রভৃতি সংবাদসরবরাহ-প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব টেলিগ্রাম আসছে সেগুলির দ্রুত অনুবাদ করা হচ্ছে, কাগজে ছাপা হবে। গুণদা-দা অনুবাদগুলি দেখে দিচ্ছেন। কানাইয়ের অনুবাদ দেখে গুণদা-দার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বললেন—কানাই, তুমি তো ভাই চমৎকার লেখ! বাঃ, বেশ হয়েছে!

কানাই খুশী হ'ল, উৎসাহিত হ'ল। মৃদু হেসে সে অনুবাদ করতে লাগল। রয়টারের তারের খবর—

LONDON :—The German news agency announces that Colonge was attacked by the R. A. F. last night.

LONDON :—Last night heavy bombers caused great damage to industrial districts of Colonge. Fighters have made several night-raids on northern France and the low countries.

কানাই অনুবাদ ক'রে গেল। অন্য কেউ কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করলে, তার কাজ সে নিজেই টেনে নিলে—দিন্, আমি ক'রে ফেলি।

কখনও কখনও জ'মে ওঠে তুমুল যুদ্ধালোচনা। স্টালিনগ্রাদ রাশিয়ানরা কেড়ে নিতে পারবে কি না? প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে প্রাণপণ লড়াই ক'রে যা রাখতে পারে নি, জার্মানদের অধিকার থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব।

কানাই প্রতিবাদ ক'রে বললে—রাশিয়ানরা পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে সৈন্য নয়। তারা যুদ্ধ করছে নিজের জন্যে। ভরোকিলভ কি বলেছেন জান?—"Whoever can lift a rifle, should have one."

গুণদাবাবু কিন্তু ওতে যোগ দেন না। আলোচনা তিনি থামিয়ে দিলেন, বললেন—দেখ, ওসব চলবে না এখানে। যে সমস্ত বলদে চিনির ছালা ব'য়ে নিয়ে যায়, তারা কখনও চিনি খায় না, চিনি তাদের খেতে নেই। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর অনুবাদ করছিস ক'রে যা—যুদ্ধের আলোচনা তোদের করতে নেই। যদি করিস, তবে তোদের বউয়ের দিব্য। তাতেও যদি না মানিস, তবে night editorship ছেড়ে দেব আমি।

—ছেড়ে দেবেন?

—দেব না! দেখ, আমার বউ ভয়ানক ঝগড়াটে, দিনের বেলায় বউয়ের হাত থেকে রেহাই পাই কণ্ট্রোলের দোকানে—কিউয়ের সকলের শেষে দাঁড়িয়ে; রাত্তিরেও তার ঝগড়ার বিরাম নেই ব'লেই-না এই চাকরী নিয়ে এখানে এসে তোদের নিয়ে রসিকতা ক'রে আনন্দ করি! তোরাও যদি কচ্‌কচি আরম্ভ করবি, তবে আর এ চাকরী কেন করব? ব'লেই তিনি ঘণ্টায় ঘা মারলেন—ঠন-ঠন-ঠন। ঠন-ঠন-ঠন! অবশেষে ঠন-ন-ন-ন-ন। তারপর হাঁকলেন—ওরে জগুয়া—জ-গ—! চা নিয়ে আয়—চা!

আসলে গুণদাবাবুর এই সব আলোচনা পছন্দ হয় না। তিনি রাশিয়ার মত সাম্যবাদীর দেশের জয়ে যে আনন্দ পান না এমন নয়, তবে তাঁর বুকে এই দেশের দুঃখের বোঝা, এদেশের মানুষের বন্ধনের বেদনা এত গভীর যে, তাকে ছাপিয়ে ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না।

হঠাৎ তিনি বললেন—কানাই ভাই, বিজয়কে আমি জানি, এক

সময় একসঙ্গে কাজ করেছি। তুই তার চ্যালা। তোকে একটা কথা বলি। রাশিয়ার জয় হোক ভাই। কিন্তু সে জয় উপলক্ষ্য ক'রে আনন্দে যখন নাচতে যাই, তখন হাতে পায়ের শিকলের বাঁধনে যে সমস্ত শরীর ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে। সে বেদনা কেমন্‌ মন্ত্রে তোরা জয় করলি বলতে পারিস্‌? কানাই অবাক হয়ে গেল। গুণদাবাবুর চোখ ছলছল করছে। সে বলতে গেল তার কথা। গুণদাবাবু হাত তুলে ইসারা ক'রে বললেন—থাক্‌। তারপর বললেন—শুনব একদিন। বুঝি না তা নয়। তবু মমতাকে জয় করতে পারি নে। বিশ্বাস করতে পারি নে। তবে তোদের আমি অবিশ্বাস করি নে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কানাইয়ের ভালই লাগল। সে মনে মনে একটি ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুললে।

পরদিন সোমবারের কাগজে কানাইয়ের একটা প্রবন্ধ বের হবে, যে প্রবন্ধটা তার কৃতিত্বের নজীর হিসেবে বিজয়দা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেছিলেন সেইটে। তাই রবিবার বেলা দুটোর সময়েই কানাই আপিসে এসেছিল, প্রবন্ধটার প্রুফ দেখবার জন্য। রবিবার অধিকাংশ কর্ম্মীরই ছুটির দিন। কর্ম্মগুঞ্জনমুখর এতবড় আপিসটা আজ প্রায় স্তব্ধ। অর্থনৈতিক আলোচনা-বিভাগের সম্পাদক ব'সে নিজে প্রুফটা ধরেছেন, কপি ধরেছে কানাই।

এই প্রবন্ধে, কানাই সেদিন অমলবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাগানে গিয়ে যে ছবি দেখে এসেছে নিখুঁতভাবে তাই বর্ণনা ক'রে—তুলনা করেছে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম আমলের অবস্থার সঙ্গে। বিদেশীয় শাসনতন্ত্রের নানা কূট কৌশলের বাধায় যে বৈপ্লবিক অবস্থান্তর এতদিন ঘটতে পায় নি, আজ এই যুদ্ধের বিপর্য্যয়ের মধ্যে এ দেশে সেই অবস্থা দ্রুতগতিতে ঘটে চলেছে। গৃহহীন নরনারীর

দল চলেছে তাদের সামান্য তৈজসপত্র মাথায় ক'রে, গরু ছাগল সঙ্গে নিয়ে; পথের মধ্যে কারখানার মালিক তাদের দেখে গাড়ী থামিয়ে টাকা দিলেন—মনোরম আশ্রয় দেবার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গেলেন আপনার কারখানার গণ্ডীর মধ্যে; তাঁর শ্রমিক সমস্যার সমাধান হ'ল। কারখানায় আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ম্যানেজার, সরকার—তারা কাজ আদায় করবে; কাজ না করতে পারলেও পালাবার পথ নাই। বাগানের ফটকে আছে—গুর্খা পাহারা, তার কোমরবন্ধে ঝুলছে কুকরী, হাতে আছে বন্দুক। গৃহহারা হতভাগ্য দলটির কর্ত্তা বৃদ্ধটির সেই দন্তহীন মুখের ঠোঁট দুটি অবরুদ্ধ ভীত কান্নায় থরথর ক'রে কাঁপবে, চোখ হতে দুটি বিশীর্ণ জলধারা গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে, মুক্তির জন্য ডাকবে বিধাতাকে।

সেই সুশ্রী তরুণীটি! তার কথা লিখতে গিয়ে কানাইয়ের বার বার মনে হয়েছে গীতার কথা। অমলবাবুর কারখানায় বন্দিনী ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়ে সে শিউরে উঠেছে।

তারপর সে ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের সে আমলের কথা উল্লেখ করেছে।—

"Terrible cruelty characterised much of the development of industrial capitalism, both on the Continent and in England. The birth of modern industry is heralded by great slaughter of the innocents."

কুটীরবাসীদের দলে দলে সংগ্রহ ক'রে পাঠানো হ'ত কল-কারখানায়। প্রলোভনে ভুলিয়ে, কৌশলে বাধ্য ক'রে, এ দেশেও এককালে চা-বাগানে কুলি চালান হ'ত। চা-বাগানের কুলিদের বহু দুর্দ্দশার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপে সেকালে এই অত্যাচার হয়েছিল।—

"As Lancashire was thinly populated and a great numder of hands were suddenly wanted, tuousands of hapless creatures were sent down to the north from London, Birmingham and other towns."

তারপর সে আরও আলোচনা করেছে—চড়া বাজার এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টা-জড়িত কলকারখানায় প্রচুর অর্থাগমের ফলে কেমন ক'রে দলে দলে মানুষ ছুটে যেতে বাধ্য হয়েছে ওই অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে—সেই সব কথা।

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। সম্পাদক রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

—হ্যালো! কে? বিজয়বাবু?

বিজয়দা টেলিফোন করছেন এডিটোরিয়েল ডিপার্টমেণ্ট থেকে। এডিটোরিয়েল ডিপার্টমেণ্টে রবিবারে বিজয়দাই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

অর্থনৈতিক আলোচনা-বিভাগের সম্পাদক বললেন—লোক? আমার এখানে তো কেউ নেই। আজ ডিউটি ছিল নবেন্দুর। তার শুনেছি জ্বর হয়েছে, আসে নি সে।

—আমি? না, সন্ধ্যেবেলায় আমি ফ্রী নই। জরুরী কাজ আছে আমার।

—এখানে? এখানে আছেন নতুন ভদ্রলোক—কানাইবাবু। রাত্রে তো তাঁর ডিউটি।

—তাই নাকি? কানাইবাবু আপনার নিজের লোক? আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁকে।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে সম্পাদক হেসে বললেন—বিজয়বাবু আপনার আত্মীয়?

মৃদু হেসে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই কানাই বললে—পরমাত্মীয়। আমার সহোদরের চেয়েও বেশী।

—আপনার লেখার মধ্যেও বিজয়বাবুর ইন্‌ফ্লুয়েন্স রয়েছে।

কানাই কোন উত্তর দিলে না। সম্পাদক বললেন—বিজয়বাবু আপনাকে ডেকেছেন। প্রুফটা দেখা হয়ে গেলে আপনি ওপরে যান। নিন, তাড়াতাড়ি নিন।

প্রুফ শেষ ক'রে কানাই উপরে তেতলায় গিয়ে বিজয়দার ঘরে ঢুকল। সস্নেহে সম্ভাষণ ক'রে বিজয়দা বললেন—আয়। প্রুফ দেখা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

হেসে বিজয়দা বললেন—কানাই কানাইচন্দ্র একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কানাই চুপ ক'রে রইল। বিজয়দা আবার বললেন—ওটার ইংরেজী ক'রে একটা ইংরেজী দৈনিকে দিয়ে দি, ভাল হয়েছে লেখাটা, কিছু পেয়েও যাবি।

কানাই বললে—একটা কাগজে প্রকাশিত হয়ে গেল, তার ট্রান্‌স্লেশন ছাপবে অন্য কাগজ?

বিজয়দা হাসলেন—ট্রান্‌স্লেশন ব'লে কে আর ছাপা হবে? সে আমি ঠিক ক'রে দেব। আরও একটু হেসে বললেন—জার্নালিসমের প্রথম ও প্রধান ট্যাক্‌টিক্‌স্—এক মুর্গী পাঁচ দরগায় জবাই দেওয়ার কৌশল। সে আমি তোকে তিন দিনে তালিম দিয়ে দেব। দ্বিতীয় ট্যাক্‌টিক্‌স হ'ল—পরের প্রবন্ধ এমন কৌশলে আত্মসাৎ করতে হবে যে, যেন মূল লেখক আইডেন্টিফাই পর্য্যন্ত করতে না পারে এবং তার চেয়ে অনেক বেশী ঝাঁঝালো হয়। থার্ড ট্যাক্‌টিক্‌স্ হ'ল প্রতিবাদে গাল দেওয়া—একেবারে রাম-গালাগাল। আর বাংলাতে যখন প্রবন্ধ লিখবি, তখন মহাকাল-টহাকাল একটু লাগিয়ে দিবি। তাণ্ডবনৃত্য, দিগ্‌বসনা, লোলজিহ্বা—এইরকম কতকগুলো কথা ব্যবহার করা অভ্যেস ক'রে ফেল্।

কানাই হেসে ফেললে। তারপর বললে—ডেকেছ কেন?

—ওই দেখ্! আসল কথাই বলি নি। একটা কাজ করতে হবে একটু বাড়তি কাজ ক'রে আয়। থিয়েটার দেখে আয় আজ।

—থিয়েটার? কানাই বিস্মিত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। 'সংঘর্ষ' নাটকের আজ শততম অভিনয় হচ্ছে। নাট্যকার আমার বন্ধু। বিশেষ অনুরোধ ক'রে কার্ড পাঠিয়েছে। আমার সময় হবে না, তুই যা।

—থিয়েটার সিনেমা আমি দেখি না বিজয়দা। তা'ছাড়া তোমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তুমি তাঁর বন্ধু—

বাধা দিয়ে বিজয়দা হেসে বললেন—বন্ধু হয়তো বটে, কিন্তু ও অজুহাতটা এক্ষেত্রে বাজে। অনেক ঘনিষ্ঠতর বন্ধুকে সে হয়তো নেমন্তন্নই করে নি। সে নেমন্তন্ন করেছে বাংলার সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদককে—যাতে এই শততম অভিনয়ের একটা বিশেষ বিবরণের মধ্য দিয়ে তার প্রতিভার যশোগান দৈনিক পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হয়। আমি যেতে পারছি না, কাজেই তোকে যেতে হবে কাগজের রিপোর্টার হয়ে। আজ আর কেউ নেই। তুই যা।

কানাই বিনাবাক্যব্যয়েই কার্ডখানি গ্রহণ করলে।

বিজয়দা বললেন—সন্ধ্যে ছ'টায় আরম্ভ। কিছু খেয়ে নে বরং। বিজয়দা ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারাকে বললেন—চা আর টোস্ট দুখানা।

থিয়েটার-সিনেমার প্রতি কোন আকর্ষণ কানাইয়ের ছিল না। তার বাল্যকালে তার বাপের কিছু অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তখন সে থিয়েটার দেখেছে। তখনও থিয়েটার দেখার রেওয়াজটা—বাদামের শরবতের মত কোন রকমে বজায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার মতই থিয়েটারের ওপরেও তার বিতৃষ্ণা জ'ন্মে গেছে। তারপর তার উপলব্ধির সঙ্গে শিক্ষার বিচারশক্তি

যুক্ত হয়ে যে রুচি তার গ'ড়ে উঠেছে, শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তার হয়েছে, তাতে বর্ত্তমান থিয়েটার ও সিনেমার অবস্থার কথা ভাবলেই তার চিত্ত পীড়িত হয়ে ওঠে। তা' ছাড়া বর্ত্তমানে এই কঠিনতম দুর্দ্দিনে প্রমোদ-বিলাসের কল্পনাতেও তার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। সিনেমার গৃহগুলির সম্মুখে সে যখন বিচিত্র বেশভূষার বিলাস-সমারোহ দেখে, তখনই তার মনে পড়ে তাদের বাড়ীর সামনের বস্তীর কথা। কল্পনাতীত দারিদ্র্য, নিপীড়িত মনুষ্যত্ব, পৃথিবীর বুকে জীবনধারার একাংশের চরমতম শোচনীয় পরিণতি। অন্য দিকে মানুষ মরছে বিলাসের বিষে; এক দিকে মানুষ কেঁদে মরছে, অন্য দিকে মরছে—হেসে নেচে। বিশেষ ক'রে মনে পড়ল গীতাদের বাড়ীর কথা।

আজ তবু চাকরীর কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য তাকে সেই থিয়েটার দেখতেই আসতে হয়েছে।

সমারোহ—সত্যই সমারোহ।

প্রবেশপথে ছাদের ওপর নহবৎ বাজছে। দরজায় গাঢ় লাল রঙের ভেলভেটের পর্দ্দা ঝুলছে। দু'পাশে দু'টি পূর্ণঘটের মাথায় আমের পল্লব—পল্লবের উপর সশীষ ডাব। সামনের করিডরের চারি পাশের থামগুলি রঙীন কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের দরজাগুলিতে ঝুলছে নেটের পর্দ্দা। বক্স-অফিসের সামনে জনতার মত ভিড় জ'মে গেছে। সুসজ্জিত নরনারীর মেলা, প্রমোদ-বিলাসের হাট!

এত বড় পত্রিকার প্রতিনিধি—ভদ্রতার সঙ্গেই তার জন্যে ভাল আসন নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে বক্স-অফিসে। পাশেই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁটায় তিলধারণের জায়গা নেই, ছোকরা চাকরগুলো চরকির মত ঘুরছে। বড় বড় ট্রের ওপর মাটির ভাঁড়, কেক, বিস্কুট এবং হাতে প্রকাণ্ড বড় কেৎলীতে তৈরী চা নিয়ে ভেতরে হাঁকছে—চা কেক—বিস্কুট, পোটাটো চিপ্‌স, সল্টেড বাদাম।

ভেতরেও চারিদিক রঙীন কাপড় দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে ফুলের রিং ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখভাগটা বিচিত্র বর্ণের রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো।

একজন ভদ্রলোক কানাইকে প্রশ্ন করলে—আপনি কি সার্ 'স্বাধীনতা' কাগজের লোক?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোকটি বেশ বিনয় প্রকাশ ক'রেই বললে—তা হ'লে সার্ আপনি আসুন,—মিটিংএর সময় ষ্টেজের ওপর আপনাদের সিট।

ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে সে আবার বললে—বেশ ক'রে ঠেসে এক কলম ঝেড়ে দেবেন সার্!

কানাই হাসল। রঙ্গমঞ্চের ভিতর স্টেজের উপরেই সম্ভ্রান্ত অতিথিরা বসেছেন। তারি মধ্যে সেও বসল। ধীরে ধীরে যবনিকা অপসারিত হ'ল। সম্মুখে প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। স্টেজের উজ্জ্বল আলো সামনের দিকে দামী আসনগুলিতে উপবিষ্ট দর্শকদের মুখের উপর পড়েছে। সম্ভ্রান্ত অতিথি এবং ধনী দর্শকদের দল। সহসা তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তুজন ইউরোপীয় সৈনিকের দিকে। মনটা তার খুশী হ'ল। এরা ভারতবর্ষকে জানতে চায়। তার পাশে ও কে? নেপী? নেপীর পাশে—নীলা—হ্যাঁ, নীলাই তো!

নীলা তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টির সঙ্গে নীলার দৃষ্টি মিলিত হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সৈনিকদের একজন মধ্যস্থ নেপীর সম্মুখে ঝুঁকে —বোধ হয় নীলাকেই কিছু জিজ্ঞাসা করলে। ওই যে, নীলাও মুখ ফিরিয়ে তাকে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কানাইয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ঐ বিদেশী সৈনিকদের সঙ্গে নীলা থিয়েটার দেখতে এসেছে! সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

(সতের)

সভাপতি দেশপ্রেমিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নাটকখানির সাফল্যে নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চের সকলকে অভিনন্দিত ক'রে সর্ব্বশেষে বললেন—"আজ পৃথিবীর উপর মহা দুর্য্যোগ আসন্ন। সেই দুর্য্যোগ আজ বাংলার ওপরেও ঘনীভূত হয়ে এসেছে। মানুষের জীবনই শুধু বিপন্ন নয়—যুগযুগান্তর ধ'রে মানুষের সাধনার সকল ফল, সকল সম্পদও আজ বিপন্ন। আজ সাহিত্যিক এবং শিল্পীর কর্ত্তব্য গুরুভার হয়ে মহান্ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। মানুষকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারা যাতে বহন করতে পারে, সেই শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে সাহিত্য এবং নাট্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে। বর্ত্তমান বাংলার নাটক এবং অভিনয়-শিল্পের গতি ও প্রকৃতি খুব আশাপ্রদ ব'লে যদি আমি স্বীকার ক'রে নিতে না পারি, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, সে নিয়ে আলোচনাও আজ করছি না; শুধু অনুরোধ করছি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীবৃন্দ অবহিত হোন।—দুর্য্যোগের পর নবপ্রভাত আসবে। সেই প্রভাতে মুক্ত স্বাধীন সবল জাতির আগমনী আপনারা রচনা করুন। মঙ্গল হোক আপনাদের।" নিমন্ত্রিত অতিথিদের সকলে এবং দর্শকবৃন্দ সাধুবাদ এবং করতালি দিয়ে তাঁর কথা সাগ্রহে সমর্থন করলেন। সভা ভঙ্গ হ'ল। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে নেমে এসে দর্শকদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করবার জন্য উঠলেন—যবনিকা আবার নেমে এল। কানাই ঈষৎ চকিত হয়েই সকলের সঙ্গে উঠে পড়ল। সম্পূর্ণরূপে না হ'লেও, খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তিক্তচিত্তে সে ভাবছিল নাট্যকার-টির কথা। লোকটা যেন আজ কৃতার্থ হয়ে গেছে। একান্তভাবে না হ'লেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সে ব'সে ছিল অবজ্ঞাতের মত। তার গলায় মালা দেওয়া হ'ল সর্ব্বশেষে। নাট্য-পরিচালক ও প্রধান

অভিনেতাকে মালা দেওয়া হ'ল তার আগে। সভাপতি ছাড়া অন্য বক্তারা—বিশেষ ক'রে, সেকালের একজন অধ্যাপক এবং নাট্যকার বক্তৃতায় নাট্যকারকে উপেক্ষা ক'রেই নির্লজ্জভাবে স্তাবকতা করলেন প্রধান অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালকের। সবচেয়ে সে পীড়িত হ'ল—উপহারের নামে—পুরস্কার-গ্রহণোদ্যত নাট্যকারের হস্তপ্রসারণের ভঙ্গীর মধ্যে কাঙালপনার সুস্পষ্টতা দেখে। তার ছেলেবেলায় শোনা বাংলার একটি বহুপ্রচারিত গল্পের কথা মনে প'ড়ে গেল—"নাকের বদলে নরুন পেলাম, তাক্ ডুমা-ডুম্ ডুম।" নাটাকার হিসেবে ভদ্রলোক কালিদাস সেক্সপীয়র বার্নার্ড শ'য়ের জ্ঞাতি। তার মনে পড়ল, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বড়লোক আত্মীয়কুটুম্বের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে সমাগত তাদের গরীব আত্মীয় জ্ঞাতিদের অবস্থা। তাদের কাঙালপনার এবং এদেশের নাট্যকারদের কাঙালপনায় কোন প্রভেদ সে দেখতে পেলে না। এদেশে নাট্য-সমারোহের আসরে নাট্যকারেরা গৌণ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—সে ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের আলোচনায় একখানা বইয়ে পড়েছিল—

"If writers have still a great deal to learn from the theatre as regards technique, the dramatists are of greater importance to the actors and managers to understand problem.

হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য নাট্যকার! শুধু নাট্যকারকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি? কোন্‌খানেই বা দেশের ভাগ্য এতটুকু প্রসন্ন, এতটুকু উজ্জ্বল, এতটুকু উঁচু? আপনা থেকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল নীলার উপর। এদেশের সবচেয়ে মন্দভাগ্য এই যে, দেশের মেয়েদের আজ ভবিষ্যৎ নেই। ভাবী মায়েদের নীড়ের ভরসা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—যে নীড়ের আশ্রয়ের মধ্যে প্রসূত হবে, গঠিত হবে ভবিষ্যৎ জাতি।

বাঙালীর কালো মেয়ে আজ তার অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কূলকিনারা না পেয়ে আকাশকুসুম কল্পনা ক'রে বিদেশী সৈনিকের পাশে ওই তো ব'সে রয়েছে কাঙালিনীর মত। নীলার ওপর তার অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। এত অন্তঃসারশূন্য! নীলা কি ভাবে, যুদ্ধশেষে ওই শ্বেতাঙ্গটি তার মত কালো মেয়েকে নিয়ে যাবে তার স্বদেশে—শ্বেতাঙ্গদের সমাজে? তিক্ত, তীব্র শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

ওদিকে যবনিকা অপসারিত হয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছিল; প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল মুগ্ধ সাধুবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; নাটকখানি সত্যই ভাল এবং অভিনয়ও সুন্দর হয়েছে। কানাইয়ের কিন্তু খুব ভাল লাগছিল না। ওই তিক্ত চিন্তাই শুধু তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছে।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়ল। চায়ের দোকানের ছেলেগুলোর চীৎকারে দর্শকদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনার গুঞ্জনে স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ কলরব-মুখর হয়ে উঠল! একটা ছেলে চায়ের ট্রে নিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—চা গ্রোম—হট্-টী—চপ কাটলেট—পটাটো চিপ্‌স! কানাই সবিস্ময়ে তারই দিকে চেয়ে ছিল। হীরেন! গীতার ভাই হীরেন এখানে চা বিক্রী করছে!

—কানুদা! এক পাশ থেকে কে ডাকলে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে—নেপী তাকে ডাকছে।

কানাইয়ের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হতেই মিষ্ট হাসি হেসে নেপী আমরাও এসেছি কানুদা।

কানাই বললে—দেখেছি। কিন্তু ও টমি দুজনকে পাকড়াও কি ক'রে?

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়তেই তার ইচ্ছে হ'ল, সে নিজে উঠে গিয়ে কানাইকে নমস্কার জানিয়ে সবিনয়ে কয়েকটা কথা ব'লে তার এই দাম্ভিকতার জবাব দিয়ে আসে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কানাই উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নেপী বললে—কানুদা চ'লে গেলেন।

নীলা কোন উত্তরই দিলে না; অবজ্ঞা করবার প্রয়াসেই সে অন্যমনস্কের মত ব'সে রইল। নেপীই বললে—বইখানা কানুদার ভাল লাগে নি। আমি বললাম—বইখানা বেশ ভাল হয়েছে, না কানুদা? হেসে বললেন—জানি না।

নীলার অন্তর যেন জ্বালা ক'রে উঠল। এমনভাবে নেপীকে তাচ্ছিল্য করে কানাই কিসের অহঙ্কারে? কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে উঠে পড়ল —হেসে জেমস্ এবং হেরল্ডকে বললে—আমি আসছি—পাঁচ মিনিট। ব'লেই সে বেরিয়ে এল করিডরে।

কানাই দাঁড়িয়ে ছিল থিয়েটারের সংলগ্ন রেস্তোরাঁটার সামনে। সে যেন কারও জন্যে প্রতীক্ষা ক'রেই রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চা-খাবারের একটা শূন্য ট্রে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁর একটি ছেলে চাকর। হীরেনের জন্যেই কানাই প্রতীক্ষা ক'রে ছিল। অতি-মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে হীরেন কানাইকে লক্ষ্য না ক'রেই চ'লে যাচ্ছিল—পাঁচখানা কাটলেট—চারটে চপ—জলদি।

কানাই তার হাত ধ'রে আকর্ষণ ক'রে ডাকলে—হীরেন!

হীরেন চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কানাইদা। সে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। পর-মুহূর্ত্তেই তার চোখ দুটো জ্ব'লে উঠল হিংস্র বন্য পশুর মত। হাতের শূন্য ট্রেখানা সে ফেলে দিলে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে পকেটে হাত পুরে একটা চাকু বের ক'রে দাঁত দিয়ে খুলে লাফিয়ে পড়ল কানাইয়ের উপর।

ব্যাপারটা ঘ'টে গেল যেন চকিতের মধ্যে। নীলা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠনালী দিয়ে স্বর পর্য্যন্ত বের হ'ল না। করিডরে অন্য যারা উপস্থিত ছিল, তারা হাঁ—হাঁ ক'রে উঠল। হীরেনের চাকু খোলা দেখেই কানাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল—সে হীরেনের হাত ধ'রে ফেলতে চেষ্টা করলে—ধরলেও, তবুও তার বাঁ হাতে কজার উপরে একপাশে ছুরির আঘাত লাগল। সস্নেহ স্বরেই সে বললে—হীরেন—হীরেন! শোন—শোন!

হীরেন কিন্তু শুনলে না, একটা দুর্দান্ত ঝটকায় আপনার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে থিয়েটার থেকে ছুটে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। কানাইও তার অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে এল—হীরেন! হীরেন!

পিছন থেকে লোকজনে তাকে বারণ করছিল—যাবেন না—যাবেন না।

তার মধ্য থেকে কানে এসে পৌঁছল নীলার উদ্বিগ্ন আহ্বান—কানাইবাবু! কানাইবাবু!

নীলার সঙ্গে প্রায় কণ্ঠ মিলিয়েই নেপীর কণ্ঠস্বরও এল—কানুদা! কানুদা!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত শহরটার অন্তরাত্মা যেন মর্ম্মান্তিক আতঙ্কে ভয়ার্ত্ত-স্বরে চন্দ্রালোকিত শীতের কুহেলি-রহস্যঘন আকাশ পরিপূর্ণ ক'রে তুলে অকস্মাৎ কেঁদে উঠল—উঁ—, উঁ—, উঁ—!

সাইরেন! সাইরেন বাজছে! কানাই থমকে দাঁড়াল। নেপী এসে তার হাত ধ'রে বললে—যাবেন না। ফিরে আসুন।

কানাইয়ের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা উত্তেজনা ব'য়ে যাচ্ছে। সাইরেন বাজছে। সে তবু প্রশ্ন করলে—সাইরেন, না নেপী?

—হ্যাঁ। ফিরে আসুন।

—চল।

—কিন্তু ও ছেলেটা কে কানুদা?

—গীতাকে দেখেছিস তো? গীতার ভাই।

গীতাকে নেপী দেখেছে, সামান্য পরিচয়ও হয়েছে সেদিন। আবছা সে শুনেছে—গীতাকে নাকি খুব একটা বিপদ থেকে কানাইদা উদ্ধার ক'রে এনেছে।

ফিরে আসতেই নীলা অসঙ্কোচে তার হাতখানা ধ'রে বললে—খুব বেশী কেটেছে?

কানু হাতখানা প্রসারিত ক'রে দেখালে এবং নিজেও প্রথম দেখলে, হেসে বললে—সামান্য কেটে গেছে।

পিছনে উৎকণ্ঠিত দর্শকদের মৃদু গুঞ্জন। সাইরেন এখনও একটা অশুভ ক্রন্দনকাতর সুরে থেমে থেমে বাজছে।

কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে জেম্‌স্‌ এবং হেরল্ডও বাইরে এসেছে। তাদের সাদা মুখ উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাসে ভ'রে উঠেছে।

জেম্‌স্‌ এবং হেরল্ড করিডরের বসবার আসনে নীলাকে বসতে অনুরোধ জানালে। কানাইও বললে—বসুন আপনি।

নীলা উদ্বিগ্ন হয়েই বললে—হাতটা কিন্তু ধুয়ে ফেলা উচিত আপনার।

কানাই সংক্ষেপে উত্তর দিলে—থাক্‌। কিছু নয় ও। ওর চেয়ে বড় বিপদ মাথার উপর মিস্‌ সেন। এখন গরম জল টিঞ্চার আয়োডিন কিছুই পাওয়া সম্ভবপর নয়। আর উতলা হবার মত নয়ও কিছু।

ব্যাপারটার সমস্ত গুরুত্ব সাইরেন-ধ্বনির উদ্বেগ-আতঙ্কের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেছে। সামনে একটা বেঞ্চের উপর কয়েকজন মহিলা ব'সে আছেন। তাঁদের একজন কাঁপছেন। একটি মেয়ের মুখ বিবর্ণ, সে যেন মাটির পুতুলের মত ব'সে আছে। একজন প্রৌঢ়া বোধ হয়

ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। একগাছি মালা ও একখানা নতুন শাল কোলে নিয়ে ব'সে আছে একটি মেয়ে। শালখানা আজই গ্রন্থকারকে উপহার দেওয়া হয়েছে; মেয়েটি বোধ হয় গ্রন্থকারেরই কোন আত্মীয়া। পুরুষ যাঁরা বাইরে এসেছেন, তাঁরাও স্তব্ধ। ভিতরে এখনও অভিনয় চলছে।

হঠাৎ নীলা নেপীকে একটু ওপাশে ডাকলে— শোন্।

আড়ালে এসে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে—কানাইবাবু ছেলেটাকে চেনেন মনে হ'ল, ও কে তুই জানিস্ নেপী?

—ও হ'ল গীতার ভাই।

—গীতার ভাই! গীতা কে?

—ও, তুমি জান না বুঝি? গীতা একটি মেয়ে। কানাইদা তাকে কি বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন—বিজয়দার ওখানে রেখেছেন।

—উদ্ধার ক'রে এনেছেন? বিজয়দার ওখানে রেখেছেন?

—হ্যাঁ। কানাইদাও যে এখন বিজয়দার ওখানে থাকেন। নিজেদের বাড়ী থেকে উনি চ'লে এসেছেন।

—চ'লে এসেছেন?

—হ্যাঁ। সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন বাড়ীর সঙ্গে।

—ওই গীতা মেয়েটির জন্যে?

নেপী তার দিদির মুখের দিকে তাকাল এবার। বললে—তা তো জানি না। একটু পরেই সে আবার প্রশ্ন করলে—তুমি কি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ?

নীলা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে নেপীর দিকে চেয়ে বললে—কেন? নার্ভাস কি জন্যে হতে যাব? তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ বহুলোকের পদধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহের

দরজা খুলে গেছে। অভিনয় শেষ হ'ল, দর্শকেরা বেরিয়ে আসছে। করিডর উৎকণ্ঠিত জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কানাই দাঁড়িয়ে ছিল—একেবারে বাইরের ফটকের মুখেই। জনশূন্য চন্দ্রালোকিত রাজপথ। ঊর্দ্ধলোকে কুয়াসার মত হিমবাষ্প জ'মে রয়েছে, তার উপর পড়েছে শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। রাজপথের দুই পাশে সারি সারি রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সী, মোটর—আলো নেই, চন্দ্রালোকের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

একখানা পুলিসের লরী চ'লে গেল।

ছুটি মহিলা সঙ্গে ক'রে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন—পিছনের হিতৈষীকে বলছিলেন—আমাদের মোটর আছে, আমরা চ'লে যাব।

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের কেউ বললেন—গাড়ী চলবার হুকুম নেই। যাবেন না।

ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ল একদল উৎকণ্ঠিত দর্শক। এরই মধ্যে তারা বেরিয়ে যাবে গলিপথে।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এ. আর. পি-র হুইস্‌ল বেজে উঠল। খাকী পোশাকপরা লোহার হেল্‌মেট মাথায় এ. আর. পি. এবং পুলিস পথরোধ ক'রে দাঁড়াল।

কানাই ভাবছিল। জেম্‌স্ এবং হেরল্ডের দিকে তাকিয়েই সে ভাবছিল। আজ হয়তো সত্যই বাংলার জ্যোৎস্না-পুলকিত আকাশে হিংস্র নৈশ অভিযানে এসেছে জাপানী বমারের দল। তাদের বিতাড়িত করতে যারা ধাওয়া করবে—আকাশযুদ্ধে মেতে উঠবে, তারা ওই জেম্‌স্-হেরল্ডের জাতি। আত্মরক্ষা করবার অধিকারও এ হতভাগ্য দেশের মানুষের নাই। অথচ আজ এ কাজ করার কথা—এ কাজ করার অধিকার—তার, তাদের—এই এত বড় দেশ—চল্লিশ কোটি মানুষের বাসভূমি ভারতের লক্ষ লক্ষ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান যুবকবৃন্দের।

তার মনে পড়ল লণ্ডন টিউব স্টেশনের আশ্রয়ে ব'সে এক ইংরেজ বৃদ্ধা বলেছিল—

"This night our lads are giving the Nazis a hot chase."

কথাটা মনে ক'রে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আজ তা হ'লে তার পরিধানে থাকত জেম্‌স্ হেরল্ডের মত পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদ। তার সে পরিচ্ছদের উপর আঁকা থাকত—বিমান-বিভাগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ওই ওদেরই মত উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাসে তার মুখ থম-থম করত। সে মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা বিস্মিত হয়ে যেত। 'অল ক্লিয়ার' সঙ্কেত-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদু একটু হাসি হেসে সে নীলার হাত চেপে ধ'রে বলত—চললাম আমি। কোথায়?—সে প্রশ্ন নীলার কম্পিত অধর দুটিতে আটকে যেত; কানাই নিজেই বলত To give them a hot chase; নাগাল না পাই, এখান থেকে যাব সীমান্তের এরোড্রোমে, সেখান থেকে আবার নতুন প্লেন নিয়ে যাব ওদের এলাকায় শোধ দিয়ে আসব, এর শোধ দিয়ে আসব।

নীলার মুখ আকাশের নীলাভ তারার মত জ্বলজ্বল ক'রে উঠত—সঙ্গে সঙ্গে জল টলমল করত তার দুটি চোখে।

নীলা আবার যেন অনেকটা অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—গীতাকে দেখেছিস্ তুই নেপী?

নীলার পূর্ববর্তী উত্তরে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে নেপী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তার দিদির এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে সে ভয় পায়। এই কণ্ঠস্বরে নীলা কথা কয় কদাচিৎ, কিন্তু যখন কয়, তখন তাদের বাড়ীর সকলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে; সে নীলা আর-এক নীলা, কালো মেয়েটি তখন হয়ে ওঠে বিদ্যুৎশিখার মত জ্বালাময়ী। তাই নেপী শঙ্কিত ভাবেই বোকার মত একটু হেসে বললে—দেখেছি। বড় ভাল মেয়ে দিদি।

নীলা নেপীর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পর-মুহূর্তে অন্য দিকে চেয়ে ব'সে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল ব্যঙ্গবক্র ধারালো একটু হাসি। 'বড় ভাল মেয়ে', শান্তশিষ্ট! বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে নিজের বাড়ী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন! তার ভাই বোনের উদ্ধারকারীকে ছুরি মারতে চায়! চমৎকার!

—মেয়েটি কি বিপদে পড়েছিল রে?

একটু ভেবে মনে মনে অনুমান ক'রে নিয়েই নেপী বললে—খুব সম্ভব একটা বুড়োর সঙ্গে ওর বাপ-মা টাকার লোভে—

—বিয়ে দিচ্ছিল। নেপীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীলা কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে দিলে। বাংলা দেশের চরমতম রোমান্স।

হঠাৎ শব্দ উঠল—ড়ুম ড়ুম! কয়েকটা দূরাগত বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত জনতার গুঞ্জন, গবেষণা, হাসি, রসিকতা, কলরব মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। নীলাও সচকিত হয়ে উঠল। নেপীও নীরবে তার মুখের দিকে চাইল। জেম্‌স্ হেরল্ড নীলার কাছে এসে দাঁড়াল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীলা তাদেরই মুখের দিকে চাইলে—ও কিসের শব্দ?

জেম্‌স্ বললে—মনে হচ্ছে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট থেকে গুলী ছোঁড়া হচ্ছে।

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর জনতাও আবার মুখর হয়ে উঠল।

—পালে বাঘ পড়ল না কি?

—শব্দ শুনছ না?

—দুর। ও বোধ হয় স্টেজের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। এই কখনও বোমার শব্দ হয়?

কানাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোমা? বিশ্বাস করতে পারছে না সে। সাইরেন বেজেছে, বোমা পড়ার সম্ভাবনায় কোন বাধাই নেই, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজের যে ভয়ঙ্করত্ব মনের কল্পনায় আছে—

আওয়াজের সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। বহু মাইল ব্যাপ্ত ক'রে মাটির মধ্যে ব'য়ে যাবে কম্পনের প্রবাহ। কিন্তু মাটি তো কাঁপছে না! বায়ুস্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ডতম বেগবান ঘূর্ণাবর্তের, যার টানে বড় বড় বাড়ী তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। কই, তার ক্ষীণতম স্পর্শের আভাসও তো পাওয়া যাচ্ছে না! সমস্ত জনতাই উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে মিলিয়ে দেখছে। অশান্ত অস্থির পদক্ষেপে ওইটুকু স্থানের মধ্যেই ঘুরছে।

আবার কয়েকটা শব্দ হ'ল।

জনতার উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বাইরের রাজপথে এ-আর-পির হুইস্‌ল বাজছে।

চায়ের স্টলে ভিড়ের অন্ত নেই। কিন্তু কোলাহল নেই। লোকে নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। একজন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন— পেটে ছুরি মারলে ম'রে যাবে, নইলে শালার পেটের আজ নিকেশ ক'রে দিতাম। শালা—এমন বেহায়া ছোটলোক আর হয় না রে বাবা! চায়ের স্টলওয়ালার মুখ পরিতৃপ্তির হাসিতে ভ'রে উঠেছে। এমন বিক্রী তার দোকানের ইতিহাসে নতুন।

অকস্মাৎ একজন চীৎকার ক'রে উঠল—আমি যাবই—আমি যাবই।

বন্ধুরা তার তাকে ধ'রে রেখেছে।—না—পাগল নাকি ?

পাগলের মতই ; দুরন্ত ঝটকায় আপনাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল—রোগা ছেলে আমার। ভয়ে হয়তো···। কথা তার শেষ হ'ল না, সে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল।

রকেটের মত কি আকাশে মধ্যে মধ্যে উঠছে—ফাটছে, ফুলঝুরির মত ঝরেছে।

জেম্‌স্ বললে—Air raid still going on.

নীলা কোন উত্তর দিলে না। স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল সে। নেপী

শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কানাই এতক্ষণে কাছে এসে মৃদু হেসে বললে—ব'সে আছেন ?

নীলা উত্তর দিলে না।

আবার হেসে কানাই বললে—একটা নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্য।

নীলার মুখে আবার একটু ব্যঙ্গবক্র হাসি ফুটে উঠল।

আবার সাইরেন বেজে উঠল। দীর্ঘ একটানা সুরে আশ্বাসের স্বত-উচ্চারিত ধ্বনির মত মোক্ষধ্বনি বাজছে। 'অল ক্লীয়ার'! বিপদ কেটে গেছে, আকাশচারী হিংস্র মৃত্যুগর্ভ শত্রু-বমারের দল চ'লে গেছে।

কানাই ঘড়ি দেখলে—বারোটা পনেরো। সাইরেন বেজেছিল, দশটা সতেরো মিনিটে।

চারিদিকে কলরব উঠে গেল, আশ্বাসের—উল্লাসের কলরব—অল ক্লীয়ার। নিরাপদ। বেঁচেছি—আমরা বেঁচেছি। হিংস্র লোভী মানুষের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবর্ষী আক্রমণ থেকে বেঁচেছি! বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত ছুটল জলস্রোত।

নীলা নেপীর হাত ধ'রে উঠে দাঁড়াল।

জেম্‌স্ এবং হেরল্ড এতক্ষণে বললে—ভগবানকে ধন্যবাদ! আমরা কিন্তু আপনার কাছে মার্জ্জনা চাইছি মিস্ সেন—আমাদের জন্যেই আজ এই দুঃসময়ে বাড়ী হতে দূরে থেকে অনেক বেশী উদ্বেগ ভোগ করতে হ'ল আপনাকে।

নীলা পাণ্ডুর মুখে একটু হেসে বললে—ও কথা বলবেন না। আপনারা আমারই নিমন্ত্রিত অতিথি। এইবার কিন্তু আমি বিদায় চাইব।

—সে কি! চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব আমরা।

—দরকার নেই। অনুগ্রহ ক'রে আপনাদের অসুবিধে বাড়িয়ে

তুলবেন না। আমার বাড়ী এখান থেকে পাঁচ সাত মিনিটের পথ। নেপী আমার সঙ্গে রয়েছে। কথাগুলির মধ্যে ভদ্রতার অভাব ছিল না, কিন্তু তবু তার মধ্যে অনিচ্ছা বা এমন কিছু ছিল—যেটাকে লঙ্ঘন করা বিদেশীয়দের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে তারা চ'লে গেল।

রিক্শা ছুটছে, ঘোড়ার গাড়ী ছুটছে, ট্যাক্সী মোটর ছুটছে। মানুষ দর দাম করছে না। গাড়ীতে চ'ড়ে ব'সেই বলছে—চলো।

অনেকে হেঁটে চলেছে। ছোট ছেলে বুকে নিয়ে বাপ হাঁটছে, মায়ের কোলে সবচেয়ে ছোটটি, অপেক্ষাকৃত বড়গুলি শীতে হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে।

অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ট্রামের জন্যে। ট্রাম আসবে। যে ট্রামগুলো পথে আটকে আছে, সেগুলো ফিরবে।

কানাইকে ফিরে যেতে হবে আপিসে। কিন্তু তার আগে নীলা আর নেপীকে পৌঁছে দিতে হবে। জেম্স্ এবং হেরল্ড চ'লে যেতে সে লক্ষ্য করেছে। কানাই এগিয়ে এল।

নীলা বললে—নেপী, আয়।

কানাই ডাকলে—দাঁড়ান। আমি যাব। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে—

নীলা এবার ঘুরে দাঁড়াল, জ্যোৎস্নার আলোতেও দেখা গেল তার মুখে সেই ব্যঙ্গবক্র ক্ষুরধার হাসি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে কথার সঙ্গে হাসির আমেজ মিলিয়ে সে বললে—ভয় নেই কানাইবাবু, আমাদের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা নেই। উদ্ধার করার প্রয়োজন হবে না। আপনি চ'লে যান যেখানে যাবেন।

কানাইয়ের মনে হ'ল, নীলার ওই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন চাবুকের মত তার মর্ম্মস্থলকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে। একটা কঠিন উত্তর তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, কিন্তু সে পর-মুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করলে।

একটু মৃদু হেসে ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে বললে—নমস্কার, তা হ'লে আসি

(আঠারো)

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর ভোরবেলায় কানাই আপিস থেকে বাসায় ফিরছিল। গত রাত্রের 'সাইরেন' অমূলক আশঙ্কার সাইরেন নয়। জাপানী বমার প্লেন এসেছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে কয়েকটা বোমা ফেলেছে। রাত্রেই সামরিক বিভাগ থেকে ইস্তাহার বেরিয়েছে, সরকারী প্রচার-বিভাগ থেকে গতরাত্রেই সে ইস্তাহারের নকল সংবাদপত্রের আপিসে পাঠানো হয়েছিল। কানাই নিজে সে ইস্তাহারের অনুবাদ করেছে।

অন্যদিন রাজপথে জনতা এখনও চলমান হয় না, এখনও জীবনের চাকায় কর্ম্মশক্তির প্রবাহ পূর্ণোদ্যমে সঞ্চারিত হয় ন'টার পর। রাস্তার অধিকাংশ অংশই জনশূন্য থাকে, কেবল বাজারের মুখে, রেস্তোরাঁর সামনে, রাস্তার মোড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা জ'মে থাকে। আজ সর্ব্বত্র একটা উত্তেজনা। পথে দ্রুত ধাবমান যানবাহনের সারি চলেছে—লোক পালাচ্ছে। কলকাতায় বোমা পড়েছে!

খবরের কাগজের হকারেরা উত্তেজিত উচ্চস্বরে হেঁকে ছুটছে—বোমা! বোমা! কলকাতায় বোমা পড়ল বাবু, জাপানী বোমা!

ঘোষণায় স্থানের উল্লেখ করা হয় নি, সংবাদপত্রেও তার উল্লেখ নাই। জনতার যারা পলায়নপর নয়, পথের উপর নিত্যকার মত জ'মে আছে, তাদের মধ্যে উত্তেজিত গবেষণা চলেছে স্থাননির্ণয় নিয়ে। ট্রামের মধ্যে সেই গবেষণা।

কেউ বলে—উত্তরে, কেউ বলে—পশ্চিমে, কেউ বলে—দক্ষিণে; একজন বললেন—পশ্চিম-দক্ষিণ কোণাংশে, আমি নিশ্চিত জানি। একেবারে একটা অঞ্চলের আর কিছু নেই। বড় বড় পুকুর হয়ে গেছে। একটা কুলীর দেহ পাওয়া গেছে—তার চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে উড়ে গেছে।

কানাই মনে মনে হাসলে। সে সংবাদ পেয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা একেবারে মিথ্যা নয়; কিন্তু বাকী বিবরণটা সমস্ত গুজব।

ভদ্রলোক বলছিলেন—ঠিক রবিবার আরম্ভ করেছে। রবিবার হ'ল ওদের আক্রমণের নির্দ্দিষ্ট দিন। এইবার দেখুন না। এই যেতে যেতে না সাইরেন ককিয়ে ওঠে। ভোরবেলায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে না 'রেড' করে।

কানাইয়ের ইচ্ছা হ'ল, প্রতিবাদ করে। কিন্তু পরক্ষণেই নিবৃত্ত হ'ল। ঠিক সেই সময়েই ট্রামখানা এসে দাঁড়াল কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে। স্থানটা মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুললে নীলার ছবি। গতরাত্রের কথা মনে পড়ল। নীলা কি তার মনের বিরক্তির কথা বুঝতে পেরেছিল? বিদেশীয় সৈনিক দুটির সঙ্গে এমনভাবে অভিনয় দেখতে আসার কথা স্মরণ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বিরক্ত হয়ে উঠল। নীলাকে এমন তরলচিত্ত ব'লে মনে করতে তার কষ্ট হয়। পৃথিবীতে যদি নবরাষ্ট্রধর্ম্মই প্রচলিত হয়, জাতি ধর্ম্ম ধন মান প্রভৃতির বৈষম্য যদি বিলুপ্তই হয়ে যায়—তবু সাদা-কালোর বর্ণভেদে যে বৈষম্য সে তো থাকবেই; ওগো কালো মেয়ে, পৃথিবীতে কালার দলেই তোমার থাকা ভাল। কাকের ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হওয়ার গল্প কি তুমি জান না? সাদায় কালোয় বিবাহ অবশ্য বিরল নয়, নববিধানে মানবসমাজে এর প্রচলন আরও অনেক প্রসারিত হবে; তবু সুন্দর রূপের প্রতি অনুরাগ তো যাবার নয়। ওই বিদেশীদের অনুরাগ সত্য হতে পারে না এমন নয়, কিন্তু ও অনুরাগ সাময়িক মোহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এর প্রমাণ তো তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন যদি থাকে—তবে সে প্রমাণ তোমার সম্মুখে ধরলেও তুমি বুঝতে পারবে না। "বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই।" নীলার কথা কয়টা মনে ক'রে তার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। বিপদে তুমি পড়েছ, তুমি বুঝতে পারছ না।

গাড়ী এসে দাঁড়াল বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে। কানাই নেমে পড়ল।

রাস্তায় মানুষের ভিড় বেশ বেড়ে গেছে। বোমার আলোচনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অনেকে যেন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

সর্ব্বকালে মানুষ বর্ত্তমান নিয়ে অসন্তুষ্ট। বর্ত্তমানকে রদ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ আসে না। ভবিষ্যতের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্যের মত রূপায়িত হয়ে আছে জীবনের কল্পনা। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসে—সে যখন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ ক'রে বর্ত্তমানে পরিণত হয়, তখন ভবিষ্যতের কল্পনা স্বপ্নের মতই অলীক হয়ে ওঠে। যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সে চাইছে, কালের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের চেয়েও তা কঠিন—দৃঢ়। কানাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও একটু হাসলে। সুখময় চক্রবর্ত্তীর পুরানো বাড়ীটা অনেক আগেই ভেঙে পড়া উচিত ছিল, কত বড় বড় ভূমিকম্প গেছে, এই সেদিনও ব'য়ে গেল এমন প্রচণ্ড একটা সাইক্লোন—তবু সে বাড়ী ভাঙে নি। কাল ভাঙতে পারে নি, কিন্তু ভাঙবে মারোয়াড়ী মহাজনের ডিক্রী। পুরানো বাড়ীখানা ভেঙে—ঠিক ওই রকম প্ল্যানেই গড়বে নতুন বাড়ী, যা হবে সুখময় চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর রূপান্তর।

রাস্তায় হকারেরা তারস্বরে চীৎকার করছে:—কলকাতায় বোমা বাবু, কলকাতায় বোমা! একটা ছেলে এসে তার সামনেই ধরলে—একখানা 'স্বাধীনতা'।

কানাই হেসে ফেললে।

—কাগজ বাবু। কলকাতায় বোমা পড়েছে। স্বাধীনতা খুব জোর লিখেছে।

হেসে কানাই বললে—ওরে, ময়রাদের সন্দেশ খেতে নেই।

ছেলেটা অবাক্ হয়ে গেল। কানাই গলিপথে ঢুকে পড়ল।

বাসায় এসে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বিজয়দা ব'সে আছেন ডেক-চেয়ারটায়, পাশে তক্তাপোশের ওপর ব'সে রয়েছে নীলা। তার পাশেই একটা স্যুটকেস, এক হাত তার স্যুটকেসটার হাতলে আবদ্ধ। যেন এইমাত্র ওই স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে সে এখানে এসেছে। এক প্রান্তে ব'সে রয়েছে নেপী। গীতা ভাঙা নড়বড়ে টিপয়টার উপর চায়ের কাপে চা ঢালছে।

বিজয়দা হেসে সম্ভাষণ ক'রে বললেন—কি সংবাদ? পালে সত্য-সত্যই বাঘ পড়িয়াছে?

কানাইও হেসে বললে—আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী কানাই-রাখাল বলছ না কি?

—না। তা বলি নি। বোস। চা খা। তারপর গীতার দিকে চেয়ে বিজয়দা বললেন—হাসিভাই, আগে তোমার কানাইদাকে চা দাও। আমরা তো বোমা পড়ার পরও ঘুমিয়েছি, ও বেচারাকে বোমার পরও সমস্ত রাত্রি বোম্ বোম্ ক'রে কাটাতে হয়েছে। কাল বোধ হয় এক চটকও ঘুমুতে পারিস নি?

—না।

—বেশ। চা খেয়ে নিয়ে শ্রীমান্ নেপীকে উদ্ধার কর তুমি।

—কেন? নেপীর আবার কি হ'ল?

—জনসেবা-সমিতির সভ্য, বেচারা জনসেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বোমাপীড়িত অঞ্চলে ও যাবে। তোমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে সেখানে। ব'সে আছে তোমার জন্যে।

নীলা স্যুটকেসটা হাতে ক'রে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমি চললাম বিজয়দা।

—কোথায়? বিজয়দা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—কোন হোটেলে একটা ব্যবস্থা ক'রে নেব আমি।

—আরে, হোটেল তো আমিই খুলব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি?

—না।

—না নয়। আমি যা বলছি শোন। ব'স। চা খাও। আজ এইথান থেকেই আপিসে যাও। ও বেলায় এসে যদি হোটেলের পাকা বন্দোবস্ত না পাও তখন যেখানে খুশী যেয়ো। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বাড়ী দেখে আসছি। তিন-তিনজন অযাচিত খদ্দের পেয়েছি। হোটেল আমি খুলবই। 'ঘরছাড়াদের আস্তানা।' দেখ না কি রকম বন্দোবস্তটা করি।

নীলা হেসে বললে—বেশ, আপনার হোটেল খোলা হোক, ওপনিং-এর দিনেই আমি আসব। আজ আমি চললাম। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—নীলা! নীলা! বিজয়দা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

কানাই সবিস্ময়ে চেয়ে রইল, ইচ্ছাসত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করাটা তার অধিকারসম্মত ব'লে মনে হ'ল না। বিজয়দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কানাই চাইলে নেপীর দিকে। ম্লান হাসি হেসে নেপী বললে—দিদি বাড়ী থেকে চ'লে এসেছে।

কানাই নেপীর কথাটাই প্রশ্নের সুরে পুনরুক্তি করলে—বাড়ী থেকে চ'লে এসেছেন?

—বাবার সঙ্গে—। নেপী বলতে গিয়েও বলতে পারলে না।

কানাই চুপ ক'রে রইল।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে নেপী বললে—রাধিকাপুরে শুনেছি বোমা পড়েছে। বস্তীর ওপর। সেখানে যাওয়া দরকার কানুদা।

কানাই ভাবছিল নীলার কথা। বাড়ী ছেড়ে নীলা চ'লে এসেছে! তার বাপের সঙ্গে—কি হয়েছে বাপের সঙ্গে? ঝগড়া! কেন? বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। তিনি ওই বিদেশীয়দের সঙ্গে

কন্যার ঘনিষ্ঠতার জন্য তিরস্কার করেছেন। নীলা চাকরী করছে, সে সক্ষম আধুনিকা—সে তা সহ্য করে নি। একটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

সত্যই তাই। কানাইয়ের অনুমান নিষ্ঠুরভাবে সত্য। গত রাত্রে পিতা-পুত্রীর মধ্যে আকস্মিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এই ভাবে।

সাইরেনের উৎকণ্ঠার মধ্যে নীলা ও নেপীর জন্য দেবপ্রসাদবাবুর উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। সমস্তক্ষণটা তিনি অস্থির পদক্ষেপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কতবার মনে হয়েছে তিনি থিয়েটারে ছুটে যান। নীলা অবশ্য বাপকে জানিয়েই এসেছিল। কিন্তু জেম্‌স্ এবং হেরল্ডের কথাটা বলে নাই। বাপের মনের উদার প্রসারতার সীমারেখার পরিমিতি সে জানত। বিদেশীয় সৈনিকদের নিমন্ত্রণ ক'রে থিয়েটার দেখানোটা তিনি কোন-মতেই সহ্য করতে পারবেন না ব'লেই সে বলে নাই। 'অল ক্লীয়ার' সঙ্কেতধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎকণ্ঠিত দেবপ্রসাদ থিয়েটারে ছুটে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ী থেকে থিয়েটারের দূরত্ব নিতান্তই অল্প। থিয়েটারে এসে ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল—নীলা হাস্যমুখে জেম্‌স্ এবং হেরল্ডের কাছে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। জেম্‌স্ ও হেরল্ড নত অভিবাদনে বিদায় নিচ্ছে। দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আপনার অস্তিত্ব গোপন রেখেই তিনি ছেলে ও মেয়ের পিছনে পিছনে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীর দরজায় এসে তিনি পুত্র-কন্যার সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়ালেন। নীলা বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে—বাবা?

দেবপ্রসাদ স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নীলার তাতে সঙ্কুচিত হবার কারণ ছিল না, কোন অন্যায়ের স্পর্শ থেকে সঞ্চারিত গোপন দুর্ব্বলতা তার মনে ছিল না, অসঙ্কোচেই সে আবার বললে—আপনিও বাইরে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন বাবা?

দেবপ্রসাদ দরজার কড়াটা সজোরে নাড়া দিয়ে ডাকলেন—দরজা খোল।

এবার নীলা দেবপ্রসাদের মনের অব্যক্ত বিরক্তির আভাস যেন অনুভব করলে। নেপী তার চেয়েও অধিক পরিমাণে অনুভব করেছিল, সে দেবপ্রসাদের এই ধারার ভঙ্গীগুলির সঙ্গে সুপরিচিত; দেবপ্রসাদের ইচ্ছা ও আদেশ নীরবে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লঙ্ঘন ক'রে সে আপনার বেছে-নেওয়া কর্ম্মপথে চলে, মধ্যে মধ্যে যখন দেবপ্রসাদ তার পথরোধ করে দাঁড়ান, তখন এই ধারার দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে ওঠে। নীলার হাত স্পর্শ ক'রে একটু চাপ দিয়ে নেপী ইঙ্গিতে কথাটা জানাতে চাইলে। নীলা কিন্তু সে ইঙ্গিত বুঝতে পারলে না, বুঝতেও চাইলে না। তার বাপের অন্তরের উত্তাপের যে স্পর্শ সে অনুভব করলে—তাতে তার অন্তরও ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই তার মা দরজা খুলে দিলেন। নীলা এবং নেপীকে দেখে গভীর উৎকণ্ঠা ভোগের বিরক্তি থেকেই ব'লে উঠলেন—ধন্য মা! ধন্য মেয়ে তুমি!

নীলা উত্তপ্ত হয়েই ছিল, মায়ের এই কথায় তার মনের উত্তাপ আরও খানিকটা বেড়ে গেল, বললে—কেন মা?

—এই রাত্রি একটা পর্য্যন্ত, যুবতী মেয়ে তুমি—তুমি—

বাধা দিয়ে নীলা বললে—সাইরেন বাজবে জেনে তো বের হই নি আমি। নইলে আমি—নইলে তো দশটার মধ্যে আমার বাড়ী ফেরবার কথা। অন্যায় তো আমি কিছু করি নি!

—অন্যায় কর নি? দেবপ্রসাদ অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত যেন ফেটে পড়লেন—ঘরের বাইরে যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছিলেন, এবার তিনি কঠিন ক্রোধে গম্ভীরস্বরে প্রায় গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—অন্যায় কর নি?

নীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল; দেবপ্রসাদের মূর্ত্তি দেখে, তাঁর কণ্ঠস্বর

শুনে মুহূর্তের জন্য সে হতবাক হয়ে গেল। সে জীবনে তার বাপের এমন মূর্তির সম্মুখীন হয় নি।

—আপনার বুকে হাত দিয়ে বল তুমি, অন্যায় কর নি তুমি?

এবার অভিমানে নীলার ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠিল। সে উত্তরে দৃঢ়স্বরে বলতে চেয়েছিল—না; কিন্তু ঐ একাক্ষরিক একটি শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারলে না।

—ঐ ইউরোপীয়ান সোল্জার দুটি কে? ওদের সঙ্গে তোমার কিসের আলাপ? থিয়েটারের মধ্যে—। দুরন্ত ক্রোধে ক্ষোভে দেবপ্রসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

নীলার মনে হ'ল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। এই রুদ্ধ অভিযোগের অন্তরালে থেকে এক অতি জঘন্য কুৎসা যেন কুৎসিত মুখে নীরবে বীভৎস হাসি হাসছে।

—উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র টমি—

—না। টমি বলতে যা আমরা বুঝি, তারা তা নয়। তারা অক্সফোর্ডের ছাত্র, তারা যুদ্ধে সৈনিক হয়ে এসেছে—তাদের আদর্শের জন্যে। নীলা দৃঢ়কণ্ঠে এবার প্রতিবাদ জানালে।

—হোক তারা অক্সফোর্ডের ছাত্র। তারা বিদেশীয়। তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ কিসের?

স্থির দৃষ্টিতে নীলা বাপের মুখের দিকে চেয়ে বললে—তারা আমাদের বন্ধু। আমরাই তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের দেশের থিয়েটার দেখতে।

এবার দেবপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নীলা—তার অসীম স্নেহের পাত্রী—নীলা! আপনার জীবনাদর্শের ভাবী মহনীয় রূপ যার মধ্যে মূর্ত দেখবার প্রত্যাশা করেন তিনি অহরহ—সে কি এই? এই কি তাঁর জীবনাদর্শের ভাবী রূপ? সমস্ত অন্তর তাঁর শিউরে উঠল।

নীলার মা এতক্ষণ অবাক হয়ে সমস্ত শুনছিলেন, বিদেশীয় সৈনিকের সঙ্গে কন্যার বন্ধুত্বের কথা—কন্যার মুখ থেকেই শুনে তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, বললেন—ছি, ছি, ছি, ছি! ছি আমার অদৃষ্ট!

নীলা আবার বললে—বাপ হয়ে আমার, সবচেয়ে অপমান করলেন আপনি।

দেবপ্রসাদ বললেন—কালই তুমি চাকরীতে রেজিগ্‌নেশন দেবে।

—রেজিগ্‌নেশন? কেন?

—আমি বলছি। তোমার প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি অবিলম্বে শেষ করতে চাই। তোমার আমি বিবাহ দেব।

ধীরকণ্ঠে নীলা বললে—না।

—না? দেবপ্রসাদ যেন আতঙ্কিত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

—না। ব'লেই নীলা দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল।

মা চীৎকার ক'রে উঠলেন—নীলা!

—আমি চ'লে যাচ্ছি। এর পর তোমাদের সঙ্গে আমার থাকা অসম্ভব।

দেবপ্রসাদ বললেন—যেতে তোমায় আমি বারণ করছি। তবুও যদি যেতে চাও, তবে এই রাত্রে তুমি যেয়ো না। যা হয় কাল সকালে করবে।

নীলা কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে ফিরল।

দেবপ্রসাদ ডাকলেন—নেপী!

কেউ উত্তর দিলে না। নেপী ঘরে প্রবেশই করে নি, বাইরেই ছিল। দেবপ্রসাদ বাইরে বেরিয়ে দেখলেন। বারান্দায় কেউ নাই, সামনের পথও জনশূন্য। তবু তিনি আবার ডাকলেন—নেপী!

নেপী কখন নিঃশব্দে চ'লে গেছে তার অভ্যাসমত।

ভোর হয়ে এল। একুশে ডিসেম্বর।

ট্রাম এখনও চলতে শুরু করে নাই, সময়ও হয় নাই এখনও। রাস্তায় কিন্তু আজ এরই মধ্যে লোক দেখা যাচ্ছে। লোক পালাচ্ছে—গাড়ি রিক্‌শা, মোটরের সারি বের হয়েছে। কৌতূহলীর দল সন্ধান করছে, বোমা পড়ল কোথায়? নীলা বাড়ী বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি নীলা ঘুমোয় নি। অশ্রান্তভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। দেবপ্রসাদও ঘুমোন নি। নীলার মা অন্ধকারে কেঁদেছেন।

ছোট একটা স্যুটকেস, অল্প কয়েকখানা জামাকাপড় নিয়ে নীলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে মা সামনে পড়লেন না। বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়, নীলা তাঁর সামনে দিয়েই বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে কোথায় যাবে ভাবতে গিয়ে বিজয়দার বাসার কথাটাই তার মনে পড়ল। নেপী নিশ্চয় রাত্রে সেখানেই গেছে। বিজয়দার আশ্রয় নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু কানাই গীতা ব'লে মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রে বিজয়দার ওখানেই রয়েছে। সেখানে যাওয়া কি তার ঠিক হবে? অনেক ভেবে অন্তত একটা বেলা থাকবার সংকল্প নিয়ে সে এসেছে। বিজয়দার উপদেশ নেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে গীতাকেও দেখবে—গীতা কেমন!

এখানে এসে বিজয়দাকে সমস্ত কথা বলছে সে।

বিজয়দা হেসে বললেন—হরি, হরি, ভাগ্যটা দেখছি হঠাৎ খুলে গেল নীলা! আর কয়েকজন যদি এমনিভাবে পালিয়ে আসে, তবে যে কলাও ক'রে একটা হোটেলের ব্যবসা খুলি।

বিজয়দা আবার বললেন—তাই বলি, ভোরবেলায় শ্রীমান্ নেপী বাসার বাইরের দরজায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে কেন? জিজ্ঞেস করলাম তো হেসে বললে, যেখানে বোমা পড়েছে সেইখানে যাবেন শ্রীমান্। সময় বুঝতে না পেরে একটু রাত্রি থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে, তাই

এখানে এসে দরজায় ব'সে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরে রাস্কেল!

নেপী অপ্রতিভের মত হাসলে।

বিজয়দা ষষ্ঠীকে ডেকে বললেন—ষষ্ঠীচরণ, এক সের জিলিপী গরম ভাজিয়ে নিয়ে এস। ওজনে ঠিক দিতে বলবে, জিনিস ভাল চাই, দর কিন্তু সেরের মাথায় আজ দু'আনার বেশী বাড়তি দিয়ো না। বুঝলে? ঠিক এই মুহূর্ত্তেই গীতা এসে ঘরে ঢুকছিল। নীলা তাকে দেখবামাত্র সে কে অনুমান করেছিল। তবু বিজয়দাকে প্রশ্ন করেছিল —এটি কে বিজয়দা?

সস্নেহে হেসে বিজয়দা বললেন—ওটি? আমার হাসিভাই। ওর সঙ্গে আমার কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে আমাকে দেখবামাত্র ওকে হাসতে হবে।

স্মিত সলজ্জ হাসিমুখে গীতা নীলার দিকে চেয়েছিল। নীলাও হাসলে একটু করুণার হাসি—করুণার মধ্যে থাকে যে সস্নেহ অবজ্ঞা —স্নেহের আবরণে সেই অবজ্ঞাভরেই গীতার দিকে চেয়েছিল—এই গীতা!

বিজয়দা বললেন—হাসিভাই, হ্যাঁ, চা ক'রে নিয়ে এস। দেখছ দুজন আগন্তুক হাজির। নেপীকে তো চেনই; তোমার খুশীভাই। আর ইনি হচ্ছেন নীলা—শ্রীমতী নীলা সেন—নেপীর দিদি।

গীতা টুপ ক'রে নীলার পা দুটি স্পর্শ ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল। নীলা চকিত হয়ে উঠল।—ও কি?

গীতা সলজ্জ হাসি হেসে নীরবেই চ'লে গেল ও ঘরে।

বিজয়দা বললেন—বড় ভাল মেয়ে রে!

—মেয়েটি কে বিজয়দা?

—বড় দুঃখী। কানাই ওকে উদ্ধার ক'রে এনেছে।

—উদ্ধার ক'রে?

—সে বড় করুণ ইতিহাস।

এর পর নীলা আর প্রশ্ন করতে পারলে না। কানাই এসে ঘরে ঢুকল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল নীলার পরিবর্ত্তন। সে ঘরে ঢুকবামাত্র নীলা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কয়েকটা কথার পর সে স্যুটকেস হাতে ক'রে উঠে দাঁড়াল। বিজয়দার অনুরোধ ঠেলেই সে বেরিয়ে গেল বিজয়দাও পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চ'লে গেল।

বিজয়দাও ফিরলেন না, নীলাও না। কানাই বারান্দায় বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, বিজয়দা বা নীলা, কাউকেই দেখতে পেলে না। মনে মনে সে নীলার উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। যদি এখানে না-ই থাকতে চায় নীলা—তবে অনর্থক এখানে এসে বিজয়দাকে চঞ্চল করবার কি প্রয়োজন ছিল? আর যে-পথ নীলা বেছে নিয়েছে —সে যখন ওই বিদেশীয়দের মোহগ্রস্ত—তাদেরই একজনকে সে যখন জীবনে জয় করতে চায়—তখন তাকে তার উপযুক্ত স্থান বেছেই নিতে হবে। সে স্থান বিজয়দার এই সংকীর্ণ-পরিসর পলেস্তারা-খসা ঘরখানি নয়। সরাসরি তার যাওয়া উচিত ছিল—কোন প্রথম শ্রেণীর আধুনিক হোটেলে। রূপ-মাধুর্য্যবর্জ্জিতা চিত্রাঙ্গদা যেমন অর্জ্জুনকে জয় করতে বসন্তপুষ্পিত বনভূমির পটভূমিতে পুষ্পধন্বুর কাছে ধার-করা লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তেমনিভাবে তাকেও দাঁড়াতে হবে কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে। সুনিপুণ প্রসাধনে মণ্ডিতা হয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে তাকে।

নেপী ডাকলে—কানুদা!

কানাই ফিরে তাকিয়ে দেখলে—নেপী সেই তক্তাপোশের প্রান্তে সে আছে।

নেপী বললে—রাধিকাপুর যাবেন না কানুদা? আপনার সময় হবে না?

নেপী আশ্চর্য্য। নীলা চ'লে গেল—এতে তার কোন উদ্বেগ নেই। কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন করবারও প্রয়োজন তার মনে হ'ল না। এই সুকুমার তরুণ বয়সে—ঘর-সংসারের মমতা-মায়া কেমন ক'রে এমন সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন ক'রে কর্ম্মের নেশায় নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে—সে এক বিস্ময়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হয়ে ফল যেমন বীজ হতে অঙ্কুর—অঙ্কুর হতে পত্রপল্লবঘন বনস্পতি-জীবন কামনায় গাছের বৃন্তবন্ধনমুক্ত হয়ে খ'সে পড়ে, নেপীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এই কর্ম্মের পথের যাত্রা তেমনি মুক্ত জীবনের যাত্রায়, প্রতি পদক্ষেপে বোধ হয় তার জীবন বিকশিত হয়ে উঠছে—সার্থক বিকাশে। তার এ নিরাসক্তির মধ্যে কোন কিছুর প্রতি বিরাগ নাই একবিন্দু। কিন্তু সে নিজে ঘর ছেড়ে এসেছে—সংসারের প্রতি তিক্ত বিরাগের জন্য! নেপীর সঙ্গে তার এইখানেই প্রভেদ।

নেপী আবার ডাকলে—কানুদা!

প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের ফলে কানাইয়ের শরীর ক্লান্তি এবং অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল—তবু নেপীর আহ্বান সে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ, যাব বই কি নেপী।

—তা হ'লে আর দেরি করছেন কেন?

—বিজয়দা, তোমার দিদি ফিরে আসুন।

—সে বিজয়দা যা হয় করবেন। দেরি ক'রে গেলে সেখানে আমরা কি কাজ করব?

কানাই আবার একটু হাসলে, বললে—পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর্ আমি স্নানটা সেরে নি। স্নান সেরে কানাই প্রস্তুত হয়ে বললে—চল্।

নেপী বললে—আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে কানুদা। গীতা খাবার তৈরী করছে।

—আরে, এই তো জিলিপী-চা যথেষ্ট খাওয়া গেল।

—দুপুরবেলার জন্যে গীতা খাবার তৈরী করছে।

পাশের ঘর থেকে গীতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমার হয়ে গেছে কানুদা। আর একটুখানি।

কানুর মনে হ'ল গীতার কথা। অহরহ ম্লানমুখী মেয়েটি যেন বিশ্বের দুঃখের বোঝা ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গভীর রাত্রে তার কান্না-ভারাক্রান্ত উচ্ছ্বসিত নিশ্বাসের শব্দ সে শুনেছে; গভীর রাত্রে গীতা কাঁদে। যে নিষ্ঠুর অত্যাচার তার উপর হয়ে গেছে, তার স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মনে পড়ল, অমলবাবুর যে কর্মশক্তি সে দেখেছে—সে শক্তি বিস্ময়ের বস্তু, মানুষ হিসেবেও ভদ্রতার তার অভাব নেই, যে প্রীতির পরিচয় ওই একদিনেই সে পেয়েছিল—সে প্রীতি অকৃত্রিম—কিন্তু তবু তার মধ্যে গুপ্ত ব্যাধির মত লালসার জঘন্য প্রকাশ তাকে ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে টলস্টয়ের—Resurrectionএর নায়ক প্রিন্স দিমি ট্রির কথা। ধনী-সমাজের এক ব্যাধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র। আদর্শবাদী প্রিন্স দিমি ট্রিও ধীরে ধীরে এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠল।—

"Now the purpose of women, all women except those of his own family and the wives of his friends, was definitely one; women were the best means towards an already experienced enjoyment."

গীতা একটা টিফিন-কেরিয়ার এনে সামনে নামিয়ে দিলে।

তাকে সস্নেহ উৎসাহে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যই কানাই হেসে বললে—যে রকম লোভনীয় গন্ধ তোমার দেওয়া খাবার থেকে উঠছে গীতা, তাতে এক্ষুনি খেয়ে শেষ করতে ইচ্ছে করছে।

নেপী উঠে দাঁড়িয়ে ছিল—টিফিন-কেরিয়াটা হাতে নিয়ে সে বললে—উঠুন কানুদা।

কানাইয়ের এমন প্রশংসাতেও গীতার মুখে এতটুকু তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল না। তার মুখ যেন অস্বাভাবিক রকমের বিবর্ণ ম্লান। এতক্ষণ হয়তো কানাই লক্ষ্য করে নি, অথবা গীতাই হয়তো আত্মসংবরণ ক'রে ছিল। কানাই বিস্ময়ের মধ্যেও সস্নেহ স্বরে প্রশ্ন করলে—কি গীতা-ভাই, কি হয়েছে ?

গীতার ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, কিছু বলবার চেষ্টা করতেই তার রুদ্ধ হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্মপ্রকাশ করলে, চোখ দিয়ে টপ-টপ ক'রে জল ঝরতে লাগল।

কানাই বললে—কি গীতা ?

—নেপীদা বলছিল, কাল হীরেন আপনাকে—

আর সে বলতে পারলে না।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন নেপী গীতার সামনেই গতরাত্রে কানাইয়ের উপর হীরেনের আক্রমণের কথা বলেছে। ব্যাপারটা বুঝে কানাই তার হাতখানা বাড়িয়ে গীতার সামনে ধরলে, বললে—এই দেখ। কিছু হয় নি। এই একটু ছ'ড়ে গেছে মাত্র। হীরেনটা মনে করলে, হয়তো আমি তাকে মারব কি এমনি কিছু। নইলে হীরেন তো আমাকে খুব ভালবাসে।

তবু গীতার চোখ থেকে জল ঝরা বন্ধ হ'ল না।

কানাই সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কেঁদ না গীতা। তা ছাড়া হীরেন তো শুধু তোমার ভাই ব'লেই কাঁদছ। আমার নিজের ভাইদের কেউ যদি আমাকে মারতে আসত তা হ'লে তো তুমি এমনভাবে কাঁদতে না! তা হ'লে তুমি আমায় পর ভাবছ ? মোছ, চোখের জল মোছ।

গীতা চোখের জল মুছলে। কানাই বললে—শুধু চোখের জল মুছলেই হবে ? মনকে প্রফুল্ল কর। তোমাকে নতুন মানুষ হতে হবে গীতা। আমি রাত্রে শুনেছি, তুমি কাঁদ। ছি! কাঁদবে কেন ?

গীতা এবার বললে—বাবা-মা কেমন আছেন খবরটা কোন রকমে পাওয়া যাবে না কানুদা ?

কানু সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—বাবার হার্ট বড় দুর্ব্বল। কালকের রাত্রের সাইরেনের পর কেমন আছেন—। আবার তার ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল—চোখের জল আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে গড়িয়ে নেমে এল।

কানাইয়েরও মনে প'ড়ে গেল তার নিজের বাড়ীর কথা। তার মাকে মনে পড়ল, ভাইবোনদের মনে পড়ল। জীবনপথে বক্রগতিতে সঞ্চরমাণা ছোটখুড়ীকে মনে পড়ল। মনে পড়ল মেজকর্ত্তাকে—রোগজীর্ণ দেহ—দাম্ভিক বৃদ্ধ। মনে পড়ল—সুখময় চক্রবর্ত্তীর মৃতকল্প স্ত্রীকে—দৃষ্টিশক্তিহীনা, শ্রবণশক্তিহীনা বৃদ্ধা—নির্ব্বাপিতশিখা প্রদীপের সলতের আগুনের মত জুগ্‌জুগ্‌ ক'রে কোনমতে যে বেঁচে আছে। সাইরেনের ধ্বনি কি তার কানেও প্রবেশ করেছিল ? এই উৎকণ্ঠা এই উদ্বেগের সময় এতগুলি অসুস্থ মানুষের একটিও সুস্থ সহায় কেউ ছিল না।

নেপী অসহিষ্ণু হয়ে ডাকলে—কানুদা !

কানু গীতাকে বললে—আজ ও বেলায় খবর এনে দেব গীতা! এখন যাই।

—দাঁড়ান। ব'লেই গীতা হেঁট হয়ে কানাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

—কেন ? হঠাৎ প্রণাম কেন ?

—আজ আমাকে বিজয়দা নিয়ে যাবেন নার্সের কাজ শেখবার আপিসে।

কানাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারলে না। গীতা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তার জীবনের কল্পনা শৈশব থেকে যে পথ চিনেছে, সে পথ তার হারিয়ে গেল আজ।

(উনিশ)

শীতকাল। তার উপর নিউ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। সকাল না হ'তেই আটটা বেজে যায়। এরই মধ্যে আপিসের সময় হয়ে এসেছে। মোটর, ট্রাম, বাস, গাড়ী, ঘোড়া, রিক্‌শায় কলকাতার রাস্তা ভ'রে গেছে। ফুটপাথে জনতার ভিড়। কলকাতা যেমন ছিল তেমনি। গত রাত্রে বিমানহানার ফলে প্রত্যূষে যে উত্তেজনা বিচ্ছিন্ন জনতার মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল, সে উত্তেজনার প্রবাহ পর্য্যন্ত কাজের চাকার দ্রুত আবর্ত্তিত জনস্রোতের মত বইছে। আলোচনা চলছে—তার মধ্যে উত্তেজনাও আছে, কিন্তু বোমার আঘাতে শৃঙ্খলা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কানাই খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাহীন নিরস্ত্র পরাধীন জাতির মধ্যে এ সহ্যশক্তি কেমন ক'রে সম্ভবপর হ'ল? অথবা উদরান্নের তাড়নায় মানুষগুলি এমনভাবে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে যে, বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মত মানসিক সচেতনতাও তাদের নেই! না, তাই বা সে কেন ভাববে? সে নিজেও তো এর মধ্যে রয়েছে, নেপী রয়েছে, তারা চলেছে বোমা-বিধ্বস্ত বস্তীতে মানুষের সেবাকর্ম্মে আপনাদের নিয়োজিত করতে যে প্রেরণায়—সে-বোধ, সে-প্রেরণা ওদের নাই, এ কথা সে মনে করবে কেন? কোন্ অধিকারে?

তারা শহরতলীর বাস্-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল।

খানকয়েক মিলিটারী লরী চ'লে গেল। চীনা সৈনিক বোঝাই লরী। ওপাশ থেকে শহরতলী হতে শহরে এসে ঢুকছে একসারি মিলিটারী লরী। নিত্যই যায়, নিত্য কেন, অহরহই চলেছে, ক্লান্তিহীন সামরিক গতিশীলতার বিরাম নাই। আজ কিন্তু এই যাতায়াত অকস্মাৎ একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে মুহূর্ত্তে যুধ্যমান অবস্থার শঙ্কাজনক গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি জাগ্রত হয়ে উঠছে।

—পুরের পথ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এতক্ষণে তার মনে পড়ল—অমলবাবুদের বাগানে নবনির্ম্মিত কারখানার কথা। পথের কথা শুনে মনে হ'ল—এ তো সেই পুর। গৃহহীন মানুষগুলির কথা মনে পড়ল। গোরু, ছাগল, তৈজসপত্র নিয়ে গৃহহারার দল, সেই বৃদ্ধ, সেই বৃদ্ধা, সেই সুশ্রী তরুণী মেয়েটি!—তার শরীরের মধ্যে রক্তস্রোতে একটা উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়ে গেল। হয়তো, হয়তো শত্রুবিমান-বর্ষিত বোমা অমলবাবুদের বাগানে—তাদেরই উপর পড়েছে। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলে—কত দেরি বাস্ ছাড়তে?

ড্রাইভার উত্তরই দিলে না। সময় হ'লে হুইসিল বাজবে—সে বাস্ ছাড়বে।

কানাই আবার ডাকলে—এ ভেইয়া!

নিস্পৃহস্বরে ড্রাইভার এবার জবাব দিলে—হুইসিল হোগা তো ছোড়েগা। দ্রুত ধাবমান যন্ত্রযানের সঙ্গে আপনার অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়ে—প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে স্টীয়ারিং, গীয়ার, ব্রেকের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে আট ঘণ্টা তার ডিউটি। এর অবসরে যে সংক্ষিপ্ত স্থির মুহূর্তগুলি আসে, সেগুলি সে ক্লান্ত অলস আনন্দে উপভোগ করে। সে চেয়ে দেখছিল রাজপথের জনতা।

বেলার সঙ্গে রাজপথের জনতার চাপ বাড়ছে।

বাস্‌গুলির চারিধারে আরোহীদের কাছে ভিক্ষাপ্রত্যাশী ভিক্ষুকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বাবা, রাজাবাবু! অনাথার দিকে তাকাও বাবা।

—অন্ধকে দয়া কর বাবা!

কানাই ভাবছিল — পুরের কথা।

নেপী মৃদুস্বরে বললে—একটা আনি দিন না কানুদা। কানুদা!

কানাই পকেটে হাত পুরলে।

নেপী বললে—এ মেয়েটি ভদ্রঘরের মেয়ে ব'লে মনে হচ্ছে, পেশাদার ভিখিরী নয়।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখেই যেন পাথর হয়ে গেল। পকেটের মধ্যে পয়সা-অনুসন্ধানরত হাতখানা স্থির হয়ে গেল,—হাতখানা যেন অবশ হয়ে গেছে। জীর্ণ কাপড়ের দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত ক'রে অতি সঙ্কুচিতভাবে শীর্ণ হাত পেতে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে; মধ্যে মধ্যে হাতখানা কাঁপছে। কে? অবগুণ্ঠনে আবৃত হ'লেও, অবয়ব দেখেই যে তাকে কত পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে! তাদের বাড়ীতে কতবার যে সে এই দীর্ঘ অবগুণ্ঠন-আবৃতা সঙ্কুচিতা মেয়েটিকে আসতে যেতে দেখেছে! এ যে গীতার মা! হ্যাঁ, তিনিই তো। কিন্তু এ কি—গীতার মায়ের হাত নিরাভরণ কেন? পরনেও একখানা থান কাপড়। তবে কি গীতার বাপ—? তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। মুহূর্ত্তে সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটি টাকা বের ক'রে নেপীর হাতে দিয়ে বললে—তুই যা নেপী, আমার যাওয়া হবে না।

নেপী বিস্মিত হয়ে গেল—সে কি? কানুদা! কানুদা!

ভিক্ষাথিনী মেয়েটি সত্যই গীতার মা—সরোজিনী। নেপীর ওই কানুদা ডাক তার কানে যেতেই সে চকিতে মুখ তুলে অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসারিত ক'রে দেখলে—কানাই-ই নেমে আসছে বাস্ থেকে। মুহূর্ত্তে সে দ্রুততম পদক্ষেপে ফুটপাথ অতিক্রম ক'রে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

সরোজিনীর ইতিহাস অতি মর্ম্মন্তুদ।

বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্তির উপরে গ'ড়ে উঠেছে মহানগরী, প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির এক বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্ত; সে আবর্ত্তে আবর্ত্তিত মানুষ আত্মহারা, দিশেহারা, সেখানে আপনার কথা ছাড়া অন্যের কথা

ভাববার তার অবকাশ নাই। পথের মধ্যে মানুষ অকস্মাৎ ম'রে গেলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়িয়ে বারকয়েক হায়-হায় ক'রেই আবার তাকে ছুটতে হয়। পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সাহায্যের উপর ভিত্তি ক'রে ধীরগতি জীবনের সমাজ এ নয়। সেখানে মানুষ অর্থহীন হ'লেও তার সাহায্যশক্তির একটা মূল্য আছে এবং সে সাহায্যশক্তি একটা অপরিহার্য্য বিনিময়-বস্তু। এখানে মানুষের আর্থিক ক্রয়শক্তির উপরেই তার পাওনা কতটুকু তা স্থির হয়। মানুষ ম'রে গেলে পর্য্যন্ত মানুষের সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, পয়সা দিলে ভাড়াটে বাহক মেলে, সৎকার-সমিতির গাড়ী পাওয়া যায়, দোকানে সৎকারের যাবতীয় জিনিস থরে থরে সাজানো আছে, যার যেমন শক্তি সে তেমনি কিনে আনে। সরোজিনী এবং তার স্বামীর জীবনের এই কয়দিনের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস লোকের খোঁজ রাখবার অবসর হয় নাই। খোঁজ রাখবার মত প্রবৃত্তিও ঘটে নাই কারও।

সেদিন হীরেনের গৃহত্যাগের পর থেকে রুগ্ন ক্রোধী নিষ্ঠুর স্বামীকে নিয়ে সরোজিনী নিরুপায় হয়ে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। ভগবানকে ডেকে বার বার নিজের এবং রুগ্ন স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছিল, বলেছিল—নাও তুমি, আমাকে আর ওঁকে নাও। মুক্তি দাও আমাদের। সাহায্য চাইবার মত মানুষ কাউকে সে খুঁজে পায় নাই। পূর্ব্বে, অভাব তখন অবশ্য এমন চরম সীমায় এসে পৌছায় নাই, তখন মধ্যে মধ্যে যেত চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী, কানাইয়ের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াত। কানাইয়ের বোন উমা—গীতার বান্ধবী; গীতা প্রায়ই যেত উমার কাছে, সেই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্রটি ধ'রে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে গিয়ে সে দাঁড়াত। কানাইয়ের মা যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কিন্তু গীতাকে নিয়ে কানাই চ'লে যাওয়ার পর থেকে ও-বাড়ীর দরজা মাড়াতে সে ... করে না। মেজকর্ত্তা, মেজগিন্নী, কানাইয়ের বাপ দোতলার ... স্বামী ... ওয়ালা ... ন লাগে

থেকে তাদের নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে লক্ষ্য ক'রে যে গালিগালাজ করে, সে শুনে সে নীরবে চোখের জল ফেলেছে।

—খানকির বাড়ী! খানকির বেটী—ছেলেটাকে মোহিনী-মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে গেল!

গীতার বাপ দাঁতে দাঁত ঘ'ষে গালাগাল দিয়েছে, কানাইকে এবং চক্রবর্ত্তী-বংশকে—লোচ্চার বংশ, ছাগলের বংশ;—তারপর অশ্লীলতম ভাষায় গালাগাল। দুপুরে খাবার সময় অতিক্রান্ত হ'লে গালাগাল দিয়েছে সরোজিনীকে, কাছে এলে প্রহার করেছে।

সরোজিনী প্রত্যাশা করেছিল—গীরেন ফিরবে। কিন্তু সে ফেরে নাই। মা বাপ গীতার জন্য দুঃখ তার অনেক; কিন্তু চরম অভাবের নিষ্ঠুরতম পীড়নের কষ্টে জর্জ্জর এই অসুস্থ সংসার থেকে বেরিয়ে এসে তার জীবাত্মা অনেক বেশী স্বস্তি পেয়েছে, আরাম পেয়েছে, তাই সে আর ফেরে নাই। কানাইকে দেখে আক্রোশে সে ছুরি মারতে চেয়েছে—সে আক্রোশ লজ্জায় হেঁট-মাথা তার দুঃখী মা-বাপের উপর সহানুভূতিরই এক বিচিত্র প্রকাশ, গীতার উপর প্রীতি এবং মমতারই বক্র রূপান্তর; তাদের সে ভালবাসে, কিন্তু তার তরুণ জীবন সে ভালবাসার জন্যে—ওই দুঃখকষ্টের মধ্যে কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না।

সরোজিনী মনে মনে কানাইকে আশির্ব্বাদ করেছে, আপন মানস-লোকে গীতা ও কানাইকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, তাদের মঙ্গল কামনা করেছে। প্রৌঢ়া ঘটকীর কাছে সকল বৃত্তান্ত সে শুনেছে। ঘটকী তাকে বলেছে—তিরস্কার ক'রে বলেছে—

যখন তখন চক্রবর্ত্তীদের মেয়েটার সঙ্গে মেয়েকে ও-বাড়ীতে যেতে মহানন্দিলি—তার ফল এখন ভোগ কর্। ও ছেলে চক্রবর্ত্তীদের ছেলে, মানুষ আমাগে গীতাকে নষ্ট করেছে, গোপন পীরিত ছিল ওদের। নইলে

ছোঁড়াকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল! সব বললে ছোঁড়াকে! আমি যাব কোথায় মা! ব'লে সে গালে হাত দিয়েছিল।

সরোজিনী মনে অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করেছিল। তার গীতা চরম লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। গীতা সব যখন কানাইকে খুলে বলতে পেরেছে, তখন ঘটকীর কথা সত্য—গীতা কানাইকে ভালবাসে, আর কানাই যখন সব শুনেও তাকে নিয়ে ঘর-সংসার ছেড়েছে, তখন সেও গীতাকে ভালবাসে। তাদের সে ভালবাসা সত্য হোক্। বিবাহের প্রত্যাশা সে করে নাই, তবু তো তারা স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করবে ছোট একটি সংসার পেতে। এ শহরে তেমন নরনারীর তো অভাব নাই। তাদের বস্তীর মধ্যেই তো কত ঘর রয়েছে! চোখে তার জল এসেছিল, সে জল তার শীর্ণ মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল—মুছে ফেলতেও তার মনে হয় নাই।

ঘটকী সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—সে বাবু আজও এসেছিল, মস্ত বড়লোক, গীতার খোঁজ সে করছে। বলছে—পুলিসে খবর দিয়ে একটা কেস ক'রে দে।

সরোজিনী শিউরে উঠেছিল।

—খরচপত্তর সে-ই সব করবে। বড়লোক—ঝোঁক পড়েছে, বুঝলি? সরোজিনী ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করেছিল।

—তবে আর আমি কি করব? ব'লে সেদিন সে চ'লে গিয়েছিল।

তারপর ক'দিন তাদের কেটেছে জীবনের চরমতম অভাবের মধ্যে। ঘরে একটা শূন্যগর্ভ সেকালের পুরানো ট্রাঙ্ক ছিল। সেটা বিক্রী করেছিল এক টাকায়। যুদ্ধের বাজার—চালের দর আঠারো, রুগ্ন স্বামী রাত্রে সাবু খায়, ওষুধ এবং নেশা আফিং চাই, টাকাটার মূল্য আর কতটুকু? বাড়ীওয়ালা এসেছিল, ভাড়া বাকী তিন মাস। রুগ্ন, তীক্ষ্ণ-মেজাজী স্বামী তাকে আইনের তর্ক তুলে ঝগড়া ক'রে হাঁকিয়ে দিয়েছে। বাড়ীওয়ালা শাসিয়ে গেছে—আইন? তোর মত ভাড়াটে ওঠাতে যদি আইন লাগে

তবেই আমি ক'রে খেয়েছি! কালকের দিন সময় দিচ্ছি, পরশু তোকে গুণ্ডা দিয়ে বের ক'রে দেব বাড়ী থেকে। আইন করতে চাস্—তুই করিস্!

বাড়ীওয়ালা চ'লে যেতেই সে দুর্দ্দান্তভাবে হাঁপাতে শুরু করেছিল, বহু শুশ্রূষায় সরোজিনী তাকে সুস্থ ক'রে তুলতেই, সেদিনের মত সরোজিনীর হাতের পাখাটা কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুর প্রহারে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুলেছিল। নিরুপায় হয়ে সে গিয়েছিল বামুনদিদি সেই ঘটকীর কাছে। সমস্ত দিনটা সম্মুখে, ঘরে এক কণা খুদ নেই, রুগ্ন স্বামী তাকে প্রহার ক'রে ক্লান্ত হয়ে আবার হাঁপাচ্ছে। চাল চাই, সাবু চাই, আফিং চাই। অন্তত একটা রাঁধুনীর কাজও ঘটকী যদি কোথাও জুটিয়ে দেয়!

বামুনদিদি আশ্বাস দিয়েছিল—এক সের চালও দিয়েছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ব্যস্ত হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘটকী এসে বলেছিল—যা বলি তাই কর্। কিছু পাইয়ে দি তোকে।

শঙ্কায় বিস্ফারিত চোখে বামুনদিদির মুখের দিকে চেয়ে সরোজিনী প্রশ্ন করেছিল—যেন তার কথা সে কিছুই বুঝতে পারে নি,—একটি কথার প্রশ্ন—অ্যাঁ?

কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা থান কাপড় বের ক'রে সরোজিনীকে দিয়ে সে বলেছিল—এই কাপড়খানা পর্।

সরোজিনী থান কাপড়টার দিকে চেয়েছিল সবিস্ময়ে।

বামুনদিদি বলেছিল—হাতের কড় দুটো খুলে ফেল্। নোয়াটা খুলে ফেল্। সিঁথির সিঁদুরটা—। কথা অসমাপ্ত রেখেই সে সরোজিনীরই আঁচলখানা টেনে নিয়ে বিবর্ণ সিঁদুরচিহ্নটুকু মুছে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

সরোজিনী দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিল—না।

—না নয়, শোন্! সেই বাবু এসেছে আজ। আমি বলেছি—গীতার বাপ ম'রে গেছে—কিছু সাহায্য করতে হবে আপনাকে। যা বলি তাই কর্। কুড়ি পঁচিশটে টাকা পেয়ে যাবি।

সরোজিনী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

ঘটকী বলেছিল—শুধু শুধু ভিক্ষে কি লোকে দেয়! দুঃখের কথা বলতে হয়; ভিক্ষে করতে গেলে মিছে ক'রেও বলতে হয়।

ও-ঘর থেকে রুগ্ন প্রদ্যোত দাঁতে দাঁত ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—যা বলছেন—শোন্ না, হারামজাদী।

এর পর সরোজিনী মাটির প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে ছিল—ঘটকীই সিঁদুর মুছে কড় নোয়া খুলে দিয়েছিল—তারপর মাটি থেকে পড়ে-যাওয়া থান কাপড়খানা তুলে হাতে দিয়ে বলেছিল—নে—প'রে ফেল্।

তারপর নীরবে সে এসে ঘটকীর বাড়ীতে অমলের সামনে নিস্পন্দ হয়ে আজকের মতই নিরাভরণ হাতখানি মেলে দাঁড়িয়েছিল। অমলও নীরবে তার হাতে দিয়েছিল দু'খানি দশ টাকার নোট। নিস্পন্দ হাতের উপর নোট দু'খানাও নিস্পন্দ—তার ওপর টপ টপ ক'রে ঝ'রে পড়েছিল অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে দু' ফোঁটা জল। অমল আরও একখানা নোট দিয়ে বলেছিল—পরে আবার দেখব, আজ আর নেই।

ঘটকী বলেছিল—পুলিসে খবর দেবে ও। ব'লে ক'য়ে রাজী করেছি। এখন দুঃখের সময়টা, দু'দিন যাক। আয়, আয় লো বউ। ব'লে তার হাত ধ'রে টেনে এনে রাস্তায় একখানা নোট সরোজিনীর হাত থেকে নিয়ে বলেছিল—এ আমার কমিশনি। এখন ওই কুড়ি টাকাই তোর ঢের। আবার আদায় ক'রে দোব। তারপর হেসে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—খেয়ে-দেয়ে শরীরটাকে একটু তাজা কর্ দেখি! পরিষ্কার থানকাপড়েই তোকে যা লাগছে! কে বলবে তুই গীতার মত এত বড় মেয়ের মা! ঘটকী হেসেছিল, সে হাসি দেখে সরোজিনী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ঘটকী বলেছিল—যা এখন বাড়ী যা। ব'লে সে চ'লে গিয়েছিল। সরোজিনী সেই পথের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল—নির্ব্বাক হয়ে। ঘটকীর কথাগুলিই সে

ভাবছিল। চন্দ্রালোকিত ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, গলির মধ্যে জ্যোৎস্নার প্রভা এসে পড়েছিল; অস্ফুট প্রদোষালোকের মত আবছায়ার মধ্যে সাদা কাপড় প'রে অশরীরীর মত কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হয়েছিল সাইরেনের শব্দে। সচকিত হয়ে সে ছুটে বাড়ীতে এসে ঢুকেছিল। রুগ্ন প্রদ্যোতের হার্ট দুর্বল!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ছিল প্রদ্যোত। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। সরোজিনীকে দেখেই সে দুরন্ত ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—কি করছিলি এতক্ষণ?

সরোজিনী কি উত্তর দেবে ভেবে পায় নাই।

—এত দেরি কেন হ'ল? তারপর সরোজিনীর দিকে চেয়ে বলেছিল—সিঁথির সিঁদুর মুছে ধবধবে থান কাপড় প'রে বাহার যে খুব খুলেছে দেখছি!

সবিস্ময়ে সরোজিনী এবার বলেছিল—কি বলছ তুমি?

—কি বলছি? আমি কিছু বুঝি না, না? হারামজাদী ঘটকী—তোকে বিধবা সাজিয়ে—;—উঃ—! ব'লে সে নিজের চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল।

ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে সরোজিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। উন্মত্ত প্রদ্যোত অকস্মাৎ নিজের চুল ছেঁড়া বন্ধ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—সরোজিনীর উপর। দু' হাতে টুঁটি টিপে ধ'রে পেষণ করতে আরম্ভ করেছিল। তারপর সরোজিনীর আর মনে নেই। জ্ঞান হ'লে দেখেছিল—সে প'ড়ে আছে মেঝের ওপর, প্রদ্যোত নেই, তার হাতের নোট দু'খানাও নেই।

সেই সাইরেনের বিপৎকালের মধ্যেই প্রদ্যোত তাকে মৃত মনে ক'রে তার হাতের নোট দু'খানা নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে।

সরোজিনীর দুঃখ হয়েছিল। তবু তার মনে হয়েছিল—সে মুক্তি

পেয়েছে—সে মুক্তি পেয়েছে। সেও ভোরবেলায় তার জীর্ণ কাপড়খানা, একটা মগ, একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়মের গ্লাস, একখানা কলাই করা থালা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সকালে বাড়ীওয়ালা আসবে গুণ্ডা নিয়ে।

ঘটকীর বাড়ীও যায় নাই। বাড়ী থেকে বের হবার আগে থানা-কাপড়খানা বদলাবার এবং হাতে দু-টুকরো লাল সুতো বাঁধবার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠেছিল। এই বেশ-ই তার ভাল। তা ছাড়া, কালকের শিক্ষা তার মনের মধ্যে খানিকটা কাজ করেছিল, সে ওই থান কাপড় প'রে নিরাভরণ হাত প্রসারিত ক'রে বাস্-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে। কিন্তু কানাইকে দেখে আপনার মিথ্যাচরণের লজ্জা থেকে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলে না। পাশের গলিপথ দিয়ে ছুটে পালাল।

কানাই আর তাকে দেখতে পেলে না। ফুটপাথের উপরেই সে তাকে খুঁজছিল। স্তব্ধ হয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গীতার বাবা তা হ'লে মারা গেছেন। বিধবা সরোজিনী দেবী পথে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। প্রদ্যোতবাবু মারা গেছেন—তিনি অবশ্য নিষ্কৃতিই পেয়েছেন। কিন্তু মারা গেলেন কিসে? গীতার কথাটা তার মনে পড়ল, গত রাত্রের সাইরেনের কথা উল্লেখ ক'রে শঙ্কা প্রকাশ ক'রেই বলেছিল—বাবার হার্ট দুর্ব্বল। হয়তো কালই ওই ভয়াবহ উদ্বেগের সময় প্রদ্যোতবাবু হার্ট-ফেল ক'রে মারা গেছেন। শ্মশান থেকে ফিরে কপর্দ্দকহীন স্বজনসহায়হীন সরোজিনী দেবী ভিক্ষার জন্য রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন, বাড়ীওয়ালা হয়তো বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক থেকে যেন আপনি ঝ'রে পড়ল। বাসখানা তখন চ'লে গেছে। যে পথে বাসখানা চ'লে গেছে—সেই

পথের দিকে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বাসখানার দ্রুতগতির মত নেপীর জীবনের দ্রুতগতি দ্বিধাহীন, পিছনের প্রতি তার কোন মমতা নেই। সে চ'লে গেল—আহত বিপন্ন মানুষের সেবা করতে। তার জীবনের সমস্ত গতি পঙ্গু ক'রে দিয়েছে গীতা। গীতার ভার সবই নিয়েছেন বিজয়দা, তবু গীতা তাকে ছাড়ে নি। সে ঢুকে বসল একটা চায়ের দোকানে। ফিরে গিয়ে গীতাকে সে কি বলবে তাই ভাবছিল। এখনও মা-বাপের জন্য তার গভীর মমতা। যে মা-বাপ উদরান্নের জন্য তাকে জঘন্যতম লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করে নি—তাদের কথা বলতে গিয়ে এখনও তার ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। খাঁটি বাঙালীর মেয়ের সনাতন রূপই এই। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে যারা সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর অক্ষম-অসহায়তার মধ্যে জীবন যাপন ক'রে এসেছে—তারা এর বেশী আর কি করতে পারে? সর্ব্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু ওই অধিকারটুকু তারা পেয়েছিল; পিতা-স্বামী-পুত্রের সেবা করবার অধিকার। তাদের সমস্ত জীবনীশক্তি সহস্রধারায় ওই পথে বেগবতী হয়ে উঠেছে—স্নেহে, প্রেমে, ভক্তিতে, প্রীতিতে, মমতায়, সেবায়। জীবনের সকল বঞ্চনার দুঃখ সুগভীর বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে—আত্মত্যাগের কৃচ্ছ্র-সাধনায়। মনে পড়ল তার নিজের মায়ের কথা, পিতামহী মেজগিন্নীর কথা, প্রপিতামহী সুখময় চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী সেই নব্বই বৎসর বয়স্কা জড়পিণ্ডের মত বৃদ্ধার কথা। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একবার দেখে এলে হয় না? চায়ের শূন্য কাপটার দিকে চেয়ে সে ব'সে রইল। আবার একখানা বাস ছাড়ছে—সেই শহরতলীর দিকে। নেপী এতক্ষণ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তার জীবনকে একদিকে টানছে নেপী, একদিকে

টান্‌ছে গীতা। গীতার প্রভাবটাই যেন বেশী। নইলে সে-ই বা এই চায়ের দোকানে ব'সে গীতার মতই ভাবছে কেন, যাদের সে পরিত্যাগ ক'রে জীবনে অগ্রসর হবার জন্য পথে বেরিয়েছে, তাদের কথা। গীতারই কথাতেই কিছুক্ষণ আগেও তার একবার তাদের কথা মনে পড়েছিল। যদি ভাবছেই, তবে সে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে তাদের খোঁজ নিয়ে আসতে পারছে না কেন? নেপী হ'লে কি করত? সে অসঙ্কোচে গিয়ে সেখানে দাঁড়াত, যেটুকু তার কর্ত্তব্য মনে হ'ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন ক'রে চ'লে আসত। তার এ দুর্ব্বলতা কেন? মুখে তার সকরুণ হাসি ফুটে উঠল। সুখময় চক্রবর্ত্তীর বংশের অসুস্থ রক্তের প্রবাহ, তার সেই জীর্ণ অন্ধকার গোলকধাঁধার মত বাড়ীখানা, যার মধ্যে সে এতকাল বাস করেছে, সেই বাড়ীখানার প্রভাব; এমন যে তার চির-সঙ্গী! তবু সে মুহূর্ত্তে নিজের অন্তরকে টেনে সোজা খাড়া ক'রে তুললে। আগে চলবার জন্য সে প্রস্তুত হ'ল। বাড়ীর খোঁজ নিয়ে—যেটুকু তার করণীয় সম্পন্ন ক'রে সে চ'লে আসবে। নেপী অনেক দূর এগিয়ে চ'লে গেছে। হঠাৎ মনে হ'ল নীলার কথা। বিজয়দা কি তাকে ফেরাতে পেরেছেন? না—নীলাও একাকিনী নির্ভয়ে যে পথ তার সম্মুখে প্রসারিত হয়ে রয়েছে সেই পথে এগিয়ে চ'লে গেছে?

(কুড়ি)

প্রৌঢ় মেজকর্ত্তা গভীর আবেগের সঙ্গে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কিছু আবৃত্তি করছেন। প্রাচীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অন্ধকার সিঁড়িতে কানাই উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। এই প্রাতঃকালেই মেজকর্ত্তা মদ খেয়েছেন নাকি? দু'-চারটে লাইন তার কানে এল।

"নারায়ণ—নারায়ণ,
ডুবেছে মৈনাক সাগরের জলে;

অভ্রংলিহ উচ্চশির বিন্ধ্য ভাই মোর,
তার শির লুটায়েছ ধরার ধূলায় ;
তবু মেটে নাই সাধ ?............'

মেজকর্ত্তা স্তব্ধ হলেন।

মেজগিন্নীর সাড়া পাওয়া গেল—এত ভাবছ কেন ?

—ভাবছি কেন ? মেজকর্ত্তার কণ্ঠস্বরে আগ্নেয়গিরির গর্জ্জনের আভাস ফুটে উঠল।

সবিনয়ে এবার মেজগিন্নী বললেন—যা হয় উপায় তিনিই করবেন।

—করবেন ? তিনিই উপায় করবেন ? না ? থিয়েটারী ভঙ্গীতেই মেজকর্ত্তা হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন। খানিকটা হেসে আবার বললেন—উপায় করেছেন তিনি। চক্রবর্ত্তী বংশ ধ্বংস। বোমার আঘাতে ভাঙা বাড়ী চুরমার হয়ে যাবে, আর তারই তলায় গোষ্ঠীসুদ্ধ চাপা পড়বে। না হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—রাক্ষসের মত সব খাবে পৈশাচিক আহার। কতবার বলেছি, দৈনন্দিন খরচের চাল থেকে একমুঠো ক'রে কেটে রেখো। সঞ্চয় করো। শুনবে না, কিছুতে শুনবে না। নাও এইবার গেলো। ভাড়াটেরা সব চ'লে গেছে। কাল রাত্রেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অল-ক্লিয়ার-এর পর সকলকে ডেকে বলেছি—ওহে, ভোরবেলাতেই একবার বস্তীতে যাবে। ঘুম কারও ভাঙল না। সব পালিয়ে গেছে। নাও, এইবার কি করবে কর ? দু'হাতে পেট পুরে খাও।

মেজগিন্নী বললেন—বড় তরফ—ছোট তরফ তো ওদের বস্তীর অংশ বিক্রী করছে।

—বিক্রী করেছে ?

—হ্যাঁ, আজই বিক্রী করবে, তারা সব বেরিয়ে গেছে। আজ

সন্ধ্যেয়, নয় কাল সব বাইরে পালাচ্ছে। বললে, বোমার আঘাতে মরতে পারব না।

মেজকর্ত্তা ক্ষুব্ধ আক্ষেপে বললেন—যাক, যে যেখানে যাবে যাক। আমি—আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

মেজগিন্নী বললেন—বড় তরফ যাচ্ছে—

চীৎকার করে উঠলেন মেজকর্ত্তা, যাক্,—যাক্,—যাক্! মেজগিন্নী সভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মেজকর্ত্তা আবার বললেন—তারপর? বস্তী বিক্রী করছে, এর পর খাবে কি? বস্তী তো মর্টগেজ হয়ে আছে, মর্টগেজ শোধ ক'রে কত টাকা পাবে? পঙ্গপালের মত ছেলে, তিন চারটে মেয়ে। মেয়েগুলোর বিয়ে দেবে কি করে? বিক্রী করছে!

মেজগিন্নী বললেন—ভগবান আছেন, তিনি যা করবেন তাই হবে।

—হবে। ঠিক হবে। তাঁর ন্যায় বিচার। পাপের বিচার তিনি ঠিক করবেন। পাপ—মহাপাপ, প্রায়শ্চিত্ত হবে না! বি-এস্-সি পাস বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান—একজনের কুমারী মেয়েকে নিয়ে পালাল। মহাপাপ! এর প্রায়শ্চিত্ত কড়ায় গণ্ডায় হবে। পাপ আমরাও করেছি, বেশ্যাসক্ত ছিলাম, আজও মদ্যপান করি, লক্ষ্মীকে অবহেলা করেছি, পাপ আমরাও করেছি। কিন্তু এ হ'ল মহাপাপ! মহাপাপ!

কানাইয়ের দেহের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল। তারই কথা হচ্ছে। সে সোজা উপরে উঠতে আরম্ভ করলে। মেজকর্ত্তার কণ্ঠস্বর তখন সকরুণ হয়ে এসেছে। তিনি বলছিলেন—ভগবান, এত বড় কলঙ্কের ছাপ তুমি এঁকে দিলে চক্রবর্ত্তী-বংশের কপালে? তাকে তুমি এমন মতি কেন দিলে? তার মাথায় তুমি বজ্রাঘাত—। মেজকর্ত্তা কথা শেষ করতে পারলেন না। সিঁড়ির দরজা অতিক্রম ক'রে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সম্মুখেই দাঁড়াল কানাই।

মেজকর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে ক্রোধে স্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে

কানাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন, কানাই ধীর পদক্ষেপে তাঁর দিকে এগিয়ে এল, মেজকর্ত্তা এবার চীৎকার ক'রে উঠলেন—বেরিয়ে যাও, তুমি বেরিয়ে যাও। লজ্জাহীন লম্পট—কুলাঙ্গার বেরিয়ে যাও তুমি।

মেজগিন্নী অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন কানাইয়ের মুখের দিকে। এতটুকু লজ্জা কি অনুতাপের চিহ্ন মুখে নাই!

কানাই শান্ত স্বরে বললে—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আমার সঙ্গে তোমার কোন কথা নেই, থাকতে পারে না। বেরিয়ে যাও তুমি।

—না। আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার।

তার অসঙ্কোচ দীপ্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মেজকর্ত্তা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বললেন—তোমার লজ্জা করছে না?

—না। আমি লজ্জা পাবার মত কোন কাজ করি নি।

—কর নি?

—না। সেই কথাই বলতে চাই আপনাকে।

—তুমি বস্তীর সেই গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়েটিকে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—আপনাকে সেই কথাই বলব।

—সে কি মিথ্যা কথা? তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও নি?

—গিয়েছি। কিন্তু—

অসহিষ্ণু মেজকর্ত্তা বাধা দিয়ে বললেন--তবে? ও! তবে কি তুমি তাকে বিবাহ করেছ?

—না।

—তবে?

—সে কথা শুধু আপনাকেই বলতে চাই আমি। গোপনে বলতে চাই।

আবার একবার স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে মেজকর্ত্তা বললেন—বল।

—গোপনে বলতে চাই।

—এস। ব'লে মেজকর্ত্তা তাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করবার সময় মেজগিন্নীকে কঠোর স্বরে বললেন—ও এসেছে এ কথা কেউ যেন না জানে! খবরদার! তারপর কানাইকে বললেন—দরজা বন্ধ করে দাও।

কানাই দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। মেজকর্ত্তা বিচারকের গাম্ভীর্য্য নিয়ে বললেন—বল।

কানাই তাঁর মুখের ওপর অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে চেয়ে আরম্ভ করলে।—মেয়েটিকে আমি চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেছি। উমার বন্ধু সে—উমার মতই তাকে আমি স্নেহ করি, সেও আমাকে উমার মত ভক্তি করে—ভালবাসে। সেদিন রাত্রি তখন দশটা—

মেজকর্ত্তা নীরবে সমস্ত কথা শুনে গেলেন। স্থির গম্ভীর মুখ, অচঞ্চল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; কে বলবে যে, অপরিমিত অমিতাচার উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে অসুস্থমস্তিষ্ক, নিদারুণ অভাবের তাড়নায় অধীরপ্রকৃতির সেই মানুষই এই। কানাইয়ের চোখেও তাঁর এ মূর্ত্তি নতুন; সেও বিস্মিত হয়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীর শান্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে মেজকর্ত্তা বললেন—বল। তারপর?

কানাই বললে—তাকে এই চরমতম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমি তাকে নিয়ে গিয়েছি। বাড়ীতে থাকলে—এই লাঞ্ছনা তাকে নিত্য ভোগ করতে হ'ত। পরিণাম হ'ত—

মেজকর্ত্তা বললেন—তুমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে না কেন? আমার কাছে এলে না কেন?

কানাই বললে—ঠিক সেই সময় আমিও এ বাড়ী থেকে চিরদিনের মত বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

মেজকর্ত্তা চমকে উঠলেন।—কেন ?

কানাই বললে—এ বাড়ীর ধ্বংস অনিবার্য্য। আমি বাঁচতে চাই। তাই আমি চ'লে গেছি।

মেজকর্ত্তা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কানাই বললে—মেয়েটিকে আমি আমার এক দাদার বাসায় রেখেছি। তিনি একজন পলিটিকাল ওয়ার্কার—বিবাহ করেন নি। তিনিই তার ভার নিয়েছেন। তাকে তিনি নার্সের কাজ শেখাবেন স্থির করেছেন। আজই সে ভর্ত্তি হবে। কানাই স্তব্ধ হ'ল।

মেজকর্ত্তা তখনও তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। চেয়েই রইলেন।

কানাই আবার বললে—অন্যায় আমি কিছু করি নি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেজকর্ত্তা ডান হাতখানি প্রসারিত ক'রে কানাইয়ের মাথার উপর রাখলেন। অতি মৃদুস্বরে বললেন—তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি। টপ-টপ ক'রে তাঁর চোখ থেকে বড় বড় ফোঁটায় কয়েক বিন্দু জল ঝ'রে পড়ল। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার বললেন—কোন অন্যায় তুমি কর নি। তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি।

কানাই এবার নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। মেজকর্ত্তা বললেন—তুমি ঠিক বলেছ, এ বাড়ীর পরিত্রাণ নাই, এর ধ্বংস অনিবার্য্য। চ'লে গেছ, বেশ করেছ; তোমার মধ্যে চক্রবর্ত্তী-বংশ বেঁচে থাকবে।

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

মেজকর্ত্তা খাড়া সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহের জীর্ণতা অসুস্থতাকে অভিভূত ক'রে একটা মহিমা ফুটে উঠেছে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে।

বহু মানুষকে বঞ্চনার অপরাধের বিনিময়ে চক্রবর্ত্তী-বংশে যে আভিজাত্য অর্জ্জন করেছিল—তার অবশেষটুকু আজ এই মুহূর্ত্তে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। তিনি আবার বললেন—বাঁচার মত বাঁচবার জন্যে যখন এ বাড়ী ত্যাগই করেছ, তখন চ'লে যাও, আর দাঁড়িয়ো না। তোমার মা—তোমার জন্যে দুঃখে শয্যা নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আর তুমি বের হতে পারবে না। তিনি তোমায় ছাড়বেন না।

কানাই চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মা তার জন্য শয্যা নিয়েছেন!

মেজকর্ত্তা বললেন—চঞ্চল হয়ো না! চক্রবর্ত্তী-বংশের কল্যাণের জন্যেই বলছি—। যখন চ'লে গেছ—যেতে পেরেছ—তখন আর ফিরো না। শোক দুঃখ সময়ে সব সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু যে মুক্তি তুমি পেয়েছ তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিলে আর জীবনে ফিরে পাবে না।

কানাই ফিরল।

মেজকর্ত্তা বললেন—কি করছ, কি করবে, তা জানি না। কিন্তু খুব বড় একটা কিছু ক'রো। যাতে চক্রবর্ত্তী-বংশের সমস্ত পাপ ক্ষালন হয়। আর—। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল—বললেন—আমরা ম'লে অশৌচটা পালন ক'রো। তারপর আবার বললেন—এবার তাঁর মুখের হাসি আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল এবং রূপেও যেন রূপান্তর ঘটল—বললেন—বিয়ে করলে—নাত-বউকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

কানাই বেরিয়ে এল—এক পরম আনন্দময় লঘু মন নিয়ে; সে লঘুতার মধ্যে চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাস নাই, নিরুচ্ছ্বসিত শান্ত আনন্দের মধ্যে তার জীবনের গতিবেগ সদ্য নীড়ত্যাগী আকাশ-সন্ধানী তরুণ পাখীর লঘু পক্ষের গতির মত দ্রুততর হয়ে উঠেছে। চক্রবর্ত্তী-বংশের ওই অন্ধকার মোহময় বাড়ী থেকে আজ পেয়েছে সে সত্যকার মুক্তি। এ মুক্তি যেন পরম মুক্তি ব'লে মনে হচ্ছে। আজ তার মনে হ'ল—তার পদরেখায়-রেখায় পৃথিবীর বুকে রাজপথ গ'ড়ে উঠবে। তার অসুস্থ

পূর্ব্বপুরুষদের গলিপথে আনাগোনার কলঙ্ক চাপা প'ড়ে যাবে নতুন রাজপথের, ইটপাথরের বিছানির তলায়। তার মেজদাদুকে সে কোন কালে ভাল চোখে দেখত না। তার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির ইতিহাসকে সে এতদিন শুধুই কৌশলময় শোষণে পরস্ব অপহরণের ইতিহাস ব'লেই ভেবে এসেছে। জীবনযাপনের ধারার মধ্যে দেখেছে শুধুই বিলাস-বিশ্রামের উপভোগের ধারা, যে ধারা তার দেহরক্তের মধ্যেও সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে বিষ। কিন্তু আজ মেজদাদুর উদার কথাবার্ত্তা শুনে, তাঁর অকপট আশীর্ব্বাদের গভীরতায়, সস্নেহ স্পর্শে তার মনে হ'ল, তার দেহ-মন যেন জুড়িয়ে গেছে। তার মনের জর্জ্জরতা যেন এক মুখর শীতলতার মধুর শান্তির মধ্যে বিলীন হয়ে আসছে। আজ সে প্রথম ভাবলে, মনে মনে স্বীকার করলে—মানুষের জীবনপ্রবাহের ধারাবাহিকতার মধ্যে তার পূর্ব্বপুরুষ উদ্ভূত হয়েছিল জীবনেরই তাগিদে—প্রয়োজনবশে; সুখময় চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব না হ'লে সে আসত না পৃথিবীতে। তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে গেছেন—যার মধ্যে কল্যাণ ছিল—যে কল্যাণের শক্তিতে আজ কানাই এসে পৌঁছেছে আজকের উপলব্ধিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম করলে। বললে—ক্রোধী দুর্ব্বাসার ক্রোধটাই তাঁর পরিচয় নয়, অভিশাপটাই তাঁর একমাত্র দান নয়—সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল যে অমৃত, ধন্বন্তরি এবং ওষধি সেও তাঁর দান। বিজয়দা ঠিক এই মত পোষণ করেন। তিনি কতবার বলেছেন কানাইকে। কানাই এ সত্যটা স্বীকার করে নি, কোনদিন ক্ষমা করতে পারে নি সে তার পূর্ব্বপুরুষকে। আজ সে স্বীকার করলে মনে মনে।

চৌরাস্তার মোড়ে বিখ্যাত একটা মিষ্টির দোকানের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। জন আট-দশ পল্লীবাসীর একটি জনতা ফুটপাথের উপরে ব'সে আছে। কাঁধে কাঁথা চট, ভাঙা স্টীলের

কয়েকখানা থালা নিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে রাস্তার চলমান যন্ত্রযানগুলির দিকে। মিলিটারী লরী এক সারি যাচ্ছে দক্ষিণ মুখে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে আসছে এক সারি। পূর্ব্বদিকেও চলেছে মধ্যে মধ্যে। পশ্চিম দিকের বড় রাস্তাটা ধ'রে তো অহরহই যাচ্ছে আসছে। এ ছাড়া চলছে বাস ট্রাম। তারা অবাক হয়ে গেছে। কয়েকটা শিশু কাঁদছে—ক্ষিদে, ক্ষিদে!

কানাই বুঝতে পারলে পল্লীগ্রামের নিরন্ন মানুষের দল অন্নের আশায় বোমার আতঙ্ক মাথায় ক'রেও মহানগরীতে এসেছে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে।

মেদিনীপুর, দক্ষিণ-বঙ্গ এসব স্থানের অন্নাভাবের কথা, যারা দেশের সামান্য সংবাদও রাখে তাদের অবিদিত নাই। সমস্ত বাংলার অবস্থাই ক্রমশ শোচনীয় হয়ে আসছে। জুয়াখেলার আসর ব'সে গেছে ধান-চালের বাজারে। দিন দিন দর চড়িয়ে যাচ্ছে মহাজনেরা দ্বিগুণিত দান-ধরার মত। চাষী আর কতক্ষণ ধ'রে রাখবে তার ঘরে? যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য ক'রে তোলে মানুষ।

তাজা শাকসব্জী ফলমূল বোঝাই লরী কয়েকখানা চ'লে গেল সামনে দিয়ে। ওদিকে চোখের সামনে মিষ্টান্নের দোকানে থরে থরে সাজানো মিষ্টান্ন। একটা উপাদেয় মিষ্টির নাম আবার—'আবার খাবো'। কানাই একটু না হেসে পারলে না। এ লোকগুলি যা খেতে পাবে এখানে, তার নাম—'আর খাবো না' দেওয়া হবে ভবিষ্যতে।

সোজা এসে সে উঠল বিজয়দার বাসায়। ট্রামে উঠতেও মন হ'ল না। হেঁটে গোটা পথটা অতিক্রম ক'রে এল।

বাসাতে ষষ্ঠীচরণ একা। ষষ্ঠীচরণ তাকে দেখে বিস্মিত হ'ল, বললে—কানাইবাবু?

সংক্ষেপে কানাই উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

তারপর প্রশ্ন করলে—বিজয়দা গীতা এঁরা কোথায় ?

—গীতাকে কোথা ভর্ত্তি ক'রে দিতে গিয়েছেন। 'নার্সিং' শিখবে না ? বাবু ফিরবেন একেবারে আপিস সেরে।

—ও। কানাই গায়ের জামা খুলতে আরম্ভ করলে।

ষষ্ঠী শঙ্কিত স্বরে বললে—খাবেন নাকি আপনি ?

—খাব বইকি।

—ভাত তো নাই।

—ভাত নাই ?

ষষ্ঠী অভিযোগ ক'রে বললে—কোথায় গেলেন আপনি নেপীবাবুর সঙ্গে, কি ক'রে জানব যে এরই মধ্যে আপনি ফিরবেন। তা ছাড়া নীলা দিদিমণি খেলেন রাঁধা ভাতে। আর ভাত থাকে ?

—নীলা ? নীলা এইখানেই খেয়েছে ?

হাঁ গো। ওই দেখুন না সুটকেস। খেয়ে আপিসে গেলেন।

নীলা তা হ'লে ফিরে এসেছে। কানাই জামাটা খুলে স্তব্ধ হয়ে বসল।

(একুশ)

ষষ্ঠী বললে—তা হ'লে পয়সাকড়ি দেন, খাবার নিয়ে আসি। হোটেল থেকে ভাত আনব ? না লুচি তরকারী আনব ?

কানাই বললে—লুচি তরকারী ? দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পার না ষষ্ঠী ? ভাত খেতে বড় ইচ্ছে করছে।

—উনোনে আঁচ নেই। নির্ব্বিকার ষষ্ঠীর কণ্ঠস্বরে কোন সঙ্কোচ নাই।

—আঁচ দাও না।

—আঁচ ? দোব কিসে ? কয়লা দু'টাকা মণ, তাও মিলছে না।

যা ছিল সবই পেরায় এ-বেলায় ফুরলো। ও-বেলার জন্যে চারডি রয়েছে। কাল যদি কয়লা মেলে তো রান্না হবে—নইলে হবে না।

বাজারে কয়লা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। চাল ডালের অবস্থাও তাই। কোথাও কোথাও নাকি জিনিসপত্র খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে শোনা যাচ্ছে। বোমার ভয়ে যে সব দোকানী পালাচ্ছে তারাই নাকি যা দর পাচ্ছে তাতেই মাল দিচ্ছে। কিন্তু শোনাই যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না।

কানাইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কিনছে বোধ হয় অমলবাবুর দল।

অমলবাবুর সংসারে কি দান আছে ?

মনে পড়ল—রায় বাহাদুরের বাড়ীর বাইরের দুখানা আউট হাউস—পাব্লিক এয়াররেড শেল্টার।

সুখময় চক্রবর্ত্তীর কালে যাদের প্রয়োজন ছিল, বর্ত্তমান কালে তাদের উপযোগিতা গত হয়েছ ; They have played out their part—তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই আজ অমলবাবুরা হয়ে দাঁড়িয়েছে অকালের বর্ষার মত। বর্ষাকালের বর্ষণে ফসলে ভ'রে ওঠে পৃথিবীর বুক ; অকালের বর্ষার বর্ষণ পাকা ফসলে ধরিয়ে দেয় পচন।

ষষ্ঠী বললে—কি আনব ? পয়সা দেন। হোটেলের ভাত কিন্তু খেতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং খাবার নিয়ে আসি। নীলাদিদির খাবার আনতে হবে, ফিরে এসে খাবে ; একবারে বরং নিয়ে আসা হবে।

জামার পকেট থেকে একটা সিকি বের ক'রে ষষ্ঠীর হাতে দিয়ে কানাই বললে—যা হয় নিয়ে এস। নীলা তাহ'লে ফিরে এসেছে! সে বিছানাটার উপর শুয়ে পড়ল। সমস্ত রাত্রি জেগেছে, তার উপর সকাল থেকে ঘোরাঘুরিও কম হয় নাই ; উত্তেজনার মধ্যে ক্লান্তি এতক্ষণ

সে অনুভব করতে পারে নাই; এখন অবসাদে তার স্নায়ুমণ্ডলী যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ষষ্ঠীচরণ এসে দেখলে—কানাই অগাধ ঘুমে ঢ'লে পড়েছে, কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজেও সে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার নাক ডাকতে শুরু করলে। কড়া নাড়ার শব্দে কানাইয়ের ঘুম ভাঙল, ষষ্ঠীর তখনও নাক ডাকছে। দেওয়াল-আলমারীর তাকের উপরের টাইমপিস্‌টার দিকে তাকিয়ে কানাই দেখলে—পাঁচটা বেজে গেছে। ষষ্ঠীকে সে ডাকলে—ষষ্ঠী! ষষ্ঠী!

শুয়েই রক্তচক্ষু মেলে একবার তাকিয়ে ষষ্ঠী আবার ঘুরে শুল।

—ওঠ ষষ্ঠী, দেখ নীচে কে ডাকছে।

—উঠছি। ষষ্ঠী জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে; কিন্তু উঠল না।

নীচে কড়া ঘন ঘন নড়ছে। কানাই এবার বেশ জোরেই ডাকলে—ষষ্ঠী, ওঠ। পাঁচটা বেজে গেছে। ব'লে নিজেই সে নীচে নেমে গেল। দরজা খুলেই দেখলে—দাঁড়িয়ে আছে নীলা। আপিস থেকে নীলা ফিরেছে।

নীলা বললে—আপনি?

ভদ্রতাজ্ঞাপক হাসির সঙ্গে কানাই শুধু বললে—হ্যাঁ।

—নেপী? নেপীও ফিরেছে?

—না। আমার যাওয়া হয় নি।

নীলা আর কোন কথা না ব'লে উপরে উঠে গেল। কানাই নীচেই দাঁড়িয়ে রইল। নীলা আপিস থেকে ফিরল—সে মুখহাত ধোবে——মুখহাত কেন—ভাল ক'রে স্নানই করবে হয়তো, প্রসাধন করবে, তারপর যাবে হয়তো কোন সিনেমায়। অথবা কোন ভোজনালয়ে, যেখানে তার সেই বিদেশীয় বন্ধু ছুটি আসবে। এখন তার উপরে যাওয়া উচিত হবে না। এদিকে তার ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে। সে

বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসল, মাখন রুটি এবং চায়ের বরাত দিলে। চায়ের দোকানটা লোকে ভ'রে রয়েছে। শীতের দিন, বেলা পাঁচটাতেই অপরাহ্ণ গড়িয়ে এসেছে, সূর্য্যের শেষ রশ্মি মহানগরীর বড় বড় বাড়ীগুলোর আলসের মাথায় উঠেছে। সন্ধ্যা আসন্ন। দোকানের মধ্যে আলোচনা চলছে গত রাত্রির বিমানহানার, আসন্ন রাত্রিতে বিমানহানার সম্ভাবনার গবেষণাও চলছে। উত্তেজনার মধ্যে আতঙ্কের আভাস ফুটে উঠছে; চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরের উদ্বেগে, মুখের চেহারায় সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে! রাজপথে পথিকদের পদক্ষেপ অস্বাভাবিক দ্রুত। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো—! খাওয়া শেষ ক'রে কানাইও তাড়াতাড়ি উঠল। সন্ধ্যার পর তাকে আপিসে যেতে হবে।

বাসায় এসে সে ঘরে ঢুকল না, বারান্দায় বিজয়দার পুরানো ডেক-চেয়ারটায় ব'সে ষষ্ঠীকে বললে—ষষ্ঠী, আমার আপিস আছে।

ষষ্ঠী সাড়া দিলে—হুঁ।

নীলা বেরিয়ে এল। কানাই উঠে দাঁড়াল। নীলা বললে—আপনি উঠলেন কেন?

কানাই উত্তর না দিয়ে একটু হাসলে।

নীলা প্রশ্ন করলে—কোথায় গিয়েছিলেন? চা তৈরী ক'রে খুঁজলাম, পেলাম না।

—একটু বাইরে গিয়েছিলাম—চা খেয়েছি আমি।

—ও! নীলা ভেতরে চ'লে গেল।

পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে এল। কানাইয়ের বোধ হ'ল, নীলা কিছু বলতে চায়। বোধ হয় নেপীর কথা। সেই অনুমান ক'রেই সে নিজে থেকেই বললে—ভাববেন না, নেপী ঠিক ফিরবে।

—নেপী? নীলা একটু হাসলে। নেপীর জন্যে ভাবা নিরর্থক কানাইবাবু; মাও আর তার জন্যে ভাবেন না। হয়তো রাত দুপুরে

এসে কড়া নাড়বে, নয় দরজার গোড়াতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকবে। হয়তো তিনদিন পরে ফিরবে।

কাঁনাইও একটু হাসলে।

নীরাই আবার বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না?

হেসেই কানাই বললে—স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করুন, কিছু মনে করব না।

—গীতাকে আপনি নার্স ট্রেণিং দিচ্ছেন কেন?

কানাই বললে—কি করব? বিজয়দা ব্যবস্থা করেছেন, গীতাও তাই চাইলে। আমি আপত্তি করব কেন?

নীলা অনুযোগ ক'রেই বললে—ওকে আপনার পড়ানো উচিত ছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানাই বললে—প্রথমে আমারও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বিজয়দার ব্যবস্থাই ঠিক। প'ড়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে অনেক দিন লাগবে। তা ছাড়া সেও একটা অনিশ্চিত কথা।

—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে শিক্ষাটা অনেক বড় কথা।

—বড় কথা নিশ্চয়। কানাই হেসে বললে—কিন্তু অবস্থাভেদে অনেক আদর্শকেই আমাদের বলি দিতে হয়। গীতার ক্ষেত্রেও তাই। দীর্ঘদিন পরের ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকা তার উচিত হবে না। নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। নইলে যে লাঞ্ছনা তার একবার—। বলতে গিয়ে কানাই থেমে গেল।

নীলা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইলে।

কানাই ম্লান হেসে বললে—মেয়েটির ইতিহাস বড় মর্ম্মন্তুদ, বড় করুণ মিস সেন।

নীলা নীরব হয়েই রইল, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নের ব্যগ্রতা ফুটে উঠল। কানাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বললে,—বড় দুঃখী মেয়ে, দুঃখীর ঘরেই জন্ম, কিন্তু তার যে মাশুল ওকে দিতে হয়েছে, সে শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। আমাদের বাড়ীর পাশেই একটা বস্তী —অবশ্য গরীব ভদ্রলোকের বস্তী, সেখানেই থাকতো ওর মা-বাপ, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি ওকে। শান্ত-শিষ্ট মেয়ে—কথায়-বার্ত্তায় চলায়-ফেরায় ওকে দেখলেই মনে হ'ত—পৃথিবীর কাছে বেচারার কত অপরাধ! আমার বোনের সঙ্গে এক-বয়সী, ছেলেবেলায় দেখেছি আমার ভাই-বোনেরা ছাদের ওপর খেলা করত, গীতা পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখত। আমিই ডেকে আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর পাড়ার স্কুলে আমার বোনের সঙ্গে একসঙ্গেই পড়ত, পড়ায় মেয়েটি ভাল ছিল না; কিন্তু ওর শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির জন্যে হেড মিস্ট্রেস ওকে ফ্রি ক'রে দিয়েছিলেন। বই কিনতে পারত না, আমার বোনের বই নিয়ে পড়াশুনো করত। আমার নিজের বোনের মতই ওকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু তবুও বিজয়দার কথাই ঠিক। কেন, আমার অনুগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করবে কেন?

বলতে বলতে কানাইয়ের কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল। নীলাও মনে মনে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল মেয়েটির জন্য। বারান্দার রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে সে ম্লান দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের খানিকটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল; নূতন পথের বন্ধুরতা যেমন পথিকের চলায়-চলায় সহজ সমান হয়ে আসে, তেমনিভাবেই এই আলাপের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্কোচ ও বিরূপতা অনেকটা কেটে গিয়েছিল; নীলাও এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মেয়েটিকে ঐ জন্যেই আপনি তার বাপ-মার কাছ থেকে নিশ্চয় নিয়ে আসেন নি। একবার বলেছিলেন যেন লাঞ্ছনার কথা—

অবশ্য যে দুঃখকষ্টের কথা বললেন, সেও মানুষের জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু নয়; কিন্তু আমাদের দেশে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—মিস্ সেন, অনুগ্রহ ক'রে সে কথা আপনি শুনতে চাইবেন না।

নীলা বললে—থাক্, সে শুনতে চাই নে আমি। কিন্তু একটা কথা বলব, মনে কিছু করবেন না।

—বলুন।

—মেয়েটিকে যখন আপনি তার মা-বাপের আশ্রয় থেকে এইভাবে নিয়ে এসেছেন, তখন আপনার তাকে বিয়ে করতে দেরি করা উচিত নয়।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে কানাই বললে—না।

—কেন?

এবার তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে কানাই বললে—আমাদের বংশের রক্তই রুগ্ন রক্ত, মিস্ সেন। ভবিষ্যতে আমার পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আমাদের বংশে দশ-বারোজন পাগল।

নীলার বিস্ময় এবং বেদনার আর অবধি ছিল না।

কানাই হেসে বললে—আমাদের বংশ কলকাতার এককালের অভিজাতের বংশ। এ রোগ অভিজাত্যের অভিশাপ।

নীলা নীরব হয়ে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে রইল, কানাইও কিছুক্ষণ নীরব থেকে হেসে বললে—কাল রাত্রে আপনার বন্ধু দুটি—আমি সেই ইংরেজ সৈনিকদের কথা বলছি,—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয় নি। একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।

নীলা বললে—আমার সঙ্গেও তাদের পরিচয় অতি সামান্য। তবে আবার যদি দেখা হয়, দেব।

কানাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চাইল,—যে পরিমাণ পরিচয়ে

বিদেশীয়দের সঙ্গে রঙ্গালয়ে যাওয়া যায়, সে কি পরিমাণে সামান্য? নীলা চেয়ে ছিল সেই নীচের রাস্তার দিকে, সারাদিনের পরিশ্রমের অবসাদে অথবা গীতার করুণ কাহিনীর প্রভাবে সে যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কানাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে দেখতে পেলে না।

নীলা তেমনি নীচের দিকে চেয়েই বললে—বড় ভদ্রলোক, সত্যিকারের ভদ্রলোক--টমি বলতে আমরা যা বুঝি, ওরা তা নয়। যুদ্ধে যোগ দেবার আগে একজন ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র, আর একজন পড়া শেষ ক'রে ওখানেই চাকরী—

তাদের কথায় বাধা দিয়ে ষষ্ঠীচরণ আবির্ভূত হ'ল—কানাইবাবু, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, আপনি খান নি?

—খাবার?

—হ্যাঁ। খাবার এনে দেখলাম ঘুমুচ্ছেন আপনি। ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

নীলা ব্যস্ত হয়ে উঠল—আপনি সারাদিন কিছু খান নি?

হেসে কানাই বললে—সকালে গীতা অবশ্য পেটপুরে খাইয়েছিল, আবার বিকেলবেলাও খেয়ে এসেছি দোকানে।

ষষ্ঠী বললে—এগুলো তাহ'লে খেয়ে ফেলুন।

—নাঃ। ও আর খাব না।

—তবে? ষষ্ঠীচরণ একটু ভাবিত হয়ে পড়ল:—পয়সার মাল নষ্ট করবেন বাবু? খেয়ে ফেলুন—পেটে গেলেই গুণ দেখবে।

—না না। কাউকে বরং দিয়ে দিয়ো।

—দিয়ে দোব?

—হ্যাঁ, দিয়ে দিয়ো।

নীচে কড়া নড়ে উঠল।' কানাই ঝুঁকে দেখলে—নেপী দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার ক'রে ডাকা নেপীর অভ্যাস নয়। তার নিজের বাড়ীতে

চুপি চুপি কড়ার ইঙ্গিতে ডেকে ওইটাই যেন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কানাই বললে—নেপী। ব'লেই সে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল।

নেপী ঘরে ঢুকল। তার মূর্ত্তি দেখে কানাই শিউরে উঠল। রুক্ষ, ধূলি-ধূসরিত চুল, ক্লান্ত অবসন্ন শুষ্ক মুখ, রক্তের দাগে কাপড়-জামা ভ'রে গেছে। কানাইয়ের চোখের দৃষ্টি দেখে নেপী একটু ম্লান হাসি হাসলে।

কানাই প্রশ্ন করলে—তোমার কাপড়ে জামায় এত রক্তের দাগ কেন নেপী?

ম্লান হেসে নেপী বললে—বোমায় উণ্ডেড্দের রক্ত কানুদা।

—উণ্ডেড্দের রক্ত?

—হ্যাঁ। সে এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কানুদা। একটা বস্তীর ওপরে বোমা পড়েছে। কতকগুলি নিরীহ হতভাগ্য—উঃ, সে কি দৃশ্য—কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে; কারও বুকে কারও পিঠে স্প্লিণ্টার ঢুকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়েছে! বস্তীর মধ্যে কাটা হাত-পা আঙুল এখনও প'ড়ে আছে।

কানাই একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কলকাতার বুকে যুদ্ধের বলি আরম্ভ হয়ে গেছে!

নেপী আবার বললে—একটি জোয়ান লোকের যে যন্ত্রণা দেখলাম, সে আপনাকে কি বলব! অচেতন লোকটি আহত জানোয়ারের মত গোঙাচ্ছে। আর তার স্ত্রী—মেয়েটি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে—ব'সে আছে বোবার মত, চোখেও তার একফোঁটা জল পড়ে না। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে!

—ক'জন মরেছে নেপী?

প্রশ্ন শুনে নেপী এবং কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে—নীলা কখন সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

নেপী বললে—মরেছে বেশী নয়; ঠিক ডিরেক্ট হিট হয় নি; স্প্লিণ্টারে উণ্ডেড হয়েছে কয়েকজন। জন বিশেকের আঘাত বেশী রকমের।

নীলা বললে—স্নান ক'রে ফেল নেপী।

নেপী যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল, বললে—কাল কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে কানুদা।

কানু কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল—যে নিঃস্ব রিক্ত অসহায় মানুষগুলি ম'ল তাদের কথা। ম'রে হয়তো তারা খালাসই পেয়েছে। যদি কোন রকমে বেঁচেই যেত তবু কি তাদের উদ্ধার ছিল?" আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরিবর্তে সম্মুখে এগিয়ে আসছে অনাহারের তিলে-তিলে মৃত্যু। দুর্ভিক্ষ আসছে—নিষ্পলকদৃষ্টি মন্থরগতি অজগরের মত। সাইক্লোন—রপ্তানী—মজুতদার! তার মনে প'ড়ে গেল রাধিকাপুরে অমলবাবুদের গুদামে মজুত চালের কথা। চোখের ওপর ভেসে উঠল—রাস্তার ফুটপাথে কঙ্কালসার চাষী ছেলেটার পরিবারের কথা;—ময়দার বস্তা বোঝাই লরীর তলায় রক্তাক্ত ছবি। বিজয়দা বলেন—যুদ্ধ নয়—বিংশ শতাব্দীর মহা মন্বন্তর; এর পরই নাকি আসবে নব বিধান! কানাইয়ের হাসি পায়। আটলাণ্টিক চার্টার! আটলাণ্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর অনেক দূর!

নেপী বললে—ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হবে। আমি রক্ত দেব কানুদা। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। সে বোকার মত একটু হাসলে।

নীলার মুখও দীপ্ত হয়ে উঠল, সে বললে—আমিও যাব নেপী। আমিও দেব রক্ত।

নেপী ম্লানমুখে এবার বললে—ব্লাড সিরাম পেলে এই জোয়ান

লোকটি হয়তো বাঁচত! উঃ, তার স্ত্রীর দুঃখ দেখে আমার যে কি কষ্ট হ'ল কি বলব!

নেপী নীলা উপরে উঠে গেল। কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভাবছিল—তবু বাঁচতে হবে; মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত অপরাধ-সত্ত্বেও মানুষ মহৎ। আজ তার দাদুকে দেখে সে-বিষয়ে সে নিঃসংশয় হয়েছে। ওই মানুষের ভেতর আজ অকস্মাৎ যার দেখা সে পেয়েছে—সেই মানুষ আছে সকল মানুষের মধ্যে। সেই মানুষকে বাঁচাতে হবে। আজই সে সেই আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছে তার দাদুর কাছে। সেও রক্ত দেবে। কিন্তু তার দেহে সুখময় চক্রবর্ত্তীর রক্তধারা প্রবাহিত। অসুস্থ রক্ত। রোগের বিষে জর্জ্জরিত রক্তকণিকা! রক্ত দিয়েও আজ মানুষের সেবা করবার তার অধিকার নেই। আজ এই প্রয়োজনের সময় ব্লাড ব্যাঙ্ক হয়তো রক্তের সুস্থতা অসুস্থতা বিচার করবে না। কিন্তু সে দেবে কি ব'লে? তা ছাড়া এ পরীক্ষায় তার নিজের প্রয়োজন আছে। সে সুস্থ মানুষ হবে। অকলঙ্কিত রক্তধারার মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীতে আনবে ভবিষ্যতের মানুষ। নীলার দিকে একবার চেয়ে দেখলে সে; আপনা থেকেই যেন তার চোখ ফিরল তার দিকে। নীলা বিস্মিত হ'ল, বললে—কি কানাইবাবু? কানাই একটু চমকে উঠল; পরক্ষণেই সে বেরিয়ে পড়ল। এখন সবে সাড়ে ছ'টা। এখনও ক্লিনিক বন্ধ হয় নি। সে তার রক্ত পরীক্ষা করাবে। তার রক্তে রোগের বিষের পরিমাণ নির্ণয় করিয়ে সে ইঞ্জেক্‌শন নিয়ে তার রক্তকে সুস্থ ক'রে তুলবে। সে হবে নূতন মানুষ। প্রথমে সে তার রক্ত দেবে আহত মানুষের সেবায়। দীন, অসহায় মানুষ যারা আহত হবে, যাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পুরুষানুক্রমে সঞ্চয় করেছে যে রক্তের প্রাচুর্য্য—তাদের জন্য তারই কতকটা অংশ সে চিহ্নিত ক'রে দেবে।

(বাইশ)

একুশে ডিসেম্বর। প্রায় শেষ রাত্রি।

নেপী উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলে—দিদি! দিদি!

তার আগেই নীলার ঘুমন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়ুর স্পন্দন জেগেছে সাইরেনের শব্দে। সাইরেন বাজছে। নীলা উঠে বসল। সাইরেন বাজছে, উঁচু পর্দায় উঠে নীচু পর্দায় নামছে, আবার উঁচু পর্দায় উঠছে। মহানগরীর আত্মা তার মাথার উপর মরণলোকের শিকারী বাজপাখীর শব্দে মরণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিলম্বিত ছন্দে কাতর কান্না কাঁদছে, মধ্যে মধ্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। নীলার চোখে তখনও ঘুম-বিহ্বল দৃষ্টি।

নেপীর চোখ উত্তেজনায় জ্বল-জ্বল করছে। সে বললে—ওঠ, সাইরেন বাজছে—সাইরেন।

নীলার চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে সহজ হয়ে এসেছে। সে একটু হাসলে।

ঘরের বাইরে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন—বিজয়দা, তাঁর পিছনে ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর ঘাড়ে কম্বল—বগলে বিছানা, বিজয়দার এক হাতে ফার্স্ট-এডের বাক্স, অন্য হাতে কাগজ কলম। বোধ হয় এখনও ব'সে তিনি কিছু লিখছিলেন। বিজয়দা বললেন—নেমে এস।

নীলা উঠল এবার। হেসে বললে—কোথায় যাবেন?

—কোথায় আর, সিঁড়ির নীচে। মাথার ওপর তবু একটা ছাদ বেশী হবে।

নীলা বেরিয়ে এসে বললে—তা হ'লে ছাতাটি সুদ্ধ নিন। ওটা খুলে বসলে—মাথার ওপর আরও একটা আচ্ছাদন বেশী হবে।

বিজয়দা হেসে বললেন—ভাল বলেছ। ষষ্ঠীচরণ, কাল বড় টেবিলটা, যেটা জায়গার অভাবে ছাদে প'ড়ে আছে, ওটা সিঁড়ির তলায় পাতবে। দিব্যি আর একটা তলা বানানো যাবে।

সাইরেন থেমেছে।

হঠাৎ শব্দ উঠল—দুম্-দুম্-দুম্। দূরাগত বিস্ফোরণের শব্দ।

সিঁড়ির তলায় বেশ আমিরী চালে বিজয়দা আসর ক'রে বসলেন। নেপী স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে। ষষ্ঠী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে বসেছে। স্তব্ধ আসরে নীলাও স্তব্ধ হয়ে রইল। কান পেতে রয়েছে প্লেনের আওয়াজের জন্য, বিস্ফোরণের শব্দের জন্য।

বাড়ীটার ওপাশের অংশের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কে বলছে,—কাঁপছিস কেন, এই মণি, কাঁপছিস কেন? ব'স, ব'স।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কোন পুরুষ বললেন—বোধ করি, তিনি সংসারের অভিভাবক, কণ্ঠস্বরে তাঁর আদেশ এবং উপদেশের সুর—দুর্গা নাম জপ কর, দুর্গা নামে দুঃখ হরে, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। বল দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! জপ কর।

বিজয়দা বললেন—ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার থাকলে বড্ড ভাল হ'ত।

নীলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে—রাত্রি কত? ক'টা বেজেছে বলুন তো?

—সাইরেন বেজেছে তিনটে পঁচিশে। ক্ষিদের দোষ নেই। তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

হেসে নীলা বললে—কেন বলুন তো?

—নইলে ক'টা বেজেছে এ খবর জানতে চাচ্ছ কেন? ক্ষিদে পাওয়ার ন্যায়-অন্যায় বিচার করছ তো!

নীলা এবার সশব্দেই হেসে উঠল।

কার ইতিমধ্যে নাক ডাকছে। আর কার, বিজয়দা টর্চটা জ্বেলে ষষ্ঠীর মুখের উপর ফেললেন। ষষ্ঠীরই নাক ডাকছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে বেশ ঘুমচ্ছে।

বিজয়দা হেসে টর্চের আলো বন্ধ ক'রে বললেন—কর্তৃপক্ষ বলেছেন এ সময় গ্রামোফোন বাজাতে। গ্রামোফোন যখন নেই—তখন তুমিই একখানা গান শুনিয়ে দাও না নীলা।

নীলা হাসলে—গান ?

—কিংবা ভূতের গল্প ! কানাইটা আপিসে. সে ভূতের গল্প বলে ভাল।

ওপাশের বাড়ীতে অকস্মাৎ সশঙ্কিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল।—"মণি, মণি !

—এ কি ?

—কি ?

—মণি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—আলো ! আলোটা জ্বালো।

—টর্চ—টর্চ ! সুইচের আলো জ্বেলো না।

—মণি ! মণি !

—জল ! জলের ঘটিটা কই ?

—আনা হয় নি তো ? জানি, আমি জানি এইরকম একটা কিছু হবে। ইডিয়ট রাস্কেলের দল সব। সব চেয়ে ইডিয়ট হচ্ছে ওই মাগীটা।

বোধ হয় ওই—'মাগী' ব'লে সম্বোধিতা মহিলাটিই মৃদু করুণ স্বরে ডাকছেন—মণি—মণি !

—এই জল এনেছি।

—মা, সর, সর, দেখি। জলের ছিটে দি মুখে।

বিজয়দা টর্চ জ্বেলে স্মেলিং সল্টের শিশিটা বের ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—নীলা, তুমিও এস।

ঠিক এই মুহূর্তেই বেজে উঠল অল ক্লিয়ার সাইরেন-সঙ্কেত। একটানা দীর্ঘ শব্দ। শহরটা যেন পরম আশ্বাসে বলছে—আঃ !

ওপাশের কথা শোনা গেল—ভয় নেই, ওই দেখ, মণি চোখ মেলেছে। ভয় নেই মণি, অল ক্লিয়ার বেজে গেল। ভয় নেই। মণি!

বিজয়দা এবার হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সুরেশবাবু!. সুরেশবাবু!

ওপাশ থেকে সাড়া এল—আজ্ঞে?

—কি হ'ল মণির? সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে?

—না না না। ছেলেমানুষ—ভয় পেয়েছিল, আর কিছু না, ভয় পেয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে গেছে!

নীলা প্রশ্ন করলে—ছোট ছেলে বুঝি?

বিজয়দা বললেন—তুমি তো আজ এসেছ, কয়েকদিন থাকলে মণিচন্দ্রের পরিচয় পাবে। পাঁচ বছরের বাঙালী বীর। যত দুরন্ত—তত ভীতু। বাইরে থেকে এসে—মধ্যে মধ্যে আমাকে বা ষষ্ঠীকে ডাকে—সিঁড়িতে দাঁড়াতে হয়। বিজয়দা হাসতে লাগলেন।

নীলার মনে প'ড়ে গেল—তার বড় ভাইপোটির কথা। তার বয়স ছ'বৎসর। সে দুরন্ত নয়, শান্ত এবং ভীতু। তার বড়দাদা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ, বউদিদিটি রুগ্ন দুর্ব্বল, ছেলেটিও তাই। শরীরেও দুর্ব্বল, প্রকৃতিতেও অত্যন্ত ভীতু। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মনে পড়ল তার বাবার সেই নিষ্ঠুর তিরস্কারের মর্ম্মান্তিক আঘাতের স্মৃতি। তার শিক্ষা, তার স্বভাব, তার প্রকৃতিকে জেনেও তিনি তাকে অন্যায়-ভাবে অবিশ্বাস ক'রে অতি নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছেন; কন্যা হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম ন্যায়ধর্ম্মসম্মত যে মর্য্যাদা তার আছে পিতার কাছে, পিতৃত্বের দাম্ভিকতায়, দুর্ব্বল চিত্তের আশঙ্কায় তিনি তার সে মর্য্যাদাকে পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই তীব্র অন্তর্বেদনায়, ক্ষুব্ধ অভিমানে এ সময় পর্য্যন্ত একবারের জন্যও সে বাড়ীর কথা মনে করতে চায় নি। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে পাশের বাড়ীর ওই ছেলেটির কথা শুনে তার মনের মধ্যে

জেগে উঠল—মায়ায় মমতায় গভীরভাবে অভিষিক্ত আশঙ্কা! হয়তো এদের এই ছেলেটির মত—।

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—হঠাৎ থমকে দাঁড়ালে কেন নীলা? এই তো চারটে বাজে। যাও শুয়ে পড়, এখনও রাত্রি আছে।

বিছানায় শুয়েও তার ঘুম এল না। বার বার মনে হচ্ছে বাড়ীর কথা। ভাইপোটির কথা, বাবার কথা, মায়ের কথা, শান্ত নিরীহ দাদাটির কথা, রুগ্ন বউদিদিটির কথা নানাভাবে মনে পড়ছে। আকস্মিক উত্তেজনার আশঙ্কায় কে কখন্ কেমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেই সব কথা মনে ক'রে সে উত্তরোত্তর চঞ্চল অধীর হয়ে উঠতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জলে ভ'রে এল; চোখের জল মুছে সে মৃদুস্বরে ডাকলে—নেপী!

নেপীর কোন উত্তর এল না। নেপী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বিজয়দাও ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়। নইলে নেপীর পরিবর্ত্তে তিনিই সাড়া দিতেন। যষ্ঠীর নাক-ডাকার শব্দ আসছে। পাশের বাড়ীতেও কারও কোন সাড়াশব্দ উঠছে না। আবার সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাল সকালেই সে বাড়ীতে একবার যাবে। নেপীকেও ধ'রে নিয়ে যাবে।

২২শে ডিসেম্বর সকালবেলায় সে যখন উঠল—তখন সাড়ে আটটা বাজে। অল ক্লিয়ারের পর অনেকক্ষণ তার ঘুম আসে নাই—তারপর একেবারে ভোরের মুখেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক চিন্তার পর ঐ সময়টায় মন তার আশ্বাসের শান্তি পেয়েছিল। সে ভাবছিল বাড়ীর কথা। মনের অনেক অভিমান অনেক ক্ষোভের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে তার মনে হয়েছিল বাড়ীতে ফিরে গেলেই এই অশান্তিপূর্ণ

বিচ্ছেদের অবসান হবে। এই প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশায় তার মন শান্ত হতেই ধীরে ধীরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বিজয়দা বারান্দায় চায়ের আসর জমিয়ে বসেছেন, কানাইবাবু পর্য্যন্ত নাইট ডিউটি সেরে আপিস থেকে ফিরেছেন। বিজয়দা তাকে কিছু প'ড়ে শোনাচ্ছেন। এই কাগজগুলোই কাল রাত্রে সাইরেনের সময়েও তাঁর হাতে ছিল। বোধ হয় বিজয়দা ওটা সারারাত্রি ধ'রেই লিখেছেন। ও-ঘরে ষষ্ঠীর খন্তা নাড়ার শব্দ উঠছে, রান্না পর্য্যন্ত চেপে গেছে। সে স্বভাবতই লজ্জিত হ'ল। পাঠ্যজীবন থেকে তার চাকরী। জীবনের বিগত পরশু পর্য্যন্তও সে ভোরে উঠে মায়ের গৃহকর্ম্মে সাহায্য করেছে। চাকরী থেকে ফিরেও অনেক কাজ করেছে। সেলাই-ফোঁড় বা ঝাড়া-মোছা কি ঘরসাজানো ইত্যাদির মত সৌখীন কাজ নয়, রীতিমত রান্নাশালার কাজ করেছে। দেরি ক'রে উঠলে আজও তার লজ্জা হয়। তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল। ফিরে আসতেই বিজয়দা তাকে সম্ভাষণ ক'রে বললেন—সুপ্রভাত! এস, মজলিসে ব'স। একটা প্রবন্ধ লিখেছি কাল রাত্রে, কানাইকে প'ড়ে শোনাচ্ছি। তুমি এখন শেষটাই শোন। পরে গোড়াটা প'ড়ে নেবে।

নীলা বললে—পড়ুন।

রাজনীতির প্রবন্ধ। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবের 'সাম্রাজ্য বিসর্জ্জন দেবার জন্য আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি নাই'—এই উক্তির সমালোচনা করেছেন বিজয়দা।

পড়া শেষ হ'লে নীলা প্রশ্ন করলে—নেপী কই?

—নেপী? বিজয়দা হাসলেন—ভোরবেলাতেই সে বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে? নীলা ক্ষুণ্ণ হ'ল।

—ফিরবে শীগ্‌গির। জনসেবা-সমিতির আপিসে গেছে, কোথায় কি হচ্ছে খবর জানবার জন্যে। শীগ্‌গির ফিরবে। আমায় ব'লে গেছে,

কানাইকে আটকে রাখতে। কানাইকে নিয়ে যাবে Blood Bank-এ, রক্তদান করবে। তুমিও নাকি যাবে এবং রক্তদান করবে শুনলাম?

নীলা শুষ্ক মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

বিজয়দা বললেন—বস', দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চা খাও। কানাই, দে তো টি-পটটা এগিয়ে।

কানাই আপন মনে কিছু ভাবছিল। বিজয়দার কথায় সচেতন হয়ে সে বললে—এই যে আমি ঢেলে দিচ্ছি।

নীলা বললে—না-না, আমি তৈরী করে নিচ্ছি।

বিজয়দা হেসে প্রশ্ন করলেন—কানাইচন্দ্র, তুমি রক্ত দান করছ না?

কানাই বিজয়দার মুখের দিকে তাকাল।

নীলার মনে হ'ল বিজয়দার প্রশ্নের মধ্যে ব্যঙ্গের শ্লেষ রয়েছে। চা ঢেলে শেষ করে কাপটি তুলে নিয়ে সে বললে—আপনি কি এটা অন্যায় কিংবা হাস্যকর মনে করেন বিজয়দা?

—না। আমি নিজেই যে আগে দিয়েছি। তবে কি জান—Blood Bank-এর কথায় আমার মনে পড়ে আমরা একটা Bank করেছিলাম এককালে সেই Bank-এর কথা। যারা টাকা দিয়েছিল, তাদের পঞ্চাশ টাকার বেশী কারুর আয় ছিল না। ফলে Bankটা গজাতে গজাতে ক্যাপিটালিস্টরা ফেল পড়ে গেল। অর্দ্ধাশনের দেশের মানুষ; চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ—হলদে, রক্তহীন। Blood Bankএর কথা ভেবে যখন doner খুঁজি তখন ওই পঞ্চাশটাকা আয়ের capitalistদের কথাই মনে পড়ে আমার। বিজয়দা হাসতে লাগলেন। আবার অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে বললেন—তবু বাঁচতেও হবে, বাঁচাতেও হবে মানুষকে। নেপীকে যখন দেখি—তখন মনে হয় আবার একবার রক্ত দিয়ে আসি Bank-এ এবং চিহ্নিত ক'রে দিয়ে আসি যে, নেপী যদি

কখনও কোন রকমে আহত হয়—তবে আমার এ রক্তদান তার জন্তে করা রইল।

কানাই উঠে পড়ল। বললে শরীরটা ভাল নয় বিজয়দা, আমি উঠলাম। স্নান করে শুয়ে পড়ব। তার মন গত রাত্রি থেকেই উদ্‌গ্রীব এবং চঞ্চল হয়ে রয়েছে; সে গত সন্ধ্যাতেই তার সেই পিতৃবন্ধু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল—তাঁর পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে এসেছে। তারই ফলাফল জানবার জন্যই তার এ উদ্‌গ্রীব অধীরতা। কল্পনা করতে গিয়ে সে কল্পনা করতে পারে না। তার রক্তের মধ্যে হয় তো রক্তকণিকার পরিমাণের চেয়েও বিষশক্তির পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে। তারই মধ্যেই তো এ বিষের ক্রিয়া প্রবলতমভাবে বর্ত্তমান—সুখময় চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলের—বড় ছেলের—বড় ছেলে সে। তিন পুরুষের সম্ভোগলালসার ফলে অর্জ্জন করা ব্যাধির বিষশক্তি তার মধ্যেই যে প্রবল তেজে বয়ে' যাচ্ছে।

একে একে বেরিয়ে গেল নীলা—বিজয়দা। নেপী এখনও ফেরে নি। শুয়েও কানাইয়ের ঘুম আসছিল না। তন্দ্রার মধ্যে, রক্তপরীক্ষার ফলাফলের উৎকণ্ঠিত কল্পনা বারবার তার ঘুম ভেঙে দিচ্ছিল। একবার দেখলে, ম্লানমুখে ডাক্তার তার হাতে তুলে দিচ্ছেন Blood report; বলছেন—টেন বাই টেন। কানাই শিউরে জেগে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবার দেখলে নীলা তার Blood reportটা পড়ছে। কানাই চীৎকার করে উঠল—না—না—না! অর্থাৎ পড়বেন না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

আবারও যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। এমন সময় ডাকলে ষষ্ঠী।—দাদাবাবু!

—কি?

—একজন লোক এসেছে একটা চিঠি নিয়ে। বাবুকে কিংবা আপনাকে খুঁজছে।

লোকটা একজন, হিন্দুস্থানী। গুণদা-দাদার বাড়ীর সামনে থাকে; সে চিঠি নিয়ে এসেছে। গুণদা-দাদা লিখেছেন—"বাড়ী সার্চ্চ হচ্ছে। বোধ হয় পুলিশ এ্যারেস্ট করবে—ইণ্ডিয়া ডিফেন্স। খবরটা জানালাম।"

কানাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

গুণদাবাবুর বাড়ীর দোরে সে যখন পৌছল—তখন গুণদা-দা পুলিশের গাড়ীতে উঠেছেন। এক গুণদা দা নয়—গাড়ীতে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্ম্মীকে দেখতে পেলে কানাই। গুণদা-দা তার দিকে চেয়ে একবার হাসলেন—তারপর উঠে পড়লেন গাড়ীতে।

কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গুণদা-দা এককালের প্রচণ্ড শক্তিমান্ বিপ্লবী কর্ম্মী। কিন্তু ইদানীং বিশেষ ক'রে আগস্ট মুভমেণ্টের পর বেদনাহত অন্তরে স্তব্ধ হয়ে দ্রষ্টার মত বসেছিলেন। কিন্তু তবুও পুলিশ তাঁর গত ইতিহাসের কথা এবং তাঁর মতবাদের কথা স্মরণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার না করে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। ওই গাড়ীর মধ্যে আরও যাদের কানাই দেখেছে—তারাও ওই গুণদা-দাদার শ্রেণীর মানুষ। বাংলার মাটির শ্রেষ্ঠ ফুল।

উপরে জানালায় তার দৃষ্টি পড়ল। দেখলে গুণদা-দাদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্ত্তির মত!—মাথার অবগুণ্ঠন খসে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই;—চোখের দৃষ্টি স্থির নিষ্পলক—কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু বেদনা বা হতাশা নাই;—নিষ্ঠুর কঠোর দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রয়েছেন।

হিন্দুস্থানীটি গুণদা-দাদার দ্বারা উপকৃত; দাদার বাড়ীর সামনেই পানের দোকান করে।

সে-ই কানাইকে নিয়ে গেল ভিতরে।

বউদি ফিরে দাঁড়ালেন—মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বললেন—আপনি কানাইবাবু? আপনার কথা উনি বলেছেন আমার কাছে।

কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

বউদি বললেন—এই চিঠিখানা তিনি দিয়ে গেছেন—আপিসে দেবার জন্যে। আপনি বা বিজয়ঠাকুপোর হাত দিয়ে পাঠাতে বলেছেন।

কানাই চিঠিখানা নিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বিজয়দাকে নিয়ে ওবেলায় কি কাল সকালে আসব।

বউদি বললেন—চিঠিখানা আপিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার।

এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর কানাই আর দাঁড়ালে না। সে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। নীচে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলে—বউদি ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক সেই ভ্রুক্ষেপহীন নিষ্ঠুর দৃষ্টি আবার তাঁর চোখে ফিরে এসেছে।

কানাইয়ের মনের মধ্যে চকিতের মত ভেসে গেল—গুণদা-দাদা যে গাড়ীতে উঠলেন—সেই গাড়ীর ভিতরের আরও কয়েকজনের মুখ। তাঁদের বাড়ীর খোলা জানালাতেও এই বউদিদির মতই চেয়ে রয়েছে—তাঁদের মা—বোন—স্ত্রী। তাঁদের চোখেও এমনই দৃষ্টি—নিষ্ঠুর নিষ্করুণ। একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

আপিসে খবর এবং চিঠিখানা দিয়ে সে তখনই ফিরিল। তার মন অত্যন্ত চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছে। ট্রামখানা পথে এক জায়গায় দাঁড়াতেই হঠাৎ সে নেমে পড়ল।

সামনেই তার পিতৃবন্ধু ডাক্তারের ক্লিনিক।

ব্লাড একজামিনেশন রিপোর্ট। আজই রিপোর্ট পাবার কথা।

সন্ধ্যার দিকে নীলা আপিস থেকে ফিরছিল।

আজ নাকি প্যাম্ফলেট পড়েছে। সিঙ্গাপুরে ডুবিয়ে দেওয়া যুদ্ধ-জাহাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ছবি নাকি তাতে আঁকা আছে। অনেকে বলছে—জাপানের সম্রাট এবং তোজোর ছবি আছে: কেউ বলছে—ম্রিয়মাণ চার্চিল সাহেবের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা আছে। দেখেনি কেউ, তবে সকলেই যার যার কাছে শুনেছে—তারা স্বচক্ষে দেখেছে। যে ছবিই থাক্—কথা এক,—'Keep away from Calcutta'—'কলকাতা থেকে সরে যাও।'

জোর গুজব—'বড়দিনের রাত্রি থেকে নিউইয়র্স-ডে পর্য্যন্ত কলকাতা তারা সমভূমি ক'রে দেবে।' মানুষের মনে গোপনে গোপনে আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছে। আতঙ্কিত মানুষ প্রতি কথায় বিশ্বাস ক'রে পালাবার যুক্তিকে প্রবল করে নিচ্ছে।

হাওড়ায় শিয়ালদহে বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়েছে। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের স্থান নেই। ছেলে-মেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে চাপ বেঁধে বসে আছে পতঙ্গের মত। কোলাপ্সিবল্ গেটে রেল-কর্ম্মচারীর বদলে ইউরোপীয় সৈনিক মোতায়েন হয়েছে। কুলিদের দর পয়সায় আনায় কুলুচ্ছে না, পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত। ধনীদের রাশীকৃত মাল ঢুকে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ থেকে কুলি-কামিনের এক দশা। পড়ে আছে। ট্রেণের পর ট্রেণ চলে যাচ্ছে। কতক ঢুকছে মরীয়ার মত; বাকী সব পড়ে থাকছে। চীৎকার করছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসছে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, আকণ্ঠ যাত্রী বোঝাই মোটর-বাস। হাওড়া ব্রীজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। দেশোয়ালীরা দেশে পালাচ্ছে; মারোয়াড়ীরা চলেছে মারোয়াড়; ধনীরা চলেছে মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, বেনারস; কেরাণীরা পালাচ্ছে নবদ্বীপ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, বোলপুর, নলহাটি। নিজের বাড়ীতে, ভাড়াটে বাসায় সাজানো

সংসার, আসবাবপত্র—মানুষের যথাসর্ব্বস্ব পড়ে রইল—মানুষ পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। বনে আগুন লাগে, জানোয়ার পালায়—পাখী পালায়—পতঙ্গ পালায়; মানুষ আজ পালাচ্ছে সেই রকম ভাবে; জীবনের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে মানুষ। যারা এখনও পালায়নি—তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অধীর হয়ে অন্তরের ভয়কে বাড়িয়ে তুলছে, যে ভয়ে তারাও সর্ব্বমানবীয় সংস্কৃতিকে লঙ্ঘন করে জ্ঞানশূন্যের মত ছুটতে পারবে, কোন সঙ্কোচ বোধ করবে না। আপিস বন্ধ হয়েছে ঠিক চারটায়। নিম্নভূমি-অভিমুখী জলস্রোতের মত মানুষ দ্রুতগতিতে বাড়ী ফিরছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে, আকাশে এখন অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে আসছে, পূর্ব্বদিকের আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

ট্রাম থেকে নেমে নীলার মনে পড়ল—আজ সে ফেরবার পথে বাড়ীর খবর জেনে আসবে মনে করেছিল। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে।

বিজয়দা'র বাসায় ষষ্ঠী ছাড়া কেউ ছিল না। বিজয়দা' আপিসে গেছেন। কানাইবাবুও বেরিয়েছেন খাওয়ার পর—এখনও ফেরেননি। কিন্তু বিজয়দা'র কাছ থেকে একজন আপিসের পিওন একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। কানাইবাবুর নামে একখানা খোলা চিঠি। কানাইবাবু নাই। ষষ্ঠী চিঠিখানা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। তার বাবু কানাই-বাবুকে অবিলম্বে চান—অথচ কানাইবাবু নাই—এখন সে করে কি? নীলাকে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—দেখুন তো দিদিমণি, কি লিখেছেন বাবু?

একবার দ্বিধা হ'ল তার, কিন্তু চিঠি দেখে দ্বিধা পরিত্যাগ করে সে চিঠিখানা পড়লে। বিজয়দা কানাইবাবুকে অবিলম্বে আপিসে যেতে লিখেছেন। আজ সকালেই রাত্রিকালের সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান

সম্পাদক গুণদাবাবু ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাত্রির সম্পাদকীয় বিভাগের ব্যবস্থার প্রয়োজনে কানাইকে ডেকেছেন। গুণদাবাবু গ্রেপ্তারের সময়ে কর্ত্তব্যবোধে কাগজের কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে গেছেন—তার প্রত্যেক সহকর্ম্মীর কর্ম্মক্ষমতার কথা; তাতে তিনি কানাইয়ের অনুবাদশক্তির এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ পনেরো দিনের জন্য কানাইয়ের হাতে ভার দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। ফল সন্তোষজনক হ'লে কানাইকেই ওই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে।

নীলা একটা শ্লিপে লিখে দিলে কানাইবাবুর অনুপস্থিতির কথা এবং তিনি ফিরলেই চিঠি দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেবে—একথাও লিখে দিলে।

ষষ্ঠী বললে—অনেক দেরি হয়েছে ফিরতে। চা-খাবার তা হ'লে তো খেয়ে এসেছো দিদিমণি?

ঠিক এই সময়েই এসে উপস্থিত হ'ল নেপী। মুখে চোখে ক্লান্তির ছাপ—মাথার চুল উড়ছে—দেখলেই বোঝা যায় সমস্তদিন স্নান হয় নাই। খাওয়াও বোধহয় হয় নাই।

নীলা নেপীর দিকে তাকিয়ে বললে—না। আমাদের দুজনেরই চা-জলখাবার খাওয়া হয়নি।

—এই মুস্কিল হ'ল। উনানে যে ভাত ফুটছে গো।

—তবে কিনে আন দোকান থেকে

সে একটি সিকি বের করে দিলে। দু'আনার চা, দু'আনার খাবার।

কাপড় বদলাবার এবং মুখ-হাত ধোবার জন্য সে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল। নেপী তখনও হাত মুখ ধোয় নাই। কানাইয়ের চিঠিখানা নাড়া-চাড়া করছিল।

নীলা বললে—তুই বসে রয়েছিস নেপী? হাত মুখ ধুসনি?

নেপী বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—গুণদা-দাকে arrest করে নিয়ে গেল?

নীলা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলে না। সে চুপ করে রইল।

নেপী বললে—গুণদা-দা কিন্তু কোন politics-এই ছিলেন না আজকাল।

নীলা এবার বললে—তুই হাত মুখ ধুয়ে আয় ভাই। ষষ্ঠী চা কিনে আনছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর গরম করা যাবে না। উনোনে ভাত ফুটছে। দাঁড়া, দেখি ভাতে জল লাগবে কিনা দেখি।

জলের প্রয়োজন ছিল। জল ঢেলে দিয়ে হাঁড়ির গায়ের ফেনের ধারাগুলি মুছে দিলে। তার চোখে পড়ল রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্নতা। অথচ কাল সকালে সে যখন খেতে বসেছিল এই ঘরে—তখন লক্ষ্য করেছিল রান্নাঘরটি পরিচ্ছন্নতায় তক তক করছে। গীতা তাকে পরিবেষণ করেছিল। তখন গীতা ছিল। সে পরিচ্ছন্নতা গীতার হাতের পরিমার্জ্জনার ফল। গীতা গেছে কাল—আর আজ ষষ্ঠী অপরিচ্ছন্নতায় চারিদিক একেবারে ভরিয়ে তুলেছে। সে ঠিক করলে চা খেয়ে রান্নাঘরটি পরিষ্কার করে ফেলবে। সিঁড়িতে ষষ্ঠীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাত ধুয়ে সে এ ঘরে এসে বসল।

ষষ্ঠী চা ঢেলে খাবার দিলে। নীলা বললে—রান্নাঘরটা কি নোংরা করে রেখেছ ষষ্ঠী! অথচ গীতা মাত্র কাল গেছে। সে কেমন পরিষ্কার রেখেছিল বল তো?

ষষ্ঠী বললে—গীতা-দিদি এসেছিল দিদিমণি। তারপর হেসে বললে—আহা, ছেলেমানুষ—মন টিকছে না আর কি—

—কানাইবাবু বুঝি তার সঙ্গেই গেছেন?

—ওই! কানাইবাবু যে খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছে গো! বিকেলে তাকে

পাবে কোথা? বাবুও ছিল না। গীতা-দিদি ফিরে গেল। আর একটি মেয়ে, সেও নার্স বটে,—তাকেই সঙ্গে করে এসেছিল।

নেপী এসে বসল।

নীলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—সেই সায়েব দু'জনের সঙ্গে তোর আর দেখা হয়নি নেপী?

—না। তবে বিকেলে এসপ্ল্যানেডের ওখানে গেলে দেখা হবে বোধহয়। সেদিন তো তুমি তাড়াতাড়ি চলে এলে—ওদেরও ঠিকানা নেওয়া হ'ল না, আমাদের ঠিকানাও দেওয়া হ'ল না।

নীলা একটু চুপ করে থেকে কানাইয়ের চিঠিখানা তুলে নিলে। আবার একবার বললে—কানাইবাবু একটা lift পেয়ে যাবেন।

নেপী বললে—কানাইদা কেন যে এমন মনমরা হয়ে থাকে কে জানে? অথচ এমন powerful লোক—কেমন বলে বল' তো?

নীলা হাসলে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও নীলা কানাইয়ের সহপাঠিনী। কত হাসি-রসিকতা তাকে নিয়ে তাদের সহপাঠিনীদের মধ্যে হয়েছে—সে নেপী জানে না। গীতাকে নিয়ে কানাইয়ের পরিণতি কেউ কল্পনাও করেনি। এইবার কানাইয়ের মাইনে বাড়বে—; হঠাৎ মধ্যপথে চিন্তায় তার ছেদ পড়ে পড়ে গেল, গতকালকার কানাইয়ের একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। সে নেপীকে প্রশ্ন করলে—হ্যাঁরে, কানাইবাবুদের বাড়ীতে গিয়েছিস তুই?

—উঃ প্রকাণ্ড বাড়ী। কিন্তু এখন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এককালে কানাইদার ঠাকুরদা'রা একেবারে খাঁটি বুর্জোয়া ছিল।

—কানাইবাবুর বাবা কি মা পাগল নাকি?

—পাগল নয়—তবু যেন কেমন এক রকম। ওদের বাড়ীর মেয়েরা যা সুন্দর দিদি, কি বলব। কানাইদা'র চেহারা কত সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর। আর যা আব্রু, বাপ্‌রে, বাপ্‌রে!

নীলা অকারণে হাসতে আরম্ভ করলে।

নেপী বললে—হাসছ কেন ?

হাসতে হাসতেই নীলা বললে—বোরখা পরে ?

—বোরখা ?

—হ্যাঁ, কানাইবাবুদের বাড়ীর মেয়েরা বোরখা পরে ?

ষষ্ঠী এসে বললে—দিদিমণি, কানাইবাবু এল কই গো ? আপিস যাবে ! খাবার তৈরী।

নীলা বললে—কি জানি। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের টাইমপিসটার দিকে চাইলে। তাই তো ! রাত্রি নটা বাজছে যে ! কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? সমস্ত দিন খান নাই। কি হ'ল তাঁর ?

নেপী উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে গিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সকলে শুয়েছিল। কানাই এখনও ফেরে নি। বিজয়দাদাও না।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। নীলা উঠে বসল বিছানার উপর।—নেপী ! নেপী !

নেপী অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

নীলা বেরিয়ে এল বারান্দায়।

বারান্দা থেকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলে—কে ? কানাইবাবু ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিলেন ? আপনি যাননি ? আপিস থেকে লোক এসেছিল। গুণদা-দা'কে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। দাঁড়ান যাই।

সে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির মধ্যপথ পর্য্যন্ত এসেছে—এমন সময় আতঙ্কিত তীব্র সাইরেন-ধ্বনিতে সমগ্র মহানগরাটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। নীলা মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়াল—তারপরই ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিলে। কিন্তু দরজার সম্মুখটা

শূন্য। চন্দ্রালোকিত রাজপথ, সেখানেও কানাইকে দেখা গেল না। নীলা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল—সেখান থেকে নেমে পড়ল পথে—ডাকলে—কানাইবাবু! কানাইবাবু!

কোন উত্তর এল না, কানাইকেও দেখা গেল না। সাইরেন তখনও বেজে চলেছে। শীতের রাত্রি—সকল বাড়ীরই প্রায় জানালা-দরজা বন্ধ—একটা দু'টো জানালা যা খোলা ছিল—সেগুলি সশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; খড়খড়ির মধ্য দিয়ে আলোর আভাগুলি দেখা যাচ্ছিল—সেগুলি নিভে যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই। নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার ডাকলে—কানাইবাবু!

ভিতর থেকে ডাকলে নেপী—সাইরেনের শব্দে ঘুম ভেঙে সে নেমে এসেছে বোধ হয়, সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকলে—দিদি!

ভিতরের দিকে চেয়ে নীলা বললে—কানাইবাবুকে পাচ্ছি না নেপী! এসেই কোথায় চলে গেলেন!

নেপী দরজার মুখে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কাউকে দেখা গেল না, চীৎকার ক'রে সে ডাকলে—কানাই-দা, কানাই-দা!

* * * * *

কানাই অত্যন্ত দ্রুতপদেই চলেছিল পথ দিয়ে। সাইরেন বেজে উঠতেই তার উত্তেজিত স্নায়ুশিরাগুলি গভীরতর উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠেছিল—যেন—উন্মত্ত টঙ্কারে। সে বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল সাময়িক ভাবে। জাপানী প্লেন আসছে—মৃত্যুগর্ভ বোমা নিয়ে,—সেই বোমা কোথায় পড়বে—সে তারই সন্ধানে চলেছিল—সেইখানে সে মাথা পেতে দাঁড়াবে। সন্ধ্যার পর থেকেই এমনি উন্মত্ত মানসিকতার মধ্যে একা বসে ছিল একটা পার্কে। সেখান থেকে গিয়েছিল—গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে সে গিয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্য।

আপিস থেকে ফিরবার পথে—সেই—নেমে পড়েছিল পিতৃবন্ধু ডাক্তারটির ক্লিনিকে। তার রক্তপরীক্ষার ফলাফল জানবার অধীর উৎকণ্ঠায় আর সে বাড়ী ফিরতে পারে নাই। বৈকাল ৬টায় রিপোর্ট দেবার নির্দ্দিষ্ট সময়। কানাই ট্রামে বারকয়েক উদ্দেশ্যহীনভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোরাঘুরি ক'রে—সাড়ে তিনটের সময় আবার সেখানে গিয়েছিল। ডাক্তার একটু হেসে বলেছিলেন—এখনও কিছুক্ষণ দেরি আছে; ব'স—অপেক্ষা কর।

সে নীরবে ঐ ভীষণ ঘৃণিত ব্যাধি সংক্রান্ত একখানা ডাক্তারী বই টেনে নিয়ে বসেছিল। তার হাত কাঁপছিল—সে পড়ছিল বংশানুক্রমিক রক্তসঞ্চারিত এই ব্যাধি-বিষের পরিণতির কথা। উঃ, কি না হতে পারে! সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে, স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে পারে, পক্ষাঘাত, উন্মত্ততা—সব হ'তে পারে। সুখময় চক্রবর্ত্তীর বংশের তিন পুরুষের তরুণ বিষশক্তি তার রক্তকে ছেয়ে রেখেছে।

ডাক্তারটি বললেন—তুমি Science student, তুমি এ প্রয়োজনীয়তাটা বুঝেছ—I am glad; তোমার বাবা স্কুলে আমার class-friend ছিলেন, কতবার ছেলেবেলা তোমাদের বাড়ী গেছি। তখন তোমার কাকা-পিসিমারা খুব ছোট। রোগা ক্ষয়া চেহারা দেখে মায়া হ'ত। ছোটকর্ত্তা, তোমার বাবার ছোটকাকা, হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন। লোকে বলত—চক্রবর্ত্তী মশায়ের পূর্ব্বজন্মের অভিসম্পাত। তারকনাথে ধর্ণা দিয়ে নাকি ঐ কথাটা জানা গেছে। তারপর ডাক্তার হয়ে যখন তোমার পিতামহের শেষ সময়ে চিকিৎসা করলাম—ডাক্তার Bose-এর assistant হিসাবে, তখন সব বুঝলাম। তোমার বাবার তখন দাঁত পড়তে আরম্ভ হয়েছে। তোমার বয়স তখন সবে বাইশ তেইশ। বললাম—রক্ত পরীক্ষা করাও। কথাটা শুনে বললে—হুঁ,

তা হ'লে বাবার রক্তের দোষেই আমার ব্যামোটা হয়েছিল। রক্ত পরীক্ষা করালে, কিন্তু injection নিলে না ভয়ে, সালসা খেতে আরম্ভ করলে। তুমি ঠিক করেছ। রক্তে যে দোষ আছে—তাকে পরিশুদ্ধ করে নাও। Be a new man, জগতে সুস্থ রক্তধারার বংশ স্থাপন করে যাও।

কানাই স্তব্ধ হয়েই বসে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল। 'জগতে সুস্থ রক্তধারার বংশ স্থাপন করে যাও।' ব্যাধিহীন রক্ত কি মানুষ থাকতে দেবে? বৈষম্যপীড়িত মানবসমাজের মূল ব্যাধি যে ক্ষুধা। উদরের ক্ষুধা—রক্তমাংসের ক্ষুধা। যাদের উদরের ক্ষুধা নাই—ক্ষুধা মিটিয়েও যাদের প্রচুর আছে—তারা রক্ত-মাংসের ক্ষুধার বিলাসে—পেটের ক্ষুধায় পীড়িত মানবীদের ক্রয় ক'রে তাদের মধ্যে অবাধ ব্যাভিচারে এই বিষের সৃষ্টি করেছে এবং করছে; উদরান্নপীড়িত মানুষ বঞ্চনায়—অশিক্ষায়—অসুস্থ জৈবপ্রবৃত্তিতে এই বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে—অন্ধকারচারী সরীসৃপের মত। তবু সেকালে যখন সভ্যতা বা সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, পরলোকের মোহ ছিল, যখন সমাজ পার হয়নি সামন্ত-তান্ত্রিক যুগ, তখনও রাজার ছেলে গৃহত্যাগ করে নির্ব্বাণ অন্বেষণ করেছে, রাজা সর্ব্বস্ব দান করে চীবরবস্ত্র পরিধান করেছে। এই সেদিন পর্য্যন্তও এদেশে সমাজে কবি, নেতা, ধর্ম্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন ওই শ্রেণী থেকে। কিন্তু তারপর বণিক্‌প্রধান সমাজে সে সবের কিছু অবশিষ্ট নাই। তারা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ে না—বিক্রী করে; মন্দিরে পূজো করে না—ঠিকেদারী করে; স্বর্গে যাবার কথা তারা ভাবেও না, কারণ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরীর কণ্ট্রাক্ট কোনদিন পাওয়া যাবে না।

ডাক্তার বললেন—আমার এক বন্ধু তাঁর মেয়ের জন্যে আমাকে তোমার কথা বলেছিলেন। He is a big man—তিনি ভাল ছেলে

চান। কিন্তু আমি একথা জেনে—তোমার বাবাকে কিছু বলতে পারিনি।

একজন সহকারী ডাক্তার Blood report নিয়ে এসে ডাক্তারকে দিলেন। Reportটার দিকে চেয়ে-দেখে—ডাক্তারের মুখে গভীর বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তিনি বললেন—strange! ঠিক হয়েছে তো? চল আমি দেখি।

কাগজখানা হাতে করেই তিনি উঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—নাঃ কানাই—তোমার Bloodএ কিছুই পাওয়া যায় নি। negative—এই নাও রিপোর্ট।

রক্তে কিছুই পাওয়া যায় নাই? নির্দোষ রক্ত? কলের পুতুলের মত হাত বাড়িয়ে সে রিপোর্টখানা পকেটে পূরে—পাংশু মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজা অতিক্রম করবার সময় ডাক্তারের অতি বিস্মিত কণ্ঠের অস্ফুট কথা তার কানে এল, strange!

Strange! strange! strange! কথাটা কানের কাছে বার বার বেজে উঠছিল। চক্রবর্ত্তীবংশের সন্তান সে—চক্রবর্ত্তীদের লালসা-বিলাসের অর্জ্জন করা বিষ তার রক্তে নেই। তার ভাইবোনদের অসুস্থতার মধ্যে সে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তার বাপ-কাকারা সে বিষের উপরেও সঞ্চয় করেছেন নূতন বিষ—সে ইতিহাস সে শুনেছে। চক্রবর্ত্তীদের রক্ত, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থিতে সংক্রামিত বিষ তার রক্তে নাই! strange! strange! strange!

তবে? তবে সে কি চক্রবর্ত্তী নয়?

(তেইশ)

পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপছিল! চোখের সম্মুখে শহরের ঘর-বাড়ী সব যেন দুলছে! এ কথা কাকে সে বলবে? সে গিয়ে বসেছিল

পার্কে। তারপর গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। আত্মহত্যা করবার কামনা বারবার তার মনে জেগে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সে আত্মসংবরণ করেছিল।

না-হোক সে চক্রবর্ত্তী! না-থাক তার কোন বংশপরিচয়! সে মানুষ, সে মানুষ! গোত্রহীন, উপাধিহীন—সে শুধু মানুষ। সে-ই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মনে পড়ল তার কর্ণের কথা—মনে পড়ল তার আর এক মহামানুষের কথা—আজ বাইশে ডিসেম্বর—আগামী পঁচিশে ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। তার মনে পড়ল একদিন সে নীলাকে বলেছিল—তার জীবনের গোপন কথা বলবে। এইতো তার জীবনের অকথিত সত্য—গোপন কথা—এই কথা নীলাকে বলে তাকে যাচাই ক'রে দেখলে কি হয়? সে দেখবে শ্যামবর্ণা মেয়েটি কতখানি প্রগতিশীলা; যে জাতি বিচার, বর্ণ-বিচার না করে বিদেশীয়দের সঙ্গে নিজের জীবন মেলাবার কল্পনা করতে পারে, যার জন্যে বাপ-মায়ের আশ্রয় পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারে—সে তার এই পরিচয় শুনে কি বলে—কেমন দৃষ্টিতে তার দিকে চায়, বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দেয় কিনা সে পরখ করে দেখবে!

সে উঠে এসেছিল। কিন্তু বাড়ীর দোরে কড়া নাড়তেই নীলার সাড়ায়—চকিতের মত মনের মধ্যে জেগে উঠল মর্ম্মান্তিক লজ্জাকর সংকোচ। নীলার সম্মুখে সে কি পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াবে? কেমন করে বলবে—? নীলা মুখ ফেরাবে! ঠিক এই মুহূর্ত্তেই বেজে উঠল সাইরেন।

জাপানী বমার-প্লেন আসছে—মৃত্যু বর্ষণ করতে। সে সেই উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে ছুটল।

চন্দ্রালোকিত মহানগরীর রাজপথ; পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আকাশ থেকে ধরিত্রীর বুক পর্য্যন্ত ঝলমল করছে তিথিতে আজ

পূর্ণিমা, তবুও উর্দ্ধলোক ঈষৎ অস্পষ্ট; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যশূন্য-লোকে কুয়াসার একটা শুভ্র আস্তরণ পড়েছে। কানাই প্লেনের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে পথ চলছিল; মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে চাইছিল—দ্রুত ধাবমান লাল-নীল-সাদা আলোকবিন্দুর সন্ধানে।

—কে? কে? কে আপনি?

তার পথ রোধ করে দাঁড়াল একজন এ-আর-পি।—কে আপনি?

কানাই দাঁড়াল। পর মুহূর্ত্তেই এ-আর-পি যুবকটি বলে উঠল—কানাইদা—আপনি?

—কে? কানাই প্রশ্ন করলে।

—আমি শম্ভু। চিনতে পারছেন না নাকি?

—শম্ভু? শম্ভু, জগু, বিশু, বিদ্যুতের দল! এই পাড়ারই ছেলে সব। কানাইকে তারা বড় শ্রদ্ধা করে—ভালোবাসে। ওরা সকলে এ-আর-পিতে কাজ নিয়েছে।

—কোথায় যাবেন? সাইরেন বেজে গেছে। আসুন, এইখানে আসুন। শম্ভু প্রায় জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

যেতে যেতেই কানাই প্রশ্ন করলে—কোথায়?

—এই যে আমাদের Assembly point—বড়দা রয়েছেন এখানে।

বড়দা—ওদের সকলেরই বড়দা,—কানাইয়ের বন্ধু।

কানাই এবার বললে—না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।

—না। সে হয় না। তা' ছাড়া আমি ছেড়ে দিলে এক্ষুনি আপনাকে অন্য লোকে আটকাবে। আসুন, ভেতরে আসুন। এই মুহূর্ত্তে হয়তো বম্বিং শুরু হয়ে যেতে পারে।

শম্ভু তাকে জোর করেই ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। ভেতরে ওদের বড়দা—নারায়ণ বোস—এই 'এরিয়া'র (area) স্টাফ অফিসার,

বসে ছিল। পরণে খাকীর পোষাক। বুকে পৈতের মত চামড়ার স্ট্র্যাপ—কোমরের বেল্টের সঙ্গে আঁটা। গম্ভীরভাবে সে বসে আছে।

সবিস্ময়ে নারায়ণ বললে—আপনি ?

শম্ভু বললে—উনি এই সময়ে ছুটে চলেছেন—বাড়ী যাবেন। আমি ধরে নিয়ে এলাম।

—বসুন। বসুন। এখন কোথায় যাবেন ?

ঠিক এই সময়ে বাইরে বেজে উঠল সাইক্লের ঘণ্টা। ভারী জুতোর শব্দ করতে করতে এসে মিলিটারী কায়দায় স্যালিউট করে দাঁড়াল একটি ছেলে। বোস প্রশ্ন করলে—এতক্ষণে আসছ ?

—একটু দেরি হয়ে গেছে। অপরাধ সে স্বীকার করলে।

—যাও। তৈরী হয়ে থাক—with your cycles। বোস বললে। ছেলেটি আবার স্যালিউট করে চলে গেল। ওরা সব মেসেঞ্জারের দল। টেলিফোন খারাপ হ'লে ওরাই ছুটবে এই বোমবর্ষণের মধ্যে সংবাদ বহন করে, সংবাদ সংগ্রহ করে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। এখন শহরের সমস্ত টেলিফোন বন্ধ, এ-আর-পি টেলিফোন কিন্তু সক্রিয়। বোস টেলিফোন তুলে ধরল।—Hallo! কে ?

—ওয়ার্ডেন নম্বর ফাইভ ?

—রিপোর্ট ?

—আপনার পোস্টে সব ঠিক আছে ?

—That's all right. টেলিফোন সে রেখে দিলে।

বাইরে দুটো বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল, সঙ্গে ভারী জুতোর শব্দ। বোস একটু চমকে উঠল—ডাকলে—কে ? একজন এসে স্যালিউট ক'রে বললে—আমরা সাইরেনের আগেই কাজে বেরিয়েছিলাম স্যার, ফিরে এলাম।

—Good.

সে বললে—রাস্তায় কতকগুলো বাতি নেভানো হয় নি, সেগুলো আমি আর জগু নিভিয়ে দিয়েছি।

—Good;—বোস উঠে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে, ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বোসের হাতে হাত মিলিয়ে সে আবার স্যালিউট করে বেরিয়ে গেল।

বোস ডাকলে—শম্ভু!

—বড়দা!

ফ্লাস্কে চা আছে, দুটো কাপে ঢেলে খাওয়াও না। কানাইবাবুকে আমাকে। কানাইবাবু একটু shocked হয়ে গেছেন।

শম্ভু তৎক্ষণাৎ বের করলে—দুটো কলাই করা মগ। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে—দু'জনের সামনে দিয়ে হেসে বললে—খান কানাইদা।

বোস হেসে বললে—আপনি তো সিগারেট খান না? নিজে সে একটা সিগারেট মুখে পুরলে। দেশলাইটা জ্বেলেই—চকিত হয়ে বললে—plane-এর শব্দ।

সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। শম্ভু বাইরে চলে গেল।

বোস চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—Yes, plane.

দুর আকাশের কোথাও শব্দ উঠেছে। ক্ষীণ ঘর্ঘর শব্দ।

—শুনছেন?

—হ্যাঁ।

শব্দ অতি দ্রুত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী হয়ে উঠল। বোস উত্তেজনায় একবার উঠে দাঁড়াল। কানাইও উঠল। দরজার মুখে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

—একখানা। খুব কাছে এসে গেছে।

সেই মুহূর্ত্তেই আকাশের বুকে বিদ্যুৎ-চমকের মত চকিত হয়ে উঠল এক ঝলক আলো।

বোস বললে—প্যারাচুট ফ্লেয়ার!

মুহূর্ত্তে শব্দ উঠল বিস্ফোরণের।

আবার ঝলকে উঠল আলো—আবার বিস্ফোরণের শব্দ। গম্ভীর কিন্তু মৃদু। বোস ডাকলে—শম্ভু!

আবার ঝলকে উঠল প্যারাচুট ফ্লেয়ার—আবার শব্দ।

শম্ভু উত্তর দিল—বড়দা!

কানাইয়ের শরীরের মধ্যে উত্তেজিত রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। এদের কাজের নেশা তাকেও যেন পেয়ে বসেছে।

সেই মুহূর্ত্তে ঝলকে উঠল—অত্যন্ত প্রখর আলোর ঝলক। চোখ ঝলসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড-ভয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত আকাশ-বাতাস বাড়ী-ঘর যেন থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। তিনজনেই চমকে উঠল।

কানাই বললে—হাই এক্সপ্লোসিভ্। প্লেন বোধ হয় মাথার ওপরে।

গুরুগম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ সত্যই যেন মাথার উপর! কানাই স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাইলে।

আবার আলো, আবার শব্দ। এবার মৃদু! প্লেনের শব্দ দূরে চলে যাচ্ছে।

বোস বললে—আজ বোধ হয় রিপোর্ট হবে শম্ভু।

শম্ভু বললে—মনে হচ্ছে!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বেজে উঠল টেলিফোন। বোস ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বললে—শম্ভু! টেলিফোনের রিসিভার সে তুলে নিলে—Hallo!

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। বোসের মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। চোখে তীব্র দীপ্ত দৃষ্টি!

—Any report ?

—No report ?

—Sector number ?

—Four.

—Good.

টেলিফোনের রিসিভার রাখতে না রাখতেই আবার বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

—Report ? কি ?

—Sector nine, incident ? একটা বাজারে বোমা পড়েছে ?

—আপনি warden ?

—আপনি যাচ্ছেন সেখানে ? Good, Ambulance-এ phone করুন।

আবার উঠল plane-এর শব্দ ; কয়েকখানারই যেন সম্মিলিত শব্দ সকলেই দরজার মুখ থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালে আকাশের দিকে। শব্দ নিকট থেকে দূরে চলে যাচ্ছে দ্রুততম গতিতে।

বোস বললে—এখানকার fighter planes—chase করেছে।

একখানা plane মাথার উপর পাক দিয়ে ফিরে গেল। রেকনয়টারিং plane—শত্রুবিমান আর আছে কিনা দেখছে।

কানাই এতক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে। তার বিহ্বল অবসন্নতা কেটে গেছে।

বেজে উঠল 'অল ক্লিয়ার' সাইরেন-ধ্বনি। দীর্ঘ একটানা সুরের উচ্চধ্বনি দিকে-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

বোস সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে।

বোস সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলে টেলিফোন রিসিভার। শম্ভুর দিকে চেয়ে

বোস বললে—এ্যাম্বুলেন্সে আমিও একটা phone করে দি। কি বল? অধিকন্তু ন দোষায়। শম্ভু বললে—ওয়ার্ডেনকে আর একবার phone করে ব্যাপারটা জেনে নিন্ ভাল করে।

—Hallo! Put me to—. Yes, please.

—Hallo! warden no. five? বাজারে বোমা পড়েছে, ওটা কি হাই এক্সপ্লোসিভ্ ছিল? না? তবে? ও, টিনের চালায় পড়ার জন্যে এমন শব্দ হয়েছে? লোকজন কি রকম? বাজারের গেটে তালা বন্ধ? ও! I see! Yes, I am coming.

রিসিভার রেখেই আবার রিসিভার তুলে সে চাইলে আর একটা নম্বার।

—Hallo! Staff Officer·· area speaking. Ambulance. Yes, incidents. Near···market place. Oh, you have received information? Please send at least four cars. Already sent? Thank you.

বোস এবার শম্ভুকে বললে—Ambulance-এর গাড়ী রওনা হয়ে গেছে, তুমি অন্য সকলকে নিয়ে এস। আমি আমার গাড়ী নিয়ে চল্লাম। কানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—আপনি এবার চলে যেতে পারেন কানাইবাবু। আমি চলি।

কানাই বললে—আপনি কি যেখানে বোমা পড়েছে সেখানে চললেন?

—হ্যাঁ। বোস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

—আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে?

—আপনি যাবেন?

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—আসুন—আসুন, আপত্তি কেন থাকবে। I shall be glad. আসুন।

গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিলে বোস। গর্জ্জন করে গাড়ীখানা ছুটল—শেষ রাত্রের জনহীন রাজপথে।

সাব এরিয়ার ওয়ার্ডেন মার্কেট্টার দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তার সঙ্গে তিনজন সহকারী। বাইরে থেকে মার্কেটটার কোন ক্ষতি বোঝা যায় না। রাস্তার ধারের দোতালা দোকানের সারির কোন ক্ষতি হয়নি। ভিতরে সব্জীর বাজারের টিনের চালার উপরে বোমা পড়েছে। ভিতর থেকে আহতের আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বাজারের প্রবেশ-পথের কোলাপ্সিব্‌ল্ গেট তালাবন্ধ।

বোস বললে—ভেঙে ফেল।

ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত পথটা বন্ধুর, ইঁটপাটকেলের মত কি সব পড়ে আছে। চার পাঁচটা টর্চ্চ জ্বলে উঠল এক সঙ্গে। ইঁট পাটকেল নয়, আলু বেগুন, ডাব সব বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। মানুষ পড়ে আছে, এখানে-ওখানে; কে বেঁচে আছে, কে মরেছে বোঝা যায় না। আর্ত্তনাদ উঠছে শুধু। মাটির উপর টর্চ্চ ফেলে—বোস বললে—রক্ত!

রক্ত গড়িয়ে আসচে।

উপরের দিকে টর্চ্চ ফেললে বোস। একটা টিনের শেড্ বেঁকে প্রায় কাত হয়ে পড়েছে। ছাউনির কয়েকখানা টিন উড়ে গেছে, কাঠামোর লোহার এ্যাঙ্গেল, টি আয়রণগুলো বেঁকেচুরে মুমূর্ষু সাপের আঁকাবাঁকা দেহের মত দেখাচ্ছে।

বোস বললে—কয়েকটা লণ্ঠন আনতে হবে। You can drive—তুমি যাও।

কানাই একজনের হাত থেকে টর্চ্চটা নিয়ে অগ্রসর হ'ল মানুষগুলির দিকে। দু'চার জন আলো দেখে এবং মানুষের সাড়া পেয়ে উঠে বসেছে। কানাইয়ের মনে হ'ল, নরম লম্বা কিছুর উপর পা দিয়েছে।

টর্চ্চ ফেলেই সে শিউরে উঠল—মানুষের একখানা হাত, বাহুর আধখানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিট্‌কে এসে পড়েছে। সেদিকে চেয়ে থাকবার মত সময় নাই। সে এগিয়ে গেল। একজন পড়ে গোঙাচ্ছিল, তার ওপর আলো ফেলে দেখলে—তার মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, কাঁধের কাছ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, সে চেতনাহীন। কানাই বসল তার কাছে।

বাইরে মোটরের শব্দের সঙ্গে বেজে উঠল হর্ণ।

বোস বললে—Ambulance এসে গেছে।

Ambulance-এর কর্ম্মীরা এসে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা প্রজ্বলিত হারিকেন। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। বেশী আহতদের first aid দিয়ে—এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ল। কয়েকটা সৎকার-সমিতির গাড়ীও এসে গেছে।

কানাই কাজ করে যাচ্ছে—অদম্য শক্তিতে। বোস হেসে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—You are working like a giant.

কানাই একটু হাসলেও না, সে মুহূর্ত্তের জন্য বোসের দিকে চেয়ে আবার কাজ করে যেতে লাগল। আজ অকস্মাৎ যেন তার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। আত্মহত্যার জন্য ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ সে পেয়ে গেছে জীবনের সিদ্ধিমন্ত্র, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সিদ্ধি যেন তার দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। পরম আনন্দে তার জীবন ভরে উঠেছে। তার মনে আর কোন গ্লানি নাই।

শক্ত জুতোর শব্দ এবং অত্যন্ত জোরালো টর্চ্চের আলো প্রবেশ করল মার্কেটের ভিতরে। বোস এবং সকল এ-আর-পি কর্ম্মীই স্যালিউট দিলে। Assistant Controller—A. R. P. এসেছেন।

কানাই কাজ করে যেতে লাগল।

Asst. Controller বললে—indentification হচ্ছে তো সব?

বোস বললে—যা' পাওয়া যাচ্ছে। দুটো dead body-র কোন indertification হ'ল না।

কানাই একবার মুখ তুলে তাদের দিকে' চাইলে। indentification ? পরিচয় ? হঠাৎ তার মনে গুঞ্জন করে উঠল রবীন্দ্রনাথের দুইটি লাইন ঃ

—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

আবার সে কাজ আরম্ভ করলে।

ও কে? কি করছে ও? একটা ছেলে দেখে দেখে কি কুড়িয়ে ফিরছে। একজন আহতের সর্ব্বাঙ্গ সন্ধান করে দেখছে। সে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলে। একি! গীতার ভাই হীরেন! হীরেনের হাতে পয়সা! আহতদের পয়সা চুরি করে বেড়াচ্ছে! হীরেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রাণপণে সে চেষ্টা করলে হাত ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু কানাই তার হাত ধরেছিল দৃঢ়তর মুঠিতে। সে তাকে টেনে নিয়ে গেল বোসের কাছে। বললে—ছেলেটি আমার ভাইয়ের মত, এও দেখছি কাজ করতে এসেছে। দাও হীরেন, যে পয়সাগুলো কুড়িয়ে জমা করেছ—দাও ওঁকে।

হীরেন হাতের মুঠো খুলে প্রসারিত করে দিলে।

কানাই বললে—বোস, এ'কে আপনাদের মধ্যে নিয়ে নিন।

বোস হেসে বললে—তার আগে আপনাকে আমরা চাই কানাই-বাবু।

—মিষ্টার বোস! Asst. Controller ডাকলেন।

—Yes Sir!

—আমি যাচ্ছি…area-তে।

—…area-তে? ওখানে কি হয়েছে?

—···স্ট্রীটে একটা বস্তীতে বোমা পড়েছে, তার পাশেই সেকালের একখানা পুরোণো বড় বাড়ী—জানবেন বোধ হয়, চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী, সে বাড়ীরও প্রায় অর্দ্ধেকটা ভেঙে পড়েছে।

— স্ট্রীটে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী? সুখময় চক্রবর্ত্তীর বাড়ী? কানাই সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বোস বিবর্ণ মুখে তার দিকে চেয়ে বললে—কানাইবাবু!

স্থির দৃঢ়পদে কানাই অগ্রসর হ'ল, বললে—আমি চলেছি।

—রায়বাহাদুরের গাড়ীতে যান। Sir, এঁদেরই বাড়ী। এঁকে আপনার গাড়ীতে—।

—আসুন, আসুন। Asst. Controller অগ্রসর হ'লেন।

তাদের পাশ দিয়ে কে ছুটে বেরিয়ে রাস্তার জনতার মধ্যে মিশে গেল। সে হীরেন। রাস্তায় তখন মানুষের ভিড় জমে গেছে।

সুখময় চক্রবর্ত্তীর মোহভরা বাড়ী—ভেঙে পড়েছে! ভূমিকম্পে ভগ্নশীর্ষ বিদীর্ণদেহ প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয় তার মেজদাদু? মেজ-ঠাকু'মা? তার মা? তার বাপ? ভাই, বোন?

(চব্বিশ)

২৩শে ভোর বেলা থেকে কলকাতার মৃত্যু-আতঙ্কে অধীর নরনারী পালিয়ে যাচ্ছে। সে দৃশ্য যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ। শিক্ষায়-দীক্ষায় বঞ্চিত, নিম্নস্তরের কাজ করে সমাজের যারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, সংখ্যায় তারাই বেশী—হাজারে হাজারে বলেও তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। দিনরাত বিরামহীন কায়িক পরিশ্রম করে যাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ দু'বেলা দুমুঠো উদরান্নের মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত নয়, কোন রকমে বেঁচে আছে; তাদের কাছে ঐ বেঁচে থাকাটাই পরমার্থ। যুগযুগান্তর ধরে তারা দুর্ভিক্ষে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গিয়ে

ভিক্ষা ক'রে বেঁচেছে, মানুষের সমাজে ভিক্ষা ক'রে বেঁচেছে, মানুষের সমাজে ভিক্ষা না পেলে বনে জঙ্গলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে অন্ন সংগ্রহ করেছে, অভাবে পাতা সিদ্ধ ক'রে খেয়েছে, মহামারীতে চিকিৎসার সামর্থ্যের অভাবে পালিয়ে বাঁচার উপায়কেই একমাত্র উপায় বলে জেনেছে; কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত রাষ্ট্র-সঙ্কট হয়ে গেছে পৃথিবীতে, কিন্তু তাদের অবস্থার কোনদিন কোন পরিবর্ত্তন হয়নি; আপনাদের অপরিবর্ত্তিত অবস্থার অভিজ্ঞতায় তাই চিরকাল তারা সর্ব্বাগ্রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে—পালানোটাই তাদের পুরুষানুক্রমিক প্রবৃত্তি; দেহের শোণিত, স্নায়ু, মজ্জা-মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চিত সহজাত প্রকৃতি। ঝি, চাকর, ঠাকুর, নাপিত, মুটে, মজুর যানবাহনের অপেক্ষা না ক'রে দলে দলে কলকাতা থেকে দেশদেশান্তরে প্রসারিত রাজপথগুলি ধরে পালাচ্ছে। কলকাতা থেকে ট্রেণের পর ট্রেণ ছেড়েও রেল-কর্ত্তৃপক্ষ পলায়নপর যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান করতে পারছে না। মোটর, লরী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, গোরুর গাড়ী, এমন কি ঘোড়ায়-টানা ময়লা-ফেলা গাড়ীতে লোকে পালাচ্ছে। যারা ধনী—যাদের জীবন অফুরন্ত অতৃপ্ত বাসনায় অহরহ মৃত্যুভয়ে অধীর, যারা নিজের দেহে রক্তের অভাব হ'লে অর্থ দিয়ে অন্যের রক্ত কেনে; দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, রাষ্ট্র সঙ্কটে তারাও চিরকাল সর্ব্বাগ্রে আপনাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নিরাপদ দেশান্তরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্র-সঙ্কটের অবসান হ'লে, বিপ্লবের পর ফিরে আসে; রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তন হয়ে থাকলে অবনত মস্তকে নূতন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। অন্য যারা আছে, তাদের মধ্যে আছে অতিবুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত, বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁর বিরচিত পঞ্চতন্ত্রে যাদের 'প্রত্যুৎপন্নমতি' বলে গেছেন, তারাই। 'অনাগত-বিধাতা'রা বহুকাল পূর্ব্বেই পালিয়েছে। 'যদ্‌ভবিষ্য-ভবিষ্যতি'র দল অলিতে-গলিতে; বিষ্ণুশর্ম্মা তাদের বিবরণ দেন নি,

কিন্তু তারা যে সঙ্গত এবং সামর্থ্যহীন ছিল এতে কোন ভুলই নাই। অন্তত বিজয়দা'র তাই মত। এ নামকরণগুলিও করেছেন বিজয়দা'ই। নীলার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। আর এক শ্রেণীর লোক আছে। তারা কিন্তু বড় হতাশ হয়েছে। কূট মনোবৃত্তি সম্পন্ন শক্তিহীনের দল এরা। শক্তিহীনের দল নিজেদের শক্তিবলে মুক্তির কল্পনা করতে পারে না, তাই ওই যুদ্ধের সুযোগে জাপানকে ভাবে নিজেদের মুক্তিদাতা। ভারতবর্ষে বার বার এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেছে। ভুলে গেছে তারা। যুদ্ধের কোন স্মৃতিই মানুষের মনে নাই।

সকালে উঠেই বিজয়দা বেরিয়ে গেছেন। বেরিয়ে গেছেন কানাইয়ের সন্ধানে। কানাই এখনও পর্য্যন্ত ফেরেনি। কানাইয়ের সন্ধান করে যাবেন গুণদাবাবুর বাড়ী। গতকাল গুণদাবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র রয়েছে অভিভাবকহীন অবস্থায়।

নীলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। নেপী বেরিয়েছে বোমা-বিপর্য্যস্ত স্থানগুলির উদ্দেশ্যে। নীলা উৎকণ্ঠিত ভাবে রাস্তার দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল। নেপী এবং বিজয়দা দুজনের জন্যই সে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

কানাইয়ের উপর সে প্রসন্ন নয়—অন্তত সে নিজে তাই মনে করে; তবুও সে যে সেই সাইরেনের সময় দরজার মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল—এখনও পর্য্যন্ত ফিরল না—তার জন্য সে উৎকণ্ঠা অনুভব না করে পারছে না। আরও উৎকণ্ঠা রয়েছে তার নিজের বাড়ীর জন্যে। ২১শে রাত্রির বমিং-এর পর সে বরাবার ভেবেছে তার বাড়ীর সংবাদ নেবে, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারে নাই। আজ সে তাই ব্যগ্রভাবে নেপীর প্রতীক্ষা করছে। নেপী ফিরলেই সে তাকে একবার বাড়ীর খবরের জন্যে পাঠাবে। অন্তত বাড়ীর পাশের মুদীর দোকান থেকে তাদের খবর জেনে আসবে।

ত্বরিতগতিতে শীতের বেলা বেড়ে চলেছে। আপিসের বেলা হয়ে এল। আর নীলা অপেক্ষা করতে পারলে না। স্নান করে খেয়ে সে আপিসে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করলে ফেরবার সময় সে সকল সঙ্কোচ ঠেলে বাড়ীতে যাবে, খোঁজ নিয়ে আসবে। এ অধিকার থেকেও যদি তার বাবা বঞ্চিত করেন, তবে সে ভবিষ্যতে ভুলে যাবে তাঁদের কথা।

আপিসের কাজে আজ তার বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে।

তার ওপরওয়ালা একজন বয়স্ক পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক। তিনি বললেন—তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই মিস্ সেন?

মুহূর্ত্তে নীলার চোখ অকারণে ছল ছল করে উঠল।

—কি হয়েছে মিস্ সেন?

কি বলবে নীলা ঠিক খুঁজে পেলে না। অবশেষে বললে—আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কাল রাত্রে সাইরেনের সময় বেরিয়েছেন—আমি দেখে এসেছি তখনও পর্য্যন্ত ফেরেন নি।

ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কোন ভয় নাই, ফিরে গিয়ে দেখবে তিনি সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। তারপর বললেন—যদি বেশী উৎকণ্ঠা বোধ কর—তবে তুমি অসুস্থ বলে তোমাকে আমি আজ ছুটি দিতে পারি।

—না—না—। তার দরকার নেই। নীলা নিজের কাছেই লজ্জিত হল। বিকৃত-মন পতিত-অভিজাত-বংশীয় কানাইয়ের জন্য তার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নাই। সে আপনার জায়গায় গিয়ে আপনার কাজে গভীর মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলে। ছুটির নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে আর সে একবারও আসন ছেড়ে উঠল না।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ছুটির নির্দ্দিষ্ট সময় ঘোষিত হতেই কিন্তু সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে জেম্‌স এবং হেরল্ড। তারই অপেক্ষা করে রয়েছে তারা। তাকে দেখে হাসিমুখেই তারা এগিয়ে এসে অভিবাদন করলে।

—আশা করি ভালো আছেন আপনি ?

নীলার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। যাবার পথে বাধা পেয়ে সে খুশী হয় নি। তবুও আপনাকে সংযত ক'রে সে বললে—ধন্যবাদ। আমি ভালোই আছি। আশা করি আপনাদের খবর ভালো ?

হেরল্ড বললে—ধন্যবাদ মিস সেন। কিন্তু আসুন না—কফিখানায় যাওয়া যাক।

নীলা বললে—মার্জ্জনা করবেন আমাকে। আজ আমি বড় ব্যস্ত।

বলেই সে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে অগ্রসর হ'ল।

রাস্তার মানুষ দলে দলে বাড়ী চলেছে—চলেছে নয়, ছুটেছে। গত কালকার বোমার আতঙ্কটা গভীরভাবে মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এতদিন বোমা পড়েছে কলকাতার বাইরে, শহরতলীতে—গতকাল বোমা পড়েছে শহরের মধ্যে, বিশেষ করে একটা বাজারের টিনের চালের উপর পড়ে যে আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দ হয়েছে—তাতেই সকলে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাড়ীও নিরাপদ নয়, তবুও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে যেন একটা আশ্বাস আছে। তা ছাড়া ওই মহাআতঙ্কের মধ্যে—ভয়াবহ ভবিষ্যতে কেউ কাউকে রেখে মরতে চায় না, বংশধর রেখে যাওয়ার মধ্যে মানুষ যে মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতত্বের আস্বাদ যুগে যুগে অনুভব করে এসেছে—তাতেও আজ মানুষের অরুচি ধ'রে গেছে। বেঁচে থাকলে—দুঃখ কষ্ট দুর্ভোগ সব কিছুকে সহ্য করে সকলে মিলে কোন রকমে বেঁচে থাকতে চায়—নইলে সবাই একসঙ্গে মরতে চায়। এমনি মনোভাব মানুষের!

অথবা এমন ভয়াবহতার মধ্যে আপন জন ক'টিতে মিলে বুকে বুকে আঁকড়ে ধরে বসে না থাকলে সাহস পাচ্ছে না—শান্তি পাচ্ছে না। তাই সব ছুটছে। মুখর বাঙালীর দল মূক হয়ে গেছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে এসে ট্রাম ঘুরল। স্কোয়ারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটি জনতা। হাতে পতাকা, কাগজে লেখা নানা বাণী। এর মধ্যেও মানুষ সত্যকার মুক্তি খুঁজছে!

এতক্ষণে একজন যাত্রী বলে উঠল—যা বাবা, বাড়ী গিয়ে ভাত খেয়ে শুগে যা। ইয়ার্কি করতে হবে না।

অন্য একজন বললে—শল্য রথী হ'ল, জোনাকিতে বাতি জ্বালছে। কালে কালে কতই দেখব! সফরীদের চীৎকার দেখ না!

—ওরা সব রাশিয়ার দল হে। রুশো-বেঙ্গল।

আলোচনা চলতে লাগল। বিক্ষুব্ধ মনের আলোচনা। মানুষের মনের বেদনার ক্ষোভ বিকৃতপথে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। নীলার মন উদাস হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলে সে পারলে না। জানালার পাশ দিয়ে সে চেয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ সুপ্রশস্ত রাস্তাটার পূর্ব্বদিগন্তে উজ্জ্বল তাম্রাভ প্রায় পূর্ণ চাঁদ—চতুর্দ্দশীর চাঁদ। চাঁদের আলোয় পিচের রাস্তাটা অপরূপ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নালোকিত একটা নদী। কিন্তু এ যে বিবেকানন্দ রোড! কেশব সেন স্ট্রীট কখন পার হয়ে এসেছে। তার যে ইচ্ছে ছিল ফেরবার পথে আজ সে বাড়ীর খবর নিয়ে আসবে। অন্যমনস্কতার মধ্যে কেশব সেন স্ট্রীট কখন্ পার হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে নেমে পড়ল।

বাসায় বিজয়দা শুয়ে আছেন। নেপী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। মোড় থেকে নীলা এসেছে অত্যন্ত দ্রুত বেগে। সে হাঁপাচ্ছিল।

বিজয়দা অত্যন্ত মৃদু হেসে বললেন—এস।

নীলা কোন কথা বলতে পারলে না। চারিদিকে চেয়ে দেখলে শুধু।

বিজয়দা বললেন—কানাইয়ের বাড়ীতে বোমা পড়েছে। একটা পোরশন চুরমার হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নীলার মনে হ'ল—বাড়ীঘর সব যেন দুলছে। সে তাড়াতাড়ি সামনের টেবিলটা ধরে ফেললে।

বিজয়দা বললেন—তার আত্মীয়-স্বজন কয়েকজন মারা গেছেন। একজন বৃদ্ধা, একজন প্রৌঢ়া—একজন অল্পবয়সী যুবার দেহ পাওয়া গেছে। একজন বৃদ্ধ বেঁচে ছিলেন—তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল; শুনলাম কানাই সেখানে গেছে। সেখানে গিয়ে শুনলাম—বৃদ্ধ মারা গেছেন—সে শবদেহ নিয়ে শব-সৎকারের গাড়ীতে গেছে শ্মশানে। শ্মশানে গিয়েও খোঁজ ক'রে তাকে পেলাম না।

নেপী বারান্দা থেকে ঘরে এসে নীলার পাশে দাঁড়াল। তার নীরব দাঁড়ানোর মধ্যে যেন গভীর সহানুভূতির প্রকাশ রয়েছে।

বিজয়দা বললেন—নেপীচন্দ্র, ষষ্ঠীকে বল চা করতে।

নেপী চলে গেল।

নীলা এতক্ষণে বললে—কোথায় গেলেন তিনি, কোন খোঁজ পেলেন না?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিজয়দা বললেন—না। তারপর বললেন—অকৃতজ্ঞ, সেটা একটা অকৃতজ্ঞ নীলা! একবার সে ভাবলেও না যে, কেউ তার জন্যে ভাববে!

নীলা চুপ করে রইল। তারও মনের মধ্যে অভিমান-উদ্বেল অভিযোগ আবর্ত্তিত হয়ে উঠেছিল। কানাই তাকে একদিন কমরেড বলে ডেকেছিল, তার জীবনের কথা বলতে চেয়েছিল, আজ এমন বিপদের দিনে বন্ধু বলে কি তার কথা একবারও মনে হ'ল না?

বিজয়দা বললেন—খবর চাপা থাকে না। গীতা ছুটে এসেছিল

খবর পেয়ে। একটু আগে সে গেল। তার যে সে কি অবস্থা সে কি বলব। কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেব খুঁজে পাই না।

নীলা বললে—যাই বিজয়দা, মুখ হাতটা ধুয়ে আসি।

কথাটায় বিজয়দাও যেন চকিত হয়ে উঠলেন—বললেন—হ্যাঁ। শীগ্‌গির এস ভাই! তোমাকে নিয়ে আবার এক জায়গায় যাব আমি। আপিস কামাই ক'রে ব'সে আছি আমি তোমার জন্যে।

—কোথায়?

হেসে বিজয়দা বললেন—ভয় নেই, ন'টার আগে জাপানী প্লেন পৌঁছুবে বলে মনে হয় না। তার আগেই আমরা ফিরব। যাব একবার গুণদাবাবুর বাড়ী। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব, তুমি থাকলে সুবিধে হবে।

গুণদাবাবুর স্ত্রী বিজয়দাকে দেখে অবগুণ্ঠন দেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা তাঁর অসঙ্কুচিত। বিজয়দাকে তিনি অনেক দিন থেকেই জানেন। যে-কালে গুণদাবাবু এবং বিজয়দা এক রাজনৈতিক দলের কর্ম্মী ছিলেন সে-কালে অবিবাহিত বিজয়দা গুণদাবাবুর বিবাহিত জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখের ভাগ নিতে আসতেন—মাঝে মাঝে গুণদাবাবুর স্ত্রীর হাতের রাঁধা তরকারী খেয়ে যেতেন। গুণদাবাবুর স্ত্রী পরিবেষণও করতেন নিজে হাতে, পাশের ঘরে স্বামীর উদ্দেশেও কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন করতেন, কিন্তু বিজয়দার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোনদিন বলেন নাই। ঘোমটাও খোলেন নাই।

নীলা বিস্মিত হয়েই তাঁকে দেখছিল;—বেশ শক্ত কাঠামোর দেহ, কপালে সিঁদুর ডগডগ করছে, দৃষ্টি কিছু অস্বাচ্ছন্দ্যকর রকম দীপ্ত, ধব্‌ধবে ফরসা রঙ—দেখে সমীহ করতে হয়। অত্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে নীলার দিকে চেয়ে তিনি বললেন—বিজয়বাবু কে হন তোমার?

নীলা একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে, জোর করেই সে ভাবটা কাটিয়ে বললে—কেউ না, আমি ওঁকে দাদা বলি।

—ও। তুমি বুঝি ওঁর দলের লোক ?

—হ্যাঁ।

—তা' কি বলছ বল ?

—বিজয়দা আপিসে কথা বলেছেন সেইকথা বলছেন। আপিস থেকে যা পাওনা আছে সেটা তো দিয়েছেন। আরও মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।

—পঁচিশ টাকা ? গুণদাবাবুর স্ত্রী উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—বিজয়দা বলছেন যে, আরও দশ টাকার ব্যবস্থা উনি করবেন।

—মানে, উনি দেবেন ?

বাইরে থেকে এবার বিজয়দা নিজেই বললেন—তাতে কি আপনি আপত্তি করবেন বউদি ?

গুণদাবাবুর স্ত্রী—বিজয়দা'র কণ্ঠস্বর শুনেই ঘোমটাটা একটু টেনে দিলেন। এবার কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু ক'রে বললেন—আপনারা এখন আর একদলের নন। লোকে আবার কতরকম বলে—

বিজয়দা বললেন—গুণদা-দা'ও কি তাই বলতেন ?

—না। তা বলেন নি।

—তবে ?

—তবে ! নীলার দিকে চেয়ে গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—আচ্ছা—সে নেব আমি।

বিজয়দা আবার বললেন—আর একটা দরখাস্ত করতে হবে ভাড়ার

—না। গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—না। থাক্। ওতেই আমার চলে যাবে।

—চলে যাবে না। বড় দুঃসময় আসছে—দুর্ভিক্ষ বোধ হয় আসন্ন— ।

গুণদাবাবুর স্ত্রী হাসলেন। বললেন—না। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে মরবার লোকও তো চাই,—মরব।

বিজয়দা বললেন—তা হ'লে—বউদি—। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা আসুন। আমার যে কপাল—আমার বাড়ীতেই হয় তো—। তিনি হাসলেন। তারপর বললেন—আমার জন্যে আপনারা কেন যাবেন।

চন্দ্রালোকিত জনশূন্য পথ।

দুজনে নীরবেই ফিরল। মনের মধ্যে ফিরছিল গুণদাবাবুর স্ত্রীর কথাগুলি।

(পঁচিশ)

২৪শে ডিসেম্বর।

গত রাত্রি নিরাপদে কেটেছে। সকালে মহানগরীর মানুষেরা উঠেছে অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং সুস্থ চিত্তে। শান্ত এবং সুস্থ বলা বোধ হয় ঠিক নয়; মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা করে অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কোন রকমে রাত্রি কেটে যাওয়ার পর মানুষের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা। রাত্রি কেটেছে, কিন্তু আবার যে-কোন সময় নিষ্ঠুরতম দুঃসময় আসতে পারে। তার ওপর আজ চব্বিশে ডিসেম্বর, সন্ধ্যাটা বড়দিনের সন্ধ্যা এবং তিথিতে আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, পূর্ণিমার সঙ্গে বিশেষ কোন তফাত নাই। সন্ধ্যায় অল্প অন্ধকারের পরেই প্রায়-পূর্ণ-চন্দ্র উঠেছে। জ্যোৎস্নায় আকাশপৃথিবী ঝলমল করছে।

নীলার বাবা দেবপ্রসাদ আপনার বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এক কালের আদর্শবাদী দেবপ্রসাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর চাপে অবসন্ন হয়ে স্তিমিত হয়ে পড়েছিলেন। আপনার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে তিনি কেবল সহ্যই করে চলেছিলেন এতদিন। কিন্তু এমন জীবনের যে স্বাভাবিক পরিণতি—পৃথিবীর প্রতি অশ্রদ্ধা, সকলের প্রতি বিদ্বেষ, তা তাঁর হয় নাই। জীবনের সাধনায় তিনি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মানবধর্ম্মের উপাসক ছিলেন এবং সে ধর্ম্মকে তিনি উপলব্ধিও করেছিলেন। ধনের প্রতি নির্লোভ, ভোগের উপর বিতৃষ্ণ, নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান দেবপ্রসাদ কিন্তু তাঁর সহশক্তির অতিরিক্ত আঘাত পেয়েছেন মেয়ে এবং ছেলের কাছ থেকে। নীলা এবং নেপী তাঁকে সেদিন যে আঘাত দিয়ে গেছে তাতে তাঁর জীবন আমূল নড়ে উঠেছে। সব চেয়ে বড় আঘাত—তারা নীতির অবমাননা করেছে। নীলা তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছিল; 'দুটি বন্ধুকে থিয়েটার দেখতে নিমন্ত্রণ করেছি', বলে নি তারা বিদেশীয় এবং পুরুষ। সে তাদের সঙ্গে অভিনয় দেখতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার নিঃসংশয় পরিচয় দিয়েছে। সে তাঁর আদর্শ অমান্য করেছে। সে গৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে। নিষ্ঠুরতম আঘাত পেয়েছেন দেবপ্রসাদ।

সে রাত্রে তখনই নেপীকে ডেকে সাড়া না পেয়ে তিনি বুঝেছিলেন—নেপী চলে গেছে। তার জন্যে একটি কথাও তিনি বলেন নাই। বরং বলবার তাঁর অভিপ্রায়ই ছিল—তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম। তুমি আমার চক্ষে মৃত। এ বাড়ীতে তুমি আর এস না।

কন্যার সম্পর্কে সে কথা বলা কিন্তু তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। স্বাভাবিকও নয়। যে মানবধর্ম্মের উপাসনা তিনি ক'রে এসেছেন সে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে সকল মানুষের অধিকার পবিত্র উদার চিত্তে স্বীকৃত হ'লেও নারীজাতিকে শিশুর মত অসীম স্নেহের এবং দেবীর মত সম্মানের

পাত্রী করে রাখা হয়েছে। শিশুর মত স্নেহের পাত্রীকে রক্ষা ও শাসনের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না; এবং দেবীর সম্মান রক্ষা করা ভক্তের চিরন্তন অধিকার, আর সে অধিকার মেনে নেওয়া দেবীরও শাশ্বত দেবধর্ম্ম। সাম্যবাদে নারী-পুরুষের সম-অধিকার সম্বন্ধে যুক্তিও দেবপ্রসাদের অজানা নয়। অনেক চিন্তা করেও দেখেছেন তিনি, কিন্তু স্বীকার করতে পারেন নাই।

বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল, তিক্ত হাসি। তার অবশ্যম্ভাবী ফল নীলার জীবনে ঘটতে চলেছে। বিদেশীয়ের কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে—। মনে মনেও তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না কার মত। আবার তিনি হাসলেন। সাম্যবাদ! হায়রে! পরাধীন দেশে সাম্যবাদ! কবন্ধের কেমন ভাবে চুল ছাঁটা হবে তারই পরিকল্পনা! ছোট বড় করে অথবা সমান করে!

যাক্। যা হয়ে গিয়েছে—সে ভালোই হয়েছে। তার জন্যে যে আঘাত তিনি পেয়েছেন—সে আঘাত তিনি বুক পেতেই নিয়েছেন। এর জন্য কোন অনুশোচনা তিনি করবেন না। নাঃ—কোন অনুশোচনা তাঁর নাই।

তাঁর স্ত্রী আজ দু'দিন ধ'রে গোপনে কাঁদছেন। সে কথা তিনি জানেন। কিন্তু কোন কথা বলেন নাই। বড় ছেলে ম্রিয়মান হয়ে আছে। কোন কথাই সে বলে না। তার চাকরী গেছে। অপরিসীম লজ্জায় সে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত বের হয় না। গোটা সংসারের ভার আজ তাঁকে বহন করতে হবে। না বহন করে উপায় নাই। দায়িত্ব যে তাঁর। নীলার চাকরীর আয় অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছিল তাঁকে। এখন সেটাও তাঁকেই পূরণ করতে হবে। তিনি আজ দু'দিন ধরে সেই চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে আছেন।

অর্থের ভাবনা ভাবতে ভাবতে এক এক সময় তাঁর হাসি আসে।

অর্থের আবার ভাবনা? আজ দেশের একপাশ সাহারার মত অভাবের মরুভূমি—অন্যপাশ বর্ষার গঙ্গার মত তরল রজত-বন্যার প্রবাহে উচ্ছ্বসিত। তাতে অবগাহন করতে পারলে মানুষসুদ্ধ রজতদেহ হয়ে যাবে। যুদ্ধে চাকরী নিলেই সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু—। আবার তিনি হাসেন। অনধিকারচর্চ্চা তিনি করতে চান না। নীলা তর্ক-প্রসঙ্গে বলত—অধিকার কি কেউ দেয় বাবা? অধিকার করে নিতে হয়। তাতেও তিনি হাসতেন।

স্ত্রী এসে ডাকলেন—আজ কি বেরুবে তুমি?

চকিত হয়ে দেবপ্রসাদ বললেন—নিশ্চয়। আঘাত পেয়ে দেবপ্রসাদ উত্তেজনায় নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। কর্ত্তব্য করতে হবে বই কি। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনীদের বাঁচাতে হবে। এ দুর্য্যোগের রাত্রি পার হয়ে—নতুন প্রভাত দেখবার কল্পনা তিনি করেন না, তবে তিনি না থাকলেও যাদের মধ্যে সংস্কৃতির ধারায় বংশের পরিচয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন তারা যেন সেদিন থাকে, সে ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা তাঁকে করতে হবে বই কি।

খেয়ে বের হবেন, দেখলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—রাস্তার ওপারের পানওয়ালা।

—কি শিউচরণ?

—বাবুজী! আমার উপর থোড়া মেহেরবানি করতে হবে।

—কি, বল?

—আমার দোকানের কিছু চিজ—বাবুজী—একটা আয়না, একটা আলমারী যদি আপনার বাড়ীতে রেখে দেন।

—কেন? তুমি কি চলে যাবে দেশে?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিউচরণ বললে—হাঁ বাবুজী; কি করব বলুন? বাল-বাচ্চা ডরকে মারে থানে ছোড় দিয়া। বাবুজী—

বড়া বেটী হামার কালসে একঠো দানা মুখে দেয় নাই। একবার রাস্তামে, একটা লৌণ্ডা—মুখে সাইরেন বাজাইয়েছিলো—উ ভিরমী গেল। মালুম হোচ্ছে ফিন কুছ হোবে তো উ মর যাবে।

দেবপ্রসাদ ভাবছিলেন—এই মৃত্যু মাথায় ক'রে কি পরের জিনিস গচ্ছিত রাখা ঠিক হবে ?

শিউচরণ বললে—বাবুজী! ঝুট বলব না। ডর হামলোককা ভি হইয়েছে। দেশে যাই বাবু। আবার যদি ভগবান দিন দেগা তো আসব।

আবার একটু হেসে বললে—বাবুজী, বেওসাটা হামার ভাল হইয়েছিল। হামি পানের দোকান করছিঁলো, জেনানা ভাজাভুজি করছিল। বাবুজী—বহুৎ গরীব হামি লোক; দেশমে কুছ নেহি। জানকে ডরকে মারে যাচ্ছি—পালিয়ে—দেশে গিয়ে হয় তো ভুখে মরব।

দেবপ্রসাদ বললেন—আর অন্য কোথাও কি রেখে যেতে পার না তুমি ?

—নেহি হুজুর। আপনি থোড়া মেহেরবানি করেন তো হামি ঠিক জানবে কি যেদিন হামি আসবে—ওহি দিন হামার চিজ হামি পাবে।

—কিন্তু—শিউচরণ—

শিউচরণ শিউরে উঠল—আরে বাপরে! আরে বাপরে! হুজুর—আপনার মাফিক সাধু আদমী—হুজুর—কভি হো সক্‌তা নেহি। কভি নেহি। তব্‌ তো ভগোয়ান ঝুট!

দেবপ্রসাদ একটু হেসে বললেন—রেখে যাও তবে।

বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বড় ছেলের জন্য একটা কাজের খোঁজে বেঁরিয়েছেন তিনি। ওর একটা কাজ হ'লে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। রাস্তায় দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে। মোট-পোঁটলা নিয়ে পথ ধরে চলেছে। শেয়ালদার কাছে এসে ট্রামের গতি রুদ্ধ

হয়ে গেল। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, রিক্স, মানুষের ভিড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নড়বার জায়গা নাই। প্রাণভয়ে মানুষ পালাচ্ছে। এর মধ্যে কত শিউচরণ আছে কে জানে। হয় তো—হয় তো কেন—সবাই শিউচরণ। কত সাধ—কত আশা নিয়ে এরা সব এখানে এসে আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী করে নিয়ে জীবনের বীজ বপন করেছিল, কারও বীজ হতে অঙ্কুর হয়েছিল, অঙ্কুর হতে মেলেছিল পাতা—কারও কারও জীবনতরুতে ফুল ধরেছিল, ফলভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল কত জীবনতরু; সব ভেঙে-চুরে—ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল—কালযুদ্ধ। আবার কত নিরন্ন এই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে—ছুটে আসছে কলকাতায় দুটো উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশায়।

যুদ্ধের বিষবাষ্প মধ্যে মধ্যে দেবপ্রসাদের অন্তর-বাহির যেন দগ্ধ করে দেয়। এই যুদ্ধের ফলে তাঁর মনে যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা' অভূতপূর্ব্ব। তাকে ভূমিকম্পভীত মনের ত্রাস বলা চলে না; দেবপ্রসাদের মনে হয়, অভ্যস্ত অন্ধকারে কতকগুলি যথাপ্রাপ্ত সংস্কারের মধ্যে তিনি এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ একটা বজ্রের আলোতে চারিপাশের স্বরূপের যথার্থ ভয়ঙ্করত্ব দেখতে পেয়েছেন। এই সময়ে মনে হয় নীলা ও নেপীর কথা—'Blessed are they who have not seen, yet believed !'

ট্রাম চলতে অনেক দেরি। দেবপ্রসাদ ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। হেঁটেই যেতে হবে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় ঝলমল মহানগরীর রূপ সত্যই অপরূপ। কিন্তু মৃত্যুপুরীর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর রূপের মত তার সে রূপ মানুষের চোখে উপেক্ষিত হয়েই রইল। শুধু উপেক্ষা নয়—উপেক্ষার মধ্যে ছিল আশঙ্কা।

দেবপ্রসাদের গৃহখানি কিন্তু ঈষৎ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বড়

ছেলের জন্য একটা কাজের প্রত্যাশা তিনি পেয়েছেন। আজ কয়েক-দিন পর স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকটা কথা হ'ল। বড় ছেলেও কাছে এসে বসল। দেবপ্রসাদ বললেন বড় ছেলেকে—নীলা কোথায় গেছে কাল সকালে উঠে সন্ধান করবে তুমি।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কোন সন্ধান জান ?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীলার মা বললেন—কি করে জানব ?

একটু চুপ করে থেকে দেবপ্রসাদ বললেন—তারা কেউ আসে নি ?

—না।

আবার খানিকটা চুপ করে থেকে দেবপ্রসাদ বললেন—আমাকে কাগজ কলম দাও দেখি। আমি একখানা চিঠি লিখে রাখি। তোমরা বরং সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

দেবপ্রসাদ কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। কি ভাবে লিখবেন ভাবছিলেন। নীলা আবার ফিরে আসে তাই তিনি চান। সে যদি যথার্থ অনুতপ্ত হয় তবে তিনি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরম্ভ করলেন—কল্যাণীয়াসু—ধর্ম্ম-নীতি এবং আচার লঙ্ঘন ক'রে তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করে গেছ—তাতে—।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা থর থর করে কেঁপে উঠল।—সাইরেন বাজছে !

দেবপ্রসাদ চিঠিখানা চাপা দিয়ে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত হয়ে ভেতরে গিয়ে ডাকলেন—সাইরেন বাজছে। ছেলেদের খাওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ। এস তুমি দুটো খেয়ে নাও।

হেসে দেবপ্রসাদ বললেন—তোমরা অদ্ভুত। পৃথিবীতে তোমাদের তুলনা হয় না। খাবার ঢাকা দিয়ে ছেলেদের নিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে এস। ফার্স্ট-এডের বিস্কুটের বাক্সটা কোথায় ? ওঃ—বাইরের দরজাটায় তালা দিতে হবে। শীগগির এস।

বড় ছেলে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললে—বাইরের দরজা আমি দিচ্ছি।

দেবপ্রসাদ আবার হাঁকলেন—জলদি কর।

—আসছি—আসছি। বাপরে! বাপরে! ওই সিঁড়ির তলায় গেলেই যেন—লোহার বাসরঘরে ঢোকা হবে।

গৃহিণী এবার আর মনের বিরক্তি সংবরণ করতে পারলেন না।

নীচের তলায় ছোট একটি ঘর—ঠিক ঘর নয়, সিঁড়ির খিলেনের তলায়—একটু বড় ধরণের চোরকুঠুরী, পূর্ব্বে ঘরখানায় থাকত ভাঙ্গা ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্র, কয়লা, ঘুঁটে। এয়ার-রেড শেল্টারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে এ-আর-পি বিজ্ঞপ্তি দিতেই দেবপ্রসাদ এই ঘরখানিকেই পরিষ্কার করে রেখেছেন।

দেবপ্রসাদ হাসলেন, বিরক্ত হ'লেন না। নিজেই তুলো, টিঞ্চার-আয়োডিন, গ্লিসারিন প্রভৃতির আধার বিস্কুটের-টিনটির সন্ধান করে দেখলেন—বাতি নাই বললেই হয়। যে বাতিটি ছিল সেটি আগের রাত্রে পুড়ে অবশিষ্ট আছে সামান্যই। বড়জোর আধঘণ্টাখানেক জ্বলতে পারে। ওদিকে সিঁড়ির তলায় চোরকুঠুরীটির ভেতর ইলেকট্রিক কনেকশনও নাই। তবুও সেই বাতিটুকু জ্বালিয়েই সকলকে নিয়ে এসে বসলেন।

আতঙ্ককর স্তব্ধতা। সকলে চুপচাপ বসে আছে। পুত্রবধূটি কাঁপছে। কোলের ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে বসে আছে। দেবপ্রসাদের মুখ যেন পাথরের মুখ। গৃহিণী কাপড়ের অন্তরালে জপ করছেন।

প্লেনের শব্দ উঠছে। এখানকার প্লেনের শব্দ থেকে শব্দের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। ধাতব শব্দের রেশ নাই এতে এবং মধ্যে মধ্যে যেন থেমে থেমে আবার জোর হয়ে ওঠে। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

সেই মুহূর্ত্তেই হ'ল বিস্ফোরণের শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার।

আবার!

সঙ্গে সঙ্গে উঠানে প্রতিফলিত আলোকচ্ছটার আভার বেশ পাওয়া যাচ্ছে।

বড় নাত্নীটি ভয়ে কেঁদে উঠল। পুত্রবধূটি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিল। মাটিতে হাত রেখে সে কোন রকমে সামলে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাতির আলোটা নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মানুষ ক'টি যেন পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়ে শিউরে উঠল।

বড় নাতনী কেঁদে উঠল—ঠাকু'মা!

বড় নাতি কেঁদে উঠল—মা!

পুত্রবধূ হাঁপিয়ে ডাকলে—মা!

গৃহিণী ডাকলেন—ওগো!

বড় ছেলে নির্ব্বাক।

দেবপ্রসাদ সাড়া দিলেন—ভয় কি?

আবার স্তব্ধতা।

আবার প্লেনের শব্দ উঠছে।

পুত্রবধূ আবার ডাকলে—মা!

গৃহিণী অন্ধকারেই তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন—কাঁপছ যে মা! ভয় কি?

কোলের ছেলেটি এবার কেঁদে উঠল।

বড় ছেলে এতক্ষণে কথা বললে—বিরক্ত হয়েই বললে—আঃ থামাও না! সবগুলো একসঙ্গে কাঁদলে পারা যায়!

বধূটি ছেলেটির মুখে স্তনবৃন্ত দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলে।

আবার বিস্ফোরণের শব্দ।

আবার !

আবার !

উঃ কি প্রচণ্ড শব্দ ! বাড়ীর মেঝেতে কম্পন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে !

দেবপ্রসাদ বললেন বড় ছেলেকে—মেয়েটাকে তুমি কোলে চেপে ধরে বস। বড় খোকাকে আমাকে দাও ! চেপে ধরলে ওরা সাহস পাবে।

স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে প্রাণী ক'টি বসে থাকে—পরস্পরের হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। কাল কাটে না। মনে হয়, পৃথিবীতে বোধ করি তারা ছাড়া আর কেউ এ শহরে নাই। সকলে চলে গেছে, তারাই বোধ হয় হতভাগ্যতম—তাই তারা পড়ে রয়েছে।

ঠিক এই সময়ে একটানা সুরে বেজে উঠল সাইরেন। All clear ! All clear !

দেবপ্রসাদ বললেন—আঃ !

তিনিই সর্ব্বাগ্রে বেরিয়ে এসে বারান্দার সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। আলো ! আঃ—সকল আশ্বাসের শ্রেষ্ঠ আশ্বাস ! জ্যোতি ! মনে মনে আজকের নিরাপত্তার জন্য তিনি জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করলেন। বললেন—বেরিয়ে এসো !

দরজার মুখে দাঁড়িয়েই পুত্রবধূ ডুকরে কেঁদে উঠল !—একি ! একি ! ওগো—মা গো !

—কি ? কি ? বউ-মা !

—ওরে খোকন ! ওমা, আমার খোকন ? এ কি হ'ল মা ?

আলোর সম্মুখে এনে দেখা গেল—শিশু বিবর্ণ—হিম—হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের আতঙ্কে মা কাঁপতে কাঁপতে শিশুর মুখে স্তন দিয়ে সজোরে তাকে বুকে চেপে ধরেছিল,—শিশু যত চঞ্চল হয়েছে, মায়ের বাহুবেষ্টনী ততই দৃঢ় হয়েছে—গভীরতর আতঙ্কের

মধ্যে। শেষে সে যখন শান্ত শিথিল হয়েছিল—তখনও মা তাকে ঘুমন্ত ভেবে বুকে চেপে ধ'রে ব'সে ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই শিশু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে।

দেবপ্রসাদ একমুহূর্ত্তে যেন পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল এ তাঁর উপর বিধাতার দণ্ড; জীবনে যে পাপ তাঁর সংসারে পুঞ্জীভূত হয়েছে নীলার কর্ম্মে—নেপীর কর্ম্মের ফলে,—যে পাপ তিনি করেছেন কন্যাকে পুত্রকে কুলধর্ম্ম লঙ্ঘন করবার স্বাধীনতা দিয়ে,—এ তারই দণ্ড। আবার মনে হ'ল—পাপ তাঁর তো এইটুকুই নয়—বিরাট পর্ব্বতপ্রমাণ তাঁর পাপ। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর—নিজের কুলধর্ম্ম লঙ্ঘন করার? তাঁর বর্ণগত বেদ, আয়ুর্ব্বেদকে আশ্রয় ক'রে শান্ত পল্লীজীবনে এ দেশের কৃষিধর্ম্মাবলম্বী মানুষগুলির রোগের সেবাকে জীবনধর্ম্ম ক'রে তিনি তো দিব্য থাকতে পারতেন। শান্ত পল্লীভবন, স্বল্প প্রয়োজন, অনাড়ম্বর জীবনকে পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় এসে এই অশান্ত অতৃপ্ত নাগরিক জীবনকে তিনিই তো গ্রহণ করেছেন। আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, বুভুক্ষার তৃপ্তি নাই, লালসার অন্ত নাই; আকাঙ্ক্ষায় বুভুক্ষায় লালসায় মানুষ উন্মত্তের মত বিরামহীন বিশ্রামহীন অধীর গতিতে সম্পদ আয়ত্ত করতে ছুটে চলেছে; নিজের দৈহিক শক্তিতে কুলায় না—তাই সে আবিষ্কার করেছে যন্ত্র;—যন্ত্রশক্তি তাকে এনে দিচ্ছে এক-জীবনে বহুজন্মের ভোগসম্পদ। উল্কাগতিতে সে ছুটে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়। হাজার মানুষের দৈহিক শক্তিতে যে ধ্বংসলীলা সম্ভবপর হ'ত—সেই ধ্বংসলীলা সম্ভবপর হয়েছে একটা বোমায়, একটা কামানের গোলায়, মেশিনগানের কয়েক মিনিটের অগ্ন্যুদ্গিরণে। এ জীবনধর্ম্ম,—এ সভ্যতার এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি;—ধ্বংস। ভোগলালসার তাড়নায়—দেহবাদের চরম পরিণামে—আত্মাকে ভুলে গেছে মানুষ;

আত্মীয়তার শেষ অনুভূতিটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেল মানুষের সমাজ থেকে। এর পর পরস্পারের টুঁটি কামড়ে ধ'রে মানুষ মরবে পশুর মত !

এতে সন্দেহ দেবপ্রসাদের আর নাই। এ তাঁর প্রায়শ্চিত্ত। নীলা নেপীর যে পাপ তাঁর সংসারে বিপর্য্যয় এনে দিলে—বিধাতার দণ্ড নেমে এল যার ফলে—সে পাপের বীজ বপন করেছেন তিনি নিজে। এ তাঁর প্রাপ্য দণ্ড। মনে মনে দেবপ্রসাদ প্রণাম করলেন সেই অমোঘ মহাশক্তিকে।

(ছাব্বিশ)

গভীর আতঙ্কিত রাত্রির অবসান হ'ল। আজ পঁচিশে ডিসেম্বর। সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজের পবিত্রতম পর্ব্বদিন। মহামানব, ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। ইয়োরোপে কিন্তু আজও যুদ্ধের বিরাম নাই। নরহত্যা চলছে। অহিংসার অবতার বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বনকারী জাপানীরাও খ্রীস্টমাস প্রারম্ভ-ক্ষণে হিংসার তাণ্ডব চালিয়েছে। সকালেই দেখা গেল কাগজের মারফতে খ্রীষ্টান সমাজের অন্যতম ধর্ম্মগুরু প্রচার করেছেন—"খ্রীষ্টান সমাজ চরমতম বিভীষিকা এবং ঘৃণার পরিবেশের মধ্যে খ্রীস্টমাস পর্ব্বের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছে।"

নীলা পড়ে বললে—'Oh God, the heathens are come into Thine inheritance, Thy holy temple they have defiled'—

বিজয়দা কথার মধ্যস্থলেই বললেন—হায় ভগবান !

সবিস্ময়ে নীলা বললে—কেন ?

বিজয়দা বললেন—ধর্ম্মগুরু শান্তির সময়েও কি এটা দেখতে পান নি ? ইয়োরোপের খবর জানি না—তবে তিনি বড়দিনে কলকাতায় এলে—ভেটের ভেটকী এবং গল্‌দা চিংড়ী দেখে অনেক আগেই দিব্য-দৃষ্টি লাভ করতেন। খেলে তো কথাই নাই—দিব্যজ্ঞানই পেতেন।

তারপর ডাকলেন—ষষ্ঠী ! ষষ্ঠী !

ষষ্ঠী এসে দাঁড়াল।

—দেখ দেখি, বাজারে গল্‌দা চিংড়ী কাঁদছে না হাসছে ? কাঁদছে তো নিয়ে এস। মানে, সস্তা যদি পাও তো নিয়ে এস।

নীলা বললে—আমি একটু আসছি বিজয়দা।

—কোথায় যাবে ?

—নেপীকে বলেছি—ফেরবার সময় বাড়ী হয়ে ফিরবে। একটু রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই।

বিজয়দা বাধা দিলেন না। কোথায় বোমা পড়েছে সে খবর কাল রাত্রেই তিনি আপিস থেকে জেনে নীলাকে জানিয়েছেন। তাদের বাড়ীর ওদিকে কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নি। তবুও নীলার উৎকণ্ঠা হয়েছে। নেপী ভোর রাত্রেই বেরিয়েছে—বোমাবর্ষিত অঞ্চলের সঠিক সংবাদ আনতে।

নীলা এসে ট্রাম-রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল। রাস্তার ধারে জনতা জমে উঠেছে। আলোচনা চলছে।

গত রাত্রির বিমান-আক্রমণের গুজবে কলকাতা ভরে গেছে।

কেউ বলছে—অমুক জায়গা মরুভূমি করে দিয়ে গেছে।

—এদের এত বড় বিল্ডিংটা ধুলো হয়ে গেছে স্রেফ।

—আজ দিনের বেলাতেই দেখ না।

—দিনের বেলাতে ?

—নিশ্চয় ! বড়দিন করতে আসবে না ?

একজন চুপি চুপি বললে—জাপানী পাইলটরা সমস্ত মেয়ে।

—মেয়ে ! বল কি !

—মেয়ে।

—পাগল ! মেয়ে কখনও হয় ?

—আমি একজন বড় অফিসারের কাছে শুনেছি। চাটগাঁয়ের ওদিকে একখানা জাপানী প্লেন ভেঙে পড়েছিল। পাইলট হারিকিরি করে। শেষে দেখে সে পুরুষ নয় মেয়ে। তারপর একজন এ্যারেস্টেড হয়েছে—সেও মেয়ে। সে বলেছে—এ সব ছোট ছোট কাজ আমাদের দেশে মেয়েরাই করে।

লোকে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

নীলার প্রথমটা আপাদমস্তক জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষটা শুনে সে আর হাসি সংবরণ করতে পারলে না। এইভাবেই আদিযুগে মানুষ ঝড়ের মধ্যে আগুনের মধ্যে দেবতাকে আবিষ্কার করেছিল। তার মনে পড়ল, বছর কয়েক আগে সে তাদের পিতৃভূমে কাটোয়ার সন্ধিকটে গ্রামে গিয়েছিল গরমের ছুটিতে। বৈশাখের শেষ, কালবৈশাখীর ঝড় উঠতেই তাদের গ্রাম্য ঝি একখানা কাঠের পিঁড়ি পেতে দিয়ে সকাতরে বলেছিল—বস দেবতা, স্থির হও!

অথচ এইসব মানুষই আজ ভিন্ন রূপ ভিন্ন মন নিয়ে দাঁড়াত, যদি সত্যকার দায়িত্ব তাদের থাকত। কানাইবাবু একদিন তাঁদের বাড়ীর একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলের কথা বলেছিলেন—যাকে এখনও দাঁত মাজিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়া হয়, খাইয়ে দেওয়া হয়! সমগ্র দেশের আজ সেই অবস্থা। অথচ এই দেশের সৈনিক আফ্রিকায় জার্ম্মানদের সঙ্গে লড়াই করছে!

হঠাৎ তার মনটা সঙ্কুচিত, ম্লান হয়ে উঠল। কানাইবাবুর বাড়ীর সে ছেলেটি বাইশে ডিসেম্বরের বোমায় মারা গেছে। কানাইবাবুদের বাড়ীর একটা অংশ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, কানাইবাবু দেশত্যাগী। মনটা তার উদাস হয়ে উঠল। কানাই তাকে একদিন কমরেড বলে ডেকেছিল, তার জীবনের কথা বলতে চেয়েছিল—কিন্তু বলে নি। এমন কি দেখা করবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত ভঙ্গ করে তার অপমান করেছিল।

সে অবশ্য তার গোপন কথা জানে। গীতা তার জীবনের গোপন কথা। তারপর, কানাইবাবুর কার্য্যকলাপের মধ্যেও যেন একটা দুর্ব্বল জর্জ্জরতার আভাস পাওয়া যায়—সে যেন অসুস্থ। তবু কানাইবাবু ভদ্র—তবু তাকে প্রীতি না দিয়ে পারা যায় না। গুণও তার অনেক। তার এই শোচনীয় পরিণতির কথা মনে হ'লে নীলার অন্তরে আবেগের সৃষ্টি হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে রাগও হয়। তাকে কানাইবাবু একবার মনেও করলেন না তাঁর দুঃসময়ে বন্ধু বলে! নীলার মুখে সঙ্গে সঙ্গে বক্র হাসি ফুটে উঠল। গীতার কথাই মনে হয়নি, বিজয়দার কথাই ভাবেন নি কানাইবাবু—তার কথা মনে হবে কি করে?

ট্রাম থেকে নামল নেপী।

নেপীর জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নেপী বেরিয়েছিল শহরের ক্ষতি পরিদর্শনে। নীলাকে দেখেই সে বলে উঠল—বিশেষ কিছু না দিদি। প্রায় সব হিট্ই মিস্ করেছে।

নেপীকে এবং নীলাকে রাস্তার লোকে প্রায় ঘিরে ফেললে।

মুখচোরা নেপী মুখর হয়ে উঠল।

কোন রকমে তাকে টেনে বের করে এনে নীলা বললে—বাড়ী গিয়েছিলি?

বাঁচাল নেপী মুহূর্ত্তে মূক হয়ে গেল।

—যাস্ নি?

—ভুলে গেছি।

নীলা বারবার বললে—ছি! ছি! ছি!

—এখন যাব দিদি? অপরাধীর মত নেপী বললে। তারপরই আবার বললে—ও বেলায় হ'লেই ভালো হয় দিদি। গীতাদের ভিজিটিং আওয়ার আজ বড়দিন বলে দশটা থেকেই দিয়েছে। বিজয়দা আমায়

ওকে দেবার জন্যে কয়েকখানা বই দিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে আসতে হবে।

নীলা চুপ করে রইল।

নেপী বললে—তোমাকে একটা কলম দেবেন বিজয়দা।

—কে বললে?

—আমি জানি।

নীলা একটু হেসে বললে—তোকে কি দেবেন?

—আমাকে একটা কিট্‌ব্যাগ। ফার্স্ট-ক্লাস্ কিট্‌ব্যাগ। আমার কিন্তু এখানে ওখানে ঘুরতে ভারি সুবিধে হবে।

নীলা হাসলে। পাশের দোকানের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। নীলা বললে—তাড়াতাড়ি চল্। আমার আবার বড়দিনেও ছুটি নেই। জরুরী কাজ আছে।

নেপী বললে—তা হ'লে আমি বিকেলে যাব বাড়ী।

—সাড়ে চারটের পর। আমি আপিস থেকে এসে মোড়ে নামব। দু'জনে একসঙ্গে যাব।

—সেই ভাল হবে দিদি। নইলে, বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে—সে আমি—। নেপী তার পিতৃভীতিকে—ভাষায় বোধ করি ব্যক্ত করতে পারলে না।

সাড়ে পাঁচটা তখন অতীত হয়ে গেছে।

শ্যামবাজারের ট্রাম থেকে নীলা নামল আপনাদের বাড়ীর রাস্তার মোড়ে। গত রাত্রি থেকে তার অন্তর অধীর হয়ে রয়েছে বাবা, মা, দাদা, বৌদি এবং খোকনের জন্যে, কিন্তু ওবেলায় আর আসা ঘ'টে ওঠেনি। নেপী ন'টায় ফিরেই Blood Bank-এ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কানাইবাবু অসুস্থ হয়ে শুয়ে ছিলেন—তাঁর পক্ষে নেপীর সঙ্গে যাওয়া

সম্ভবপর হয়নি, নেপী নীলাকে ধরে বসেছিল। নেপীর ওই মুখচোরা স্বভাবটুকু আর গেল না। নীলা নিজেও Blood Bank-এ রক্ত দিয়েছে। ওখান থেকেই সে আপিসে চলে গিয়েছিল। নেপীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—বিকেল বেলা সেও এসে এই রাস্তার মোড়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে। দুই ভাইবোনে তারা সবিনয়েই মা-বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

রাস্তার মোড়ে কিন্তু নেপী নেই। নীলা অপেক্ষা ক'রে ফুটপাথে একটা গ্যাস-পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের দৃষ্টি এমনিধারার সর্ব্ববিধ পোস্টগুলোর ওপরেই আগে পড়ে। তা ছাড়া গতিশীল জনতার পথের মধ্যে গতিহীন স্থির হয়ে দাঁড়ালেই জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কিন্তু মাটির সঙ্গে কঠিনভাবে আবদ্ধ ওই লোহার পোস্টটাকে জনতাই পাশ কাটিয়ে যায়; সে-ক্ষেত্রে পোস্টের পাশে দাঁড়ানো নিরাপদও বটে।

কয়েকখানা এ-আর-পি লরী চলে গেল—এ-এফ-এস এবং খান-কয়েক এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ীও সঙ্গে রয়েছে। এ-আর-পি এবং এ-এফ-এস কর্ম্মীদের মাথায় এখন থেকেই লোহার হেলমেট উঠেছে; ট্রাফিক পুলিশের কাঁধেও ঝুলছে লোহার হেলমেট। সামনে রাস্তার ওপারে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে আজ এরই মধ্যে লোকের ভিড় প্রবল হয়ে উঠেছে; সন্ধ্যার পর যারা বাজার করে, তারা দিনের আলো থাকতেই বাজার সেরে নিচ্ছে। সম্মুখে নেমে আসছে জাপানী-বিমান-আক্রমণ-সম্ভাবনা-পূর্ণ রাত্রি। ছোটখাটো দোকানগুলো এখন থেকেই জিনিসপত্র সামলাতে আরম্ভ করেছে।

নেপী এল না। নীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নেপী মা-বাপের প্রতি এমন মমতাহীন কেন? এত হৃদয়হীন সে! আপনার মনের সকল সঙ্কোচ সবলে কাটিয়ে সে একাই অগ্রসর হ'ল। বাড়ীর কাছা-

কাছি এসে ব্যগ্রদৃষ্টিতে সে চাইলে বাড়ীর বারান্দার দিকে। বিকেলের দিকে তাদের বাড়ীর সামনের অপরিসর বারান্দাটুকুর উপর তার বাবা বসে থাকেন, কোলের উপর থাকে খোকনমণি। বাড়ীর বারান্দায় আজ বাবা বসে নাই, বারান্দার প্রান্তের রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নেপী! অধোমুখে মাটির দিকে চেয়ে আছে। নীলা বুঝতে পারলে—তার বাবা বিদ্রোহী সন্তানকে ক্ষমা করতে পারেন নাই। রুদ্ধ দরজা উন্মুক্ত হয় নাই। সে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল; —ওই রুদ্ধ দরজা সে গিয়ে দাঁড়ালেই কি খুলবে? পরমুহূর্ত্তেই সে অগ্রসর হ'ল। তবু তাকে যেতে হবে। তার কর্ত্তব্য সে করবে। ও বাড়ীতে স্থান তাকে তাঁরা না দেন, তাঁদের কুশল তাকে নিতে হবে।

বাড়ীর সম্মুখে এসে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ, থামের গায়ে একটা পেরেকে একটা বোর্ড ঝুলছে,—'To Let'।

নীলা ডাকলে—নেপী!

বোধ করি কোন গভীর চিন্তায় নেপী জ্ঞানশূন্যের মতই মগ্ন হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, নীলার উপস্থিতি পর্য্যন্ত সে জানতে পারেনি। নীলার আহ্বানে সে মুখ তুলে চাইলে, নীলাকে দেখে তার অভ্যাসমত বোকার মত একটু হাসলে।

নীলা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে—কি নেপী?

নেপী এবার অগ্রসর হয়ে এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। খামের উপরে তার বাবার হাতের অক্ষরে—তার এবং নেপীর নাম লেখা। খামখানা খোলা, নেপী খুলে পড়েছে।

নেপী বললে—আমাদের মুদীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। মুদী আমায় ডেকে দিলে।

দীর্ঘকালের বিশ্বাসী লোক মুদী, নীলা বাল্যকালে তার দোকানে লজেঞ্জুস কিনেছে,—বাড়ীর অনতিদূরেই তার দোকান।

নেপী বললে—ছোট খুকীটা মারা গেছে।

নীলা চমকে উঠল,—ছোট খুকী!

ছোট খুকী তার বৌদিদির বৎসর দেড়েকের কালের মেয়ে।

—হ্যাঁ। মুদী বললে, সে-ই সব ব্যবস্থা করেছে। বাবা একেবারে পাগলের মত হ'য়ে গেছেন,—তিনি পুলিশের কাছে সব খুলে বলতে চেয়েছিলেন।

দেবপ্রসাদের পক্ষে এ আঘাত কঠিনতম আঘাত। সকালবেলাতেই চিন্তা ক'রে তিনি ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—আজই তোমরা দেশে যাবার জন্য তৈরী হও। দেশে এখনও যা আছে, তাতে পল্লীর লোকের মত স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। পাঁচশ বিঘে জমি, বাগান, পুকুর—এ থেকে তোমার সংসার চলে যাবে। ছেলেদেরও চাষবাস করতে শিখিয়ো; লেখাপড়া যতটুকু না হ'লে নয় ততটুকু। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আমার নিষেধ রইল।

ছেলে কিছু বলতে উদ্যত হ'তেই তিনি বলেছিলেন—প্রতিবাদ ক'রো না। প্রতিবাদ যদি কর, তবে তোমার স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে তুমিও যাও আপনার পথে।

ছেলে আর কিছু বলে নি। সেও অবশ্য মনে মনে বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। সে নিরীহ শান্ত লোক। তরুণ আদর্শবাদী দেবপ্রসাদ কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে আপনার মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছামত সে এম-এ পাশ করেছে, দুঃখকষ্টকে সহ্য করে অম্লান মুখে, কিন্তু তার নিজের ব্যক্তিত্ব কিছু নাই। তার উপর তার কর্ম্মজীবনও শান্ত নিরীহ, স্কুলের সেক্রেটারী ও হেডমাস্টারশাসিত জীবন। ভালোমানুষ লোকটি মনে মনে হিসেব করে দেখলে—উত্তেজিত আহত বাপকে সসম্মানে মেনে নেওয়াই তার উচিত, সেও যদি কোন প্রতিবাদ করে তবে বাপ

হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। তা' ছাড়া তার বাপের সঙ্গে মত-পার্থক্য যেটুকু, সেটুকুর মীমাংসা করবার আজই কোন প্রয়োজন নাই। বোমার সময় কলকাতা থেকে দূরে সরে থাকতেই সে চায়; তবে চিরদিনের মত কলকাতা ছাড়তে সে চায় না। যুদ্ধশেষে—অথবা কলকাতার বিপদ কেটে গেলে তার মীমাংসা করলেই হতে পারবে। ততদিনে তার বাবাও শান্ত হবেন, নীলা নেপীও নিশ্চয় ফিরবে।

দেবপ্রসাদ বলেছিলেন—তোমার মা তোমাদের সঙ্গেই যাবেন। আমি যাব গুরুদেবের আশ্রমে। পরে যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাঁকেও সেখানে নিয়ে যাব। আমি আজ থেকেই সংসার ত্যাগ করলাম।

দেবপ্রসাদের মনের আঘাতের বেদনার পরিমাণ অনুমান করতে এ ছেলেটির বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। তারও চোখে এ কথায় জল এসেছিল, টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরেও পড়েছিল।

দেবপ্রসাদ কিন্তু অটল। ছেলের চোখের জলে তিনি লেশমাত্র বিচলিত হন নাই। বলেছিলেন—তোমার মায়ের—বউমায়ের গহনা যা আছে নিয়ে এস।

ছেলে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিস্মিত হয়ে।

দেবপ্রসাদ বলেছিলেন—বিক্রী করব। তোমার ভবিষ্যৎ-জীবনের মূলধন সংগ্রহ ক'রে দিয়ে যেতে চাই। সোনার গয়না, ভাল কাপড়, ভাল খাওয়া—এগুলোর প্রয়োজন চিরদিনের জন্য মিটে যাক্ তোমাদের।

ছেলে এবারও কোন কথা বলে নাই।

দেবপ্রসাদ বলেছিলেন—মত না থাকে—তোমরা যা ভাল বুঝবে, ক'রো। আমার দায়িত্ব এই মুহূর্ত্ত থেকেই শেষ হ'ল।

দেবপ্রসাদের স্ত্রী, পুত্রবধূ অন্তরাল থেকে সবই শুনছিলেন। এই কথার পর পুত্রবধূ নিজে এসে তার গহনাগুলি শ্বশুরের পায়ের তলায় নামিয়ে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও দিয়েছিলেন।

আজই দুপুরে তাঁরা কলকাতা থেকে চলে গেছেন। সকলে গেছেন দেশে—কাটোয়ার উপকণ্ঠে তাঁদের পিতৃপুরুষের গ্রামে; দেবপ্রসাদ একা কোথাও গেছেন, মুদী গন্তব্য স্থানের নাম জানে না। দেবপ্রসাদ যাবার সময় পত্রখানি দিয়ে গিয়েছিলেন মুদীর হাতে; নেপী বা নীলা যদি আসে—তবে সে যেন পত্রখানা দেয়।

দেবপ্রসাদ লিখেছেন দীর্ঘ পত্র; কঠোর নিষ্ঠুর ভাষা, ক্ষমাহীন অভিব্যক্তি। লিখেছেন—"আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম—জীবনের তরুণ শক্তির আবেগে তোমরা পৃথিবীর সকল জাতির মহত্ত্ব এবং সত্যকে গ্রহণ করে আপনাদের জীবনাদর্শের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চাও; আমাদের জীবনে, ধর্ম্মের নীতির উপর নূতন আলোকসম্পাত করে তাকে নব রূপে প্রকাশিত করতে চাও! কিন্তু আমার সে ভ্রম ভেঙেছে। দোষ হয়তো আমারই। শিক্ষার দোষে দেশের সত্যকার দেহ, প্রাণ ও আত্মার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা হারিয়েছ, তাকে তোমরা জানবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করনি, সে সম্বন্ধে তোমরা অজ্ঞ। তাই বিদেশীর ইতিহাস, বিদেশীর শাস্ত্র থেকে জীবনধর্ম্ম গ্রহণ করতে তোমরা দ্বিধা বোধ করনি। পরধর্ম্মের আত্মঘাতী চর্চ্চায় চরম ব্যর্থতার দিকে তোমরা উন্মত্তের মত ছুটেছ। নীলাকে সেদিন রাত্রে রঙ্গালয়ে বিদেশী সৈনিকদের সঙ্গে দেখে সে সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমরা সত্যকার জাতিত্যাগী—ধর্ম্মত্যাগী; আমার বহু পুরুষের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত যে মহনীয় কুলগৌরব, তাকে তোমরা খর্ব্ব করেছ—তাকে তোমরা ত্যাগ করেছ—তোমরা কুলত্যাগী। তোমাদের প্রতি আমার আর কোন মোহ নাই, মমতা নাই। তোমাদের চিত্তের শুচিতা নাই, চিন্তার সততা নাই, নীতিধর্ম্মকে বর্জ্জন করে কূটকৌশলকে তোমরা জীবনধর্ম্ম করে তুলেছ। ধর্ম্মনীতি, চরিত্রনীতি, হৃদয়নীতি সকল নীতিকে অস্বীকার ক'রে, কুলধর্ম্ম, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বর্জ্জন ক'রে—মানুষের সমাজে পশুতন্ত্রের

সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছ তোমরা; উদর তোমাদের সর্ব্বস্ব—দেহই তোমাদের মুখ্য। বিশ্বাস এবং ধ্যানানুভূতি-বিবর্জ্জিত তোমরা যুক্তিবাদের শাণিত অস্ত্রে আত্মাকে হনন করেছ। যারা দুর্ব্বল—যারা অধঃপতিত, মানুষের এই মহাসাধনক্ষেত্র পৃথিবীর বুকে যাদের নিজেদের পৃথক্ জাতি হিসেবে বাঁচবার মত সাধনার সামর্থ্য নেই—অধিকার নেই—তারাই এইভাবে মানবজাতি বা মহামানব নামক এক আত্মপ্রতারণাময় কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে পৃথিবীর অপর জাতির প্রসাদ ভিক্ষা ক'রে বেঁচে থাকতে চায়। দরিদ্র যেমন কাঙালপনাকে আত্মীয়তার দাবীর আবরণে ঢেকে ধনীর কাছে ভিক্ষা করে বাঁচতে চায়—তোমাদের এ নীতিও ঠিক তেমনি, তেমনি হীন, তেমনি ঘৃণার্হ, কোনও পার্থক্য নাই।

"তোমাদের আমি ত্যাগ করলাম, দুষ্ট অঙ্গের মত ত্যাগ করলাম। এজন্য কোনও বেদনা আমি বোধ করছি না বরং নিজেকে সুস্থ মনে করছি। কোনও অভিসম্পাত তোমাদের আমি দিচ্ছি না। কিন্তু তোমরা যদি আবার আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার চেষ্টা কর, আবার আমাদের কুলধর্ম্মে বিষ সঞ্চার করবার চেষ্টা কর, তবে তোমাদের আমি ক্ষমা করব না।"

নীলার মাথার মধ্যে উত্তেজিত রক্তস্রোতের আলোড়ন বয়ে গেল, রগের শিরা দুটো দপ দপ করে লাফাচ্ছিল। উত্তেজনা-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে নেপীর দিকে চাইলে।

নেপী ম্লান মুখে সেই বোকার হাসি হাসলে। বললে—বাবা খুব রেগেছেন। তার ওপর এই খুকীর মৃত্যু, খুব আঘাত পেয়েছেন কিনা।

নীলার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। কালধর্ম্মে দুর্ব্বল বিহঙ্গদম্পতির শাবকেরা জড়তাহীন পক্ষের সবলতার আবেগে বিহঙ্গম-জীবনের মর্ম্ম-লোকের প্রেরণায় ঊর্দ্ধলোক আবিষ্কারে যেদিন যাত্রা করে—সেদিন দুর্ব্বলপক্ষ বিহঙ্গম-দম্পতি এমনি বেদনায় অধীর হয়ে এমনি কথাই বলে।

তারা ভুলে যায় যেদিন তারা আপনাদের পিতামাতার আশ্রয়নীড় পরিত্যাগ ক'রে যাত্রা করেছিল সেদিনের কথা। শাবকের যাত্রা—তাদেরই যাত্রার পরবর্তী জীবনপ্রবাহ, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি—তাদের গতিরই পরিণতি, সে কথা ভুলে যায়। চক্রাকারে নিরন্তর ঊর্দ্ধলোক প্রয়াণে—তাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে গেলেই; তাঁদের কল্পনার পথে চলতে না দেখলেই তারা তাদের পথভ্রষ্ট ভেবে ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ হয়, তিরস্কার করে।

সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাড়ীর বারান্দা থেকে নেমে নেপীকে ডাকলে—আয়—অনেকটা পথ যেতে হবে।

আকাশে কৃষ্ণপ্রতিপদের চাঁদ উঠছে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেশব সেন স্ট্রীটের ভেতর দিকটায় সাধারণত খুব ভিড় থাকে না। তার উপর গত রাত্রির আতঙ্কের ফলে রাস্তাটার এখানটা প্রায় জনশূন্য। শীতও ঘন হয়ে উঠছে, উজ্জ্বল তাম্রাভ সাদা জ্যোৎস্নার মধ্যে শহরের ধোঁয়া কুয়াশার মত বোধ হচ্ছে।

নেপী ডাকলে—দিদি—!

—হুঁ! বলে নীলা সঙ্গে সঙ্গেই হন হন করে চলতে আরম্ভ করলে। তার দ্রুত পদক্ষেপের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে, নেপী একটু বিস্মিত হ'ল। সে বরং আজ অবসন্নতা বোধ করছে, যেতে যেতেও কয়েকবার সে নিজেদের দীর্ঘকালের বাসাবাড়ীটির দিকে ফিরে চেয়ে দেখেছে। সে ডাকলে—দিদি!

নীলা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল—সে ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—নেপী!

—একটু আস্তে চল না দিদি।

—আয়! আয়! নীলার কণ্ঠস্বরে সুপরিস্ফুট বিরক্তি। বলেই সে আবার ফিরে অগ্রসর হ'ল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে—বললে—কে?

ধূসরধূসর জ্যোৎস্নার মধ্যে পাশেই একটা বাড়ীর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ।

—দুটো পয়সা দেবে, মা? সারাদিন কিছু খাই নি!

আশ্চর্য্যের কথা, নীলা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল লোকটার উপর। রূঢ়স্বরে সে বললে—না! বলেই সে তার দ্রুতগতিকে আরও দ্রুত করে তুললে। মনের মধ্যে তার ঝড় উঠে গেছে। চিঠিখানা পড়ে প্রথমে সে নিজেকে সংযত করেছিল, হয়তো তার কারণ ওই শিশুটির শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ। কিন্তু ক্রমশই তার বাপের তীব্র নিষ্ঠুর কথাগুলি তীব্রতর হয়ে তার মর্ম্ম-মণ্ডলে গভীরতর প্রদেশে বিদ্ধ হয়ে চলেছে। চোখদুটি প্রখর দীপ্তিতে ভরে উঠেছে। "চিত্তের শুচিতা নাই, চিন্তার সততা নাই, কর্ম্মের সাধুতা নাই।" ধর্ম্মান্ধদের চিরকালের গালাগালি। ধ্বংসোন্মুখ বর্ত্তমানের তীব্র বিষে ভরা অভিসম্পাত নবজীবন-সম্পন্ন ভবিষ্যতের প্রতি। মহনীয় কুল-গৌরব? যুগ-যুগান্তরব্যাপী দাসত্ব করে—গড়িয়ে গড়িয়ে তোমরা গৌরব কর—তোমরা ব্রহ্মার মুখ-উদ্ভূত—তোমাদের সে গৌরব স্বীকার না ক'রে তারা স্বীকার করে, জীব-জীবনের বিবর্ত্তনের ধারায় পৃথিবীর সকল মানুষের মত তারাও বন্য গুহাবাসী আদিম মানুষের বংশধর; কারও সঙ্গে কারও প্রভেদ তারা মানে না। স্বপ্ন-কল্পনাকে না মেনে—তারা মানে বিজ্ঞানকে, সেই তাদের অপরাধ! অধঃপতনের—ধ্বংসের শেষ ধাপে পৌঁছেও কুলগৌরব, চিত্তের শুচিতা?—পরের চিত্তকে হীন ভাবলেই নিজের শুচিতা পরের কাছে না-হোক নিজের কাছে প্রমাণ করা যায় বটে। রাগে, ক্ষোভে অধীর হয়ে সে এমনি ভাবেই আপন মনে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল তার বাপের লেখা পত্রের কথাগুলিকে।

না। সে কোন কথাই স্বীকার করবে না, কারও কথাই না। যে অকারণ সন্দেহে তার বাপ তাকে নিষ্ঠুরতম অপমান করেছে—! হঠাৎ মনে হ'ল, আরও একজন করেছে; অভিনয় দেখতে গিয়ে জেম্স এবং

হেরম্ভের সঙ্গে তাকে দেখে—কানাইয়ের দৃষ্টিতে কথাতেও এমনি ভঙ্গি ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল—; সে সন্দেহকে আর অকারণ রাখবে না। তারা যদি তাকে চায়, যদি না ও চায়—তবে সে তো তাদের জয় করে চাওয়াতে পারে। কিসের সঙ্কোচ? কেন সঙ্কোচ? সে পশু-নারী নয়। যদি সে তাদের কারো কাছে ধরাই দেয়—তবে তারা শেকল দিয়ে বেঁধে পোষ মানাবে না; কিম্বা কুলগৌরব রক্ষার্থে নিজেকে তার কাছে দেবতা বলে জাহির করবে না; অথবা বোরখা পরিয়ে—অসূর্য্যম্পশ্যা ক'রে হারেমে তালাবদ্ধ করেও রাখবে না। এদের চেয়ে ওই বিদেশীরা অনেক ভাল!

তাই করবে সে!

নেপী অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল, সে সেই লোকটির প্রসারিত হাতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পকেটে খুঁজে দেখছিল পয়সা। পয়সা আজকাল মেলে না—ডবল পয়সা।

(সাতাশ)

নীলার মূর্ত্তিতে ফুটে উঠল তার মনের রুক্ষতা। নেপী তাকে দেখে ভয় পেলে। বিজয়দা তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন—মুখে কিছু বলেন নাই।

সেদিন রবিবার। নীলা এসে বললে—বিজয়দা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

হেসে বিজয়দা বললেন—বল! শুনতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কেবল ঘুমের সময়টা বাদে। সেই কারণেই ভাই আজীবন আমি কুমারই রয়ে গেলাম।

নীলা কিন্তু রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। বললে—আমার দু'জন ইংরেজ বন্ধু আছেন। সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

তাঁরা যদি এখানে কোন দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, কি—আমিই তাঁদের আসতে বলি—তবে কি আপনার আপত্তি হবে ?

—আপত্তি কেন হবে ? আর যদি আপত্তি করি—তুমিই বা শুনবে কেন ?

—শুনতে হবে বই কি। কারণ এ বাসা আপনার।

—বাড়ীর ভাড়াটা আমার নামে, কিন্তু তোমরা ত খরচ দিয়েই থাক। তোমার অধিকার তো আমার চেয়ে কম নয়।

নীলা চুপ করে রইল।

বিজয়দা হেসেই বললেন—তোমার মত শাণিতবুদ্ধি মেয়ের কাছে—এই স্থূল বাধাটা কেমন করে পথরোধ করে দাঁড়াল তা বুঝলাম না; এটা তো আমাদের ভাগা-ভাগির ঘরের অতি সাধারণ মেয়ের কাছেও তুলোর তুল্য; ফুৎকারে উড়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে শেখাবুলি—আমারও ভাগ আছে।

কথাটা নীলাকে একটু বিদ্ধ করলে। কিন্তু তার বলবার কিছু ছিল না, কারণ ব্যাপারটার কানে কড়া মোচড় দিয়ে এমনধারার চড়া পর্দায় সুর বেঁধেছে সে-ই প্রথম।

বিজয়দা'ও আর কিছু বললেন না। তাঁর বোধ হয় কাজের তাড়া ছিল—স্নান করতে চলে গেলেন। স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন—নীলা তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সস্নেহে তিনি বললেন—নীলা ভাই, এখনও স্নান কর নি, খাও নি ?

নীলা উঠে বললে—এই যাচ্ছি।

হেসে বিজয়দা বললেন—আমার কথায় কি তখন দুঃখ পেয়েছ নীলা ভাই ?

—নাঃ। বলে নীলা চলে গেল।

স্নান করে ফিরে এসে সে দেখলে বিজয়দা ব্যাগ গুছিয়ে বিছানা

বাঁধবার চেষ্টা করছেন। সে থমকে দাঁড়ালো। বিজয়দা বললেন—কয়েকদিনের জন্যে বেরুচ্ছি ভাই।

নীলা সবিস্ময়ে বললে—কনফারেন্স? কোথায়? শুনিনি তো কিছু?

—না না, কনফারেন্স নয়, কাগজের কাজে। ঈস্ট বেঙ্গলের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি। ওদিক থেকে নানারকম চিঠি পাচ্ছি। অবস্থা নিজের চোখে দেখা দরকার।

—কি হয়েছে?

—পার্টির আপিসে শোন নি? সেখানে তো খবর এসেছে। পরক্ষণেই হেসে বললেন—ও—আজকাল পার্টির আপিসে তুমি বড় যাও না।

নীলা একটু চুপ করে থেকে বললে—আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ বিজয়দা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—জানি ভাই। কিন্তু সহ্য তো করতেই হবে।

নীলা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজয়দা বললেন—"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন না করি আমি ভয়।"

ভয় করলে তো হবে না ভাই। স্থির হয়ে সহ্য করতে হবে। পৃথিবীব্যাপী দুর্যোগ আমাদের জীবনের বহুকালের দুর্যোগকে আরও ঘন করে তুলেছে। আমাদের পার হতে হবে নীলা।

এ কথারও কোন উত্তর নীলা দিলে না।

যাবার সময় বিজয়দা হেসে বললেন—আমি থাকছি না। ফিরতে আমার কয়েক দিন দেরিই হবে, পনেরো দিনও হতে পারে। শ্রীমান নেপী আর শ্রীমান ষষ্ঠীর ভার তোমার ওপরেই রইল। একটা যাতে সময়ে খায় আর অপরটা যাতে সময়ে রাঁধে লক্ষ্য রেখো। নেপীটা বাইরে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করতে ভুলো না—পয়সা আছে কি না, না থাকলে দিয়ো।

ষষ্ঠীকে রোজ জিজ্ঞাসা ক'রো কালকের পয়সা আছে কিনা—এবং নিত্য হিসেব আদায় ক'রে যা থাকবে নিয়ে খুঁটে বেঁধো।

নীলা আবার একটু হাসলে।

বিজয়দা কাছে এসে বললেন—একটু সাবধানে থেকো ভাই। আমার অনুরোধ রইল—আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু আস্তে হেঁটে চ'লো।

নীলা বললে—কিসের জন্যে যাচ্ছেন বললেন না?

—নেপীকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আবেগপূর্ণ ভাষায় ও বলবে ভাল। আমার ট্রেনের সময় সত্যিই নেই।

বোমার আতঙ্ক অনেকটা কমে এসেছে। মানুষের প্রথম বিহ্বলতা কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে নীলার একটা ধারণা পাল্টাচ্ছে। নতুন যুগের আধুনিক মেয়ে—তার জীবনে সে একটা আদর্শকেও গ্রহণ করেছে; যার জন্য এতকালের প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাসকে ত্যাগ করলেই চলবে না, মাটির বুক থেকে তাকে মুছে ফেলতে হবে; কেননা তার আদর্শের সকল কাম্য পার্থিব, বাস্তব। ও আদর্শকে ধ্যানযোগে উপলব্ধি করে সার্থক করা যায় না। অপর সকলের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে একা পালন করব বললে পালন করাও যায় না। সমগ্র সমাজে সার্ব্বজনীনতায় যার সম্পূর্ণতা, একজনের মধ্যে তার সার্থকতা অসম্ভব। তাই সে তার আদর্শকে ছড়িয়েও দিতে চায়। এজন্য তাকে চেষ্টা করে সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে, নিজের ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করতে হয়েছে—যার ফলে অনিবার্য্য রূপে এসেছে কতকটা রূঢ়তা; তার আদর্শের বিপরীত সকল কিছুর উপর বিদ্বেষের সঙ্গে অস্বীকারের প্রবৃত্তি। অনেকে বলে—ঘৃণাও আছে; ধর্ম্মের গোঁড়ামির সঙ্গে যারা এই মনোভাবের তুলনা করে। তার উপর নীলা ঐ ঘটনার পর থেকে ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকেও রূঢ় হয়ে উঠেছে। তাই কলকাতা থেকে যখন দলে দলে লোক আকস্মিক নিতান্ত অজানা মরণ-আক্রমণের

বায়ে—দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে ছিল তখন ঘৃণায় বিদ্বেষে অধীর হয়ে বারবার বলেছিল—জানোয়ার, শেয়াল কুকুরের মত জানোয়ার সব।

কোথায় আজ মানুষ বিপদের মধ্যে সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে—মরণ-সমুদ্র মন্থন করে আহরণ করবে অমৃতপূর্ণ অক্ষয় পাত্র, তা—না, তারা পালাচ্ছে! আকস্মিক ত্বরিত মৃত্যুর আক্রমণ থেকে পালিয়ে চলেছে—তিল তিল করে মরতে; অনাহারে—রোগে—পশুর আক্রমণে!

নেপীর চোখও জ্বল জ্বল করে উঠেছিল। শহরতলীর ফ্যাক্টরীগুলির শ্রমিকদের মধ্যে সে এখন তাদের সংঘের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে; ভীত সন্ত্রস্ত পলায়নপর শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছে; তাদের পলায়ন-মনোবৃত্তি ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে। সে বলেছিল--জানোয়ারেরও অধম, দিদি! শেয়াল কুকুরেও তেড়ে আসে। ওঃ, কি যে কষ্ট হচ্ছে আমার সে কি বলব। তার ওপর মালিকরা! কিছুতেই মজুরী বাড়াতে রাজি নয়। ডেঞ্জার এলাউন্স নিয়ে গোলমাল করছে। ওদের সঙ্গে এদের কোন তফাৎ নেই।

একটু পরে আবার বলেছিল—আজ যদি কানাইদা থাকতেন,—উঃ তবে যে কি রকম কাজ হ'ত!

—কে? কানাইবাবু? নীলা ব্যঙ্গ করে হেসে উঠেছিল।

—হাসছ কেন?

—হাসব না? নীলা আরও জোরে হেসেছিল।

অনুযোগ করে নেপী বলেছিল—কত বড় আঘাত তিনি পেয়েছেন ভেবে দেখ দেখি।

—তিনি আঘাত পেয়েছেন তার জন্যে আমি দুঃখিত, তাই বলে তাঁর ভয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও মাফ করতে হবে নাকি? আমাদের বড়খুকীর অসুখে, ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছিল ব'লে—ডাক্তারে তার ভয় হয়ে

গিয়েছিল। ডাক্তার চিনতো সে স্টেথস্কোপের রবারের নল দেখে। রাস্তার ধারে গড়গড়ার নলওয়ালাকে দেখে তাকেও ডাক্তার মনে করে ভয়ে কেঁদে-ককিয়ে যেত। আমরা হাসতাম। এও তাই। কলকাতায় একদিন আকস্মিকভাবে বোমা প'ড়ে তাঁদের বাড়ীর কয়েকজন মারা গেছেন—ব্যস্—থুকীর মত রবারের নল মাত্রেই স্টেথস্কোপ—অমনি তিনি কলকাতা থেকে তাঁর মা-বাপের আঁচল ধরে সরে পড়লেন। কেন? কলকাতায় থাকলেই ওই বোমার আঘাতে-অপঘাতে জীবন চলে যাবে। তোর কানাইবাবু একটা কাউয়ার্ড।

তর্কটা চলছিল বারান্দায়। বিজয়দা ছিলেন ঘরের মধ্যে, গভীর একাগ্রতায় তিনি একখানা বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। একবার তিনি ঘরের ভিতর থেকে ডেকে বলেছিলেন—বেচারা নেপীকে একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে ভাই! কিন্তু তবুও তুমি নেপীকে বিমুখ করতে পারবে না। ও ব্রজরাখালটির প্রাণকানাইপ্রীতি জীবনের চেয়েও গাঢ়।

নেপী আরক্ত মুখে বিজয়দার কাছে এসে বলেছিল—আপনিও কি তাই বলছেন বিজয়দা?

—কি?

—দিদি যা বলছে। কানাইদা পালিয়েছেন।

—না। ব্যথিতের মতই ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বাক্যভঙ্গিতে অস্বীকার করে বিজয়দা বললেন—না। সে আমি মনে করি না।

—কেন বিজয়দা? নীলা এসে সামনে দাঁড়াল।

—শুধু কানাইয়ের কথাই নয়। মানুষদের সম্বন্ধেও তোমরা দু'জনেই যা বললে তাও আমি স্বীকার করি না। তারা জানোয়ার নয়—তারা অধমও নয়। তারা মানুষ। তাদের ভিতরে পরিপূর্ণ বিকাশকামী মনুষ্যত্ব অধীর আগ্রহে আপনাকে প্রকাশ করতে চাইছে। তোমার

আমার মতই চাইছে। আবার তাদের ভয়ও আছে, সেও ঠিক। এ ভয় ওদের ভাঙবে, অপেক্ষা কর, কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখবে, তারা ভয়কে অতিক্রম করে মানুষের মত দাঁড়াচ্ছে। . .

নীলা বলেছিল—আগে কানাইবাবুর কথাই বলুন। কানাইবাবু তাহ'লে ওই দলের তো!

—সেও তো মানুষ। তা—ছাড়া—

—বাস্। আর কিছু শুনতে চাইনে।

হেসে বিজয়দা বলেছিলেন—আরও কিছু শুনতে হবে। কারণ কানাই ভয়ে পালিয়ে গিয়েও থাকতে পারে আবার রাগের বশে সে R. A. F-এ যোগ দিয়েও থাকতে পারে।

—কিসে? কিসে যোগ দিয়ে থাকতে পারেন? নীলার দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—R. A. F.—নিজেদের বাড়ীর বমিং-এর শোধ নিতে চায় হয় তো সে!

—আপনি সত্যি বলছেন? আপনাকে কি তিনি জানিয়েছেন?

—না। আমার অনুমান।

—অনুমান! সে সত্যি না-ও হতে পারে।

—পারে বই কি। আবার ঠিক তেমনি তোমার অনুমানটিও মিথ্যে হতে পারে এবং আমারটাই সত্যি হতে পারে। আবার দুটোর কোনটাই সত্যি না হতে পারে। তবে আমার ধারণা নীলা, কানাই সত্যকারের মানুষ। তার ভেতরের মানুষকে যে আমি স্পর্শ করেছি। সে তো হীন কিছু করতে পারে না।

সেদিন তর্কের সমাপ্তি ওখানেই হয়েছিল। কানাইবাবুর সন্ধান আজও মেলেনি। নীলা বিশেষ করে বিজয়দার অনুমানটা অসত্য প্রমাণ করবার জন্যই ব্যগ্র হয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। জেমস্ এবং

হেরল্ড দু'জনেই R. A. F-এর কর্মী। কয়েকদিন এস্প্ল্যানেডে অপেক্ষা করে জেম্‌স এবং হেরল্ডের সঙ্গে দেখা করেছে। এখন তার প্রায় নিত্যই দেখা হয় তাদের সঙ্গে। কানাইয়ের কোন সঠিক সংবাদ তারা আজও দিতে পারে নাই, কিন্তু নীলার সঙ্গে তাদের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। সে তাদের এখানে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু বিজয়দা যাবার সময় বলে গেলেন—একটু আস্তে হেঁটে চ'লো।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বিজয়দার কথার মধ্যে কখনও আদেশের সুর থাকে না। সত্যিই বিজয়দা কখনও কাউকে আদেশ করেন না। আজও করেন নাই। করলে হয় তো ভালো হ'ত। নীলা বিদ্রোহ করে তাঁর আদেশ উপেক্ষা করতে পারত।

বিজয়দা বাইরে গেলেন, দিন পনেরো হবে ফিরতে। আজ বিশে জানুয়ারী; ফেব্রুয়ারীর পাঁচ ছয় তারিখে ফিরবেন। ভালো, ফিরেই আসুন।

নেপী গত পরশু থেকে বেরিয়েছে। আজ সকালে তার ফেরবার কথা ছিল। এখনও ফিরল না। ফিরবে কিনা—তাই বা কে বলতে পারে।

বিছানার উপর শুয়ে পড়ে—কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। সপ্তাহে রবিবারই তার ছুটি। এই দিনটাই তার পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর দিন। অন্যদিন কাজের মধ্যেও সময় কেটে যায়। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে ক্লান্ত দেহে সে প্রায় এলিয়ে পড়ে। অন্যদিন বিজয়দা থাকেন—নেপীও থাকে। আজ অন্তত নেপীটা থাকলে ভালো হ'ত। দেশের অবস্থা নেপী খুব আবেগময়ী ভাষায় বলতে পারত। অলস উদাস দৃষ্টি ফেরাতে ফেরাতে তার নজরে পড়ল বিজয়দার খবরের কাগজের ফাইলটা। সেটাই সে টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল।

খবরের কাগজ সে নিয়মিতই পড়ে গিয়েছে। কিন্তু সে দিনের সেই ঘটনার পর থেকে কোন সংবাদই তার মনে রেখাপাত করে নাই।

রুগ্‌ণ অসুস্থ জনের স্নেহাতুর আত্মীয়েরা সস্নেহ উৎসঙ্কিত দৃষ্টিতে রোগীর দিকে চেয়ে যেমন ভাবে বিশ্বসংসারকে ভুলে বসে থাকে, তেমনি ভাবেই তার চিত্ত তার বেদনাহত জীবনকে কেন্দ্র করে বাইরের সকল কিছুকে ভুলে রয়েছে।

ফাইলটা উল্টেই পয়লা জানুয়ারীর কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা ব্যঙ্গচিত্র। সাদা ফিতেয় বাঁধা একটা বোমা; গায়ে লেখা 'মেড ইন জাপান'। ফিতেতে বাঁধা একখানা কার্ডে লেখা রয়েছে—To our friends and well-wishers, from General Tojo.

আজ জাপাননিয়ন্ত্রিত বার্ম্মা-মুলুকের কাগজে কি বেরিয়েছে কে জানে? পাশেই বড় বড় অক্ষরে সোভিয়েটের বিজয়বার্ত্তা। একশো ত্রিশ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে তারা অগ্রসর হচ্ছে। হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হচ্ছে। অখণ্ড হিন্দুস্থান দাবী করেছেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা হয়েছে। সে পাতাটা উল্টে দিলে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের পৃষ্ঠা। এখানেও একটা ছবি। ছবিটা ভাল লাগল। রণদানব পাক দিয়ে দিয়ে নাচছে, তার গায়ে লেখা—৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩—। এইবার সে মাটির দিকে চেয়ে তুড়ি দিয়ে বলছে—এসো এসো। মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কালসার, ক্রুদ্ধদৃষ্টি, লোলুপ হাঁ করা, প্রায় নগ্না এক বিভীষিকাময়ী নারীমূর্ত্তি। সে দুর্ভিক্ষ। তার পায়ের তলা থেকে আরও একটি মুখ উঁকি মারছে। সে মুখের আবার চামড়ার আবরণও নাই।—সে মহামারী। আকাশে উড়ছে চিল শকুনি, গোলা ফাটছে, প্লেন উড়ছে, ধোঁয়ায় সূর্য্য দেখা যায় না, সমস্ত ঝাপ্‌সা। নীচে লেখা নববর্ষ ১৯৪৩।

ছবিখানা দেখতে দেখতে তার মন অভিভূত হয়ে গেল। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি ১৯৪৩ এই ভয়াবহ রূপ নিয়ে আসছে? সম্পাদকীয় মন্তব্যের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল—

"Into the roar of cannon, the clang of steel, the wail

of the fallen and subjugated has come the new year. আমাদের দেশে—বিশেষ করে বাংলাদেশে—এ বৎসরের এক ভয়াবহ রূপ কল্পনা করে আমরা শিউরে উঠছি।"

নীলার শরীর সত্যই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

পাতার পর পাতা সে উল্টে গেল।

লণ্ডনের খবর—1933. A year of offensive. রাশিয়া এবার আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। Hitler's warning to Germans. হিটলার জার্ম্মাণীকে সাবধান করেছেন।

নীচে ছোট্ট একটি খবর নজরে পড়ল—Looting of "Hat". Police open fire killing one and injuring a bazar-man; চাপাডাঙ্গার হাট লুট হয়েছে। নীলা স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে হ'ল, ওইখানেই ঠিক মাটির তলা থেকে ছবির মূর্ত্তিটা উঠেছে।

আবার সে পাতা উল্টাল—"কলকাতার চালদালের দোকানদারদের সরকার নূতন নির্দ্দেশ দিয়েছেন।" "খাদ্য-সমস্যায় ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবের উক্তি।" তিনি বলেছেন—এর পূর্ব্বে এদেশ থেকে আটত্রিশ হাজার টন চাল চালান হত সিলোনে। বর্ত্তমানে খাদ্যশস্যের সঙ্কট আশঙ্কা করে সেটাকে মাত্র বারো হাজার টনে কমিয়ে আনা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি না হ'লে আগামী মার্চ্চ থেকে চাল চালান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

"Malavyaji's confidence in democratic victory. War to continue another year and a half." ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ Blood-Bank-এ রক্ত দেবার জন্য বলেছেন—"We must make the Blood-Bank our national asset."

একজন এম, এল, এ, প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন—"সিকিউরিটি এবং অন্য ধারার রাজবন্দীদের কলকাতার জেল থেকে অন্য জেলে

রাখার ব্যবস্থা হোক। কারণ তারা বন্দী। এবং কলকাতায় এখন বিমান-আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।"

নীলার মনে পড়ে গেল গুণদাবাবুকে। গুণদাবাবুর স্ত্রীকে।

আবার সে পাতা উল্টাল। "Food supply at cheap rate." আগামী বুধবারে দুঃস্থ মধ্যবিত্তদের জন্য সস্তা ভোজনালয় খোলা হচ্ছে। মাননীয় বাণিজ্যসচিব নিজে দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন।

দমদমে ট্রেনে কলিশন হয়েছে।

"Dacoitees in Bengal"—মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বর্দ্ধমানে ডাকাতি হয়েছে।

"India's sterling debts. Heavy reduction." ভারতবর্ষের ইংলণ্ডের কাছে ঋণ হু-হু করে শোধ যাচ্ছে। ৩৬৭ মিলিয়ন ছিল, এখন সেটা কমে ১০০ মিলিয়নেরও কমে দাঁড়িয়েছে M. ভারতের বস্ত্র-সঙ্কটে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কাগজের অভাব ঘটেছে দেশে: বিশ্ববিদ্যালয় কাগজের জন্য বিষম কষ্টে পড়েছেন।

সংবাদপত্রের উপর মান্দ্রাজ-সরকারের কঠোরতা।

নীলা কাগজের ফাইলটা বন্ধ করে দিলে। মনে পড়ল সংবাদপত্রের বর্ত্তমান অবস্থা। সে দৃষ্টি তুলে চাইলে অন্যদিকে। হঠাৎ তার মনে হল—কুরুসভায় সঞ্জয় নাগপাশে আবদ্ধ হ'লে—গীতার চেহারাটা কেমন হ'ত? সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে।

প্রত্যাশা করে রইল—নেপী ফিরে এলে তার কাছেই সে শুনবে। বিজয়দা ফিরলে শুনবে। মনশ্চক্ষে ওই ছবিটা শুধু ভাসতে লাগল। ১৯৪৩-এ মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ, তার পিছনে আসছে মহামারী, আকাশ বারুদের ধোঁয়ায় কালো, প্লেন-শকুনি মিশে যেন এক হয়ে গেছে। ঝাপ্‌সা—চারিদিক ঝাপ্‌সা।

নীচে কড়া নড়ে উঠল। নীলা ব্যস্ত হয়ে উঠে এল। হয় নেপী নয় সেই কঙ্কালসার অন্নবঞ্চিতের দল, বিজয়দার এখানে যারা ক'জনে প্রায় নিয়মিত আসে তারাই। শুধু বিজয়দাই নয়, আশ্চর্য্যের কথা ও-পাশের অংশের ছা-পোষা মানুষ কেরাণী ভদ্রলোকটিও এই দুর্মূল্যতার বাজারে লোক এলে সাধ্যসত্ত্বে ফেরান না।

সে নীচে নেমে গেল।

নেপী নয়, তারাও নয়—গীতা।

এক মাসের মধ্যে গীতার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে এখন একা যায় আসে। চমৎকার কথা বলে।

—গীতা!

একটু হেসে গীতা বললে—ভাল আছেন নীলাদি?

—হ্যাঁ এসো।

—বিজয়দা আছেন?

—না। তিনি বাইরে গেছেন। পনেরো দিন ফিরবেন না।

একটু চুপ করে থেকে গীতা বললে—পনেরো দিন?

—হ্যাঁ।

—নেপীদা আছেন?

—না। সে আজ তিন দিন থেকে ফেরেনি।

গীতা কয়েক মুহূর্ত্ত বসেই বললে—তবে আমি যাই।

—যাবে?

—হ্যাঁ। গীতা উঠল। নীলার মনে হয় গীতা যেন তার কাছে কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারে না।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে গীতা বললে—নীলাদি?

—বল!

—কানাইদার কোন খবর পাওয়া যায় নি?

—না। নীলা সত্যই দুঃখিত হ'ল গীতার জন্য।

গীতা চলে গেল।

নীলার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। কানাই এ'কে উপেক্ষা করে অন্যায় করেছে। চরম অন্যায় করেছে। কিছুক্ষণ পরে আবার তার মনে হ'ল—অদ্ভুত মানুষ! পৃথিবী জুড়ে এই দুর্যোগের ঘনঘটা। আকাশ বারুদের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে সূর্য্যের আলোও আর দেখা যাবে না। পৃথিবী বন্ধ্যা হয়ে যাবে হয়তো ট্যাঙ্কের লোহার চাকার দলনে। মানুষ এরই মধ্যে অনাহারে মরতে আরম্ভ করেছে। রাত্রিতে শুয়ে ঘুমোবার অবকাশ নেই মানুষের। আকাশ থেকে নেমে আসছে মৃত্যুগর্ভ বোমা। কুটীর-প্রাসাদ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তবু এরই মধ্যে গীতার ঘর বাঁধবার সাধ! তার চেয়ে, ঘটনাসংস্থানে সে যেখানে গিয়ে পড়েছে—তাতে তার ভালোই হবে!

আবার কিছুক্ষণ পর—তার মনে পড়ল পুরাণে পড়া প্রলয়দিনের কথা। জল স্থল অন্তরীক্ষ অন্ধকার হয়ে আসবে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যাবে। শূন্যলোক পরিব্যাপ্ত করে আসবে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। বজ্র। জলোচ্ছ্বাস। ভূমিকম্প। সৃষ্টিলয় হবে! সেদিন ভগবান কেবল রাখবেন না কি একটি মানব আর একটি মানবীকে? সেই প্রলয়-দুর্য্যোগে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না সে কথা প্রতিজনেই জানে, তবু মানবটি আঁকড়ে ধরে বসে থাকবে মানবীটিকে, মানবীটিও আঁকড়ে ধরবে মানবটিকে। শুধু কি ওই দু'টি জনই এমনই করে থাকবে? নীলা সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও যেন দেখতে পাচ্ছে প্রতি মানব মানবী এমনি ভাবে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবে।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

আবার কড়া নড়ল।

এবার সেই কঙ্কালের দল!

—ভাত! ছুটো এঁটো-কাঁটা!

অপরাহ্নে নেপী এল। নেপী একা নয়। জেম্‌স এবং হেরল্ডকে নিয়ে সে এসেছে।

নীলা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালে—আসুন—আসুন।

(আটাশ)

বিজয়দার চিঠি এল। পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রাম থেকে লিখেছেন। খাম কেটে আবার সিপ এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খামের উপরে রবার স্টাম্প মারা রয়েছে—"Opened by inland censor"; চিঠিপত্র পরীক্ষা করে পাঠানো হচ্ছে। চিঠিখানা হাতে নিয়েই তিক্তচিত্ত নীলার মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। রাশিয়াতেও কি censor আছে? আছে বোধ হয়। বোধ হয় নয়—নিশ্চয় আছে। অনুমান তার তাই। কারণ ঘরভেদের কূট কৌশলটা আদিম যুগ থেকেই আছে। প্রথম সভ্যতার যুগ থেকে ঘরভেদীদের ঘৃণা করে মানুষ; আজও ঘৃণা করে, কিন্তু কমে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রবিবাদের কূটকৌশল নীতি-পদবাচ্য হয়েছে। নিজের দেশের ঘরভেদীদের ঘৃণা করে এবং ধরতে পারলে হত্যা করে, কিন্তু শত্রুপক্ষের ঘরভেদীর সন্ধান পেলে তার সুযোগ নিতে কেউ দ্বিধা করে না। তাই ঘরভেদীর অস্তিত্ব সব দেশেই আছে। মতবাদের ভেদ নিয়ে—মানুষ—দেশের মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়। এ'কেই বলে রাজনীতি। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলে ষাঁড় ভাবে তার প্রতিষ্ঠা হবে। যে ষাঁড় কৌশলে তার শত্রুকে বাঘ দিয়ে বধ করাতে পারে সে ষাঁড় বিচক্ষণ বলেই কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু তারপর কি হয় সেটা ওই নীতিকথার মধ্যে না থাকলেও ইতিহাসে আছে। মানুষের হয় তো দোষও নাই। কারণ ওটা জীবনের বিবর্ত্তনের পথের একটা অত্যন্ত সুবিধাজনক অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা আজ জৈব

প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। মানুষকে মানুষের অবিশ্বাসও ঠিক ওই রকমই একটা জৈব প্রবৃত্তি।

চিঠিখানা সে খুলে ফেললে- সংক্ষিপ্ত চিঠি। নিজের কুশলসংবাদ জানিয়ে—নীলা ও নেপীর কুশল জানতে চেয়েছেন। লিখেছেন—"... জানতে চাওয়াটা নিয়ম বলেই জানতে চাইলাম। নইলে জানি তোমরা ভালো আছ। কারণ তোমরা নিজেদের কুশলে রাখতে পারো বলে আমার বিশ্বাস আছে। কলকাতায় দুদিন বিমান-আক্রমণ হয়ে গেছে-- সংবাদপত্রে দেখলাম। একজন সার্জ্জেণ্ট একা তিনখানা শত্রু-বমার নামিয়েছেন। পরের আক্রমণে অন্য একজন বীরত্ব দেখিয়েছেন। আমাদের পক্ষে আশ্বাসের কথা। গৌরবটা দেবলোকের। 'রাখা এবং মারার মালিক একমাত্র হরি',-এই বিশ্বাসের দেশের লোক আমরা—আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটে চলেছে। ভূপাতিত জাপানী প্লেনের ছবি দেখলাম।

"আমার ফিরতে আরও ক'দিন হবে। ঘুরছি। শহরে—গ্রামে—গ্রামান্তরে। আসবার সময় 'কি হয়েছে' জিজ্ঞাসা করেছিলে। উত্তর দিয়ে আসতে পারি নাই। কি দেখলাম—লিখতে গেলে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব না হোক—অন্তত একটা পর্ব্ব হবে। সেইজন্য নিবৃত্ত হলাম। শুধু এইটুকু জানাই, ছেলেবেলায় কেঁদেছি নিশ্চয় কিন্তু তারপর আর কাঁদি নি, এখানে এসে—নতুন করে জানলাম—চোখের জল লবণাক্ত এবং চোখের শিরা-উপশিরায় কেমন একটা উত্তপ্ত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়।

"শুধু এইটুকু জানাই—মাটিতে আর আকাশে এখানে প্রায় তফাৎ নেই। এখন মাঘ মাস, এরই মধ্যে দেখছি—ধান প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। গতবছরের ডিনায়েল পলিসি, এ বছরের অজন্মা, এর ওপর চোরা বাজারের কালো কাপড় ঢাকা হাত ধান টেনে নিচ্ছে, কিশোরী

মেয়েকে যেমন লালসাপরায়ণ পুরুষ টেনে নিয়ে যায় নিকৃষ্ট পৈশাচিক সম্ভোগ-লালসায়—তেমনি ভাবে। শাসক সম্প্রদায়…।" এরপর কয়েকটা লাইন সেন্সর-বিভাগ থেকে কেটে দিয়েছে। যেভাবে কাটা রয়েছে তাতে পড়ার পর্যান্ত উপায় নাই। নীলা তারপর পড়ে গেল—"অবশিষ্ট যেটুকু আছে সেও অন্তর্হিত হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। পুরাণে পড়েছিলাম —দুর্ব্বাসার অভিশাপে স্বর্গলক্ষ্মী সাগরতলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনুমান করতে পারি জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে নিয়ে যেতে লক্ষ্মীর কিছুদিন সময় লেগেছিল। কিন্তু দুর্ব্বাসা যদি কৌটিল্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন—তবে—একদিনেই লক্ষ্মীকে বিদায় করতে পারতেন এতে সন্দেহ নাই। মানুষ মরছে; দলে দলে দেশত্যাগ করছে; স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে পালাচ্ছে।' সন্তান বিক্রী করছে, বিশেষ করে কন্যা সন্তান।

"যাক্। আর একটা খবর জানাই। এখানকার নানা দুঃখের মধ্যে একটা দুঃখ হ'ল—নবদম্পতিদের দুঃখ। আজও পর্যান্ত দেশে প্রেম-পত্রের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল—সেটা নষ্ট হয়ে গেল। সেন্সরের আপিস বসে গেছে চারিদিকে। প্রেমের আবেগময় চিঠিতে সেন্সরের আপত্তি নাই, কিন্তু নবদম্পতির লজ্জা আছে।

"গীতার খবর মধ্যে মধ্যে নিয়ো। বেচারা কানাইদার জন্যে বোধ করি আজও ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। কানাইয়ের সংবাদ পেয়ে থাকলে অবিলম্বে আমাকে জানিয়ো। ওই সংবাদটার জন্যেই অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আছি আমি। একবার গুণদা-দা'র বাসায় বউদিদির সঙ্গে দেখা ক'রে দশটা টাকা দিয়ে এসো। তাঁর খবরও মধ্যে মধ্যে নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি—বিজয়দা।"

শেষের ছত্র ক'টি পড়ে নীলার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তার মনের সে তিক্ততা ক্রমশ যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। এসব কিছুই তার ভাল লাগছে না। বিজয়দা চলে যাওয়ার পর দিন-

চারেক সে চেষ্টা করেছিল—তাদের সংঘের কাজে প্রাণ ঢেলে নিজেকে নিয়োগ 'করতে। কিন্তু সেও তার ভাল লাগে নাই। সবচেয়ে তার পক্ষে বিরক্তিকর হয়েছে—এর ওর ব্যক্তিগত তল্লাস করা,. উপকার করা। নেপী পর্য্যন্ত এখন ভাল ক'রে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে চায় না। জেম্‌স এবং হেরল্ড কয়েকদিন এসেছে, নীলা তাদের সান্নিধ্যে খানিকটা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে; কিন্তু বিজয়দার অনুরোধ মনে পড়লেই খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করে সে ঠিক করে ফেলেছে তার ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা। সে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিভাগের কাজে যোগ দেবে। জেম্‌স এবং হেরল্ড উৎসাহিত হয়ে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যে যে বিভাগে মেয়েদের কাজ করবার ক্ষেত্র আছে সেই সব বিভাগের কাগজপত্রও তারা তাকে দিয়ে গেছে। এই কল্পনাতেই সে এখন নিজেকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। এই দশটা-পাঁচটার কেরানীজীবন—তারপর অবসন্ন ক্লান্ত নিরানন্দ সময় কাটানো —তার আর সহ্য হচ্ছে না। লোকে অনেক কথা বলবে। বলুক! চিঠিখানা পড়ে এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল গুণদাবাবুর স্ত্রী সেদিন বলেছিলেন—লোকে অনেক কথা বলে!

সেই গুণদাবাবুর স্ত্রীর কাছে যেতে হবে! তার তিক্ত-চিত্ত আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বিজয়দার অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারলে না।

ফুটপাথে চলা দায় হয়ে উঠেছে। রাস্তায় চালের দোকানে সুদীর্ঘ মানুষের সারি দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকের সারি। আজ মেয়েদের চাল দেবার পালা। নেপী তদ্‌বির করে বেড়াচ্ছে। এরপর নীলা তাদের অতিক্রম ক'রে চলে গেল। 'কিউ' শেষ হয়েও নিষ্কৃতি নেই। নিরন্ন আগন্তুকের দল ফুটপাথের উপর বসে আছে। চাল দেওয়া দেখছে। দিন দিন দলে বাড়ছে এরা। এখানে-ওখানে ফুটপাথে

উপর সংসার পেতেছে। পরস্পরের উকুন বেছে—ছঁ—ছঁ শব্দ করে মারছে।

বিজয়দা লিখেছেন—'এখানে এসে দীর্ঘকাল পরে নতুন ক'রে জানলাম—চোখের জল লবণাক্ত।'

১৯৪৩-এর সেই ছবিটা তার মনে পড়ল।—ধূমধূসর আকাশ।

কড়া নাড়তেই গুণদাবাবুর স্ত্রী বাইরের ঘরের জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখে বললেন—তুমি না সেদিন বিজয়বাবুর সঙ্গে এসেছিলে?

—হ্যাঁ।

দরজা খুলে দিয়ে গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—এসো।

নীলা ঘরে ঢুকে বললে—বিজয়দা আমাকে পাঠিয়েছেন—আপনার খবর নিতে।

—আমিই ভাবছিলাম তাঁর কাছে একটা খবর দেব।

—তিনি তো এখানে নেই। বাইরে গেছেন। কয়েক দিন দেরি হবে ফিরতে।

—দেরি হবে? গুণদাবাবুর স্ত্রী একটু চিন্তিত হলেন।

নীলা একখানি দশ টাকার নোট বের করে বললে—বিজয়দা আপনাকে দিতে লিখেছেন।

নোটখানি গুণদাবাবুর স্ত্রী নিলেন—কিন্তু ধরেই রাখলেন—বললেন—তুমি তো আজকালকার মেয়ে। স্বদেশী করেও বেড়াও। একটা কাজ ক'রে দিতে পার আমার?

একটু বক্র হাসি হেসে নীলা বললে—বলুন।

—আমি আরও দশটা টাকা দিচ্ছি, কিছু চাল কিছু আটা কিছু চিনির জোগাড় করে দিতে পার?

নীলা অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। তাকে এমন ভাবে বাজার করতে বলতে তাঁর বাধল না?

গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—টাকার আর কোন দাম নেই আমার কাছে। আজ তিন দিন ঘরে চাল নেই। তিন দিন আগে নীচের পানওয়ালা কিউয়ে দাঁড়িয়ে চাল এনে আমাকে দিয়েছিল। পরে শুনলাম লোকটার নিজের ঘরে হাঁড়ি চাপেনি। তাই আর তার কাছে নিইনি। আটাও নেই, চিনিও নেই। শুধু আলুর তরকারী আর খেতে পারছি না। ছোট ছেলেটা তো ভাত-ভাত করে দিনরাত চীৎকার করছে।

এবার নীলা সবিস্ময়ে বললে—তিনদিন ভাত হয়নি!

—না। ঘরে চাল নেই। বাজারে চেষ্টা মানে—আমার চেষ্টা করে ওই পানওয়ালাটা। বাবু একবার ওর খুব উপকার করেছিলেন—গুণ্ডার হাত থেকে, পুলিশের হাত থেকেও বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকে ও খুব অনুগত। ও চেষ্টা করে মেলাতে পারেনি। যা মেলে কিউয়ে দাঁড়িয়ে—তা নিলে ওর চলে কি ক'রে?

নীলা বললে—আপনার বড় ছেলেকে কিউয়ে পাঠালে তো পারতেন।

—তার জ্বর।

নীলা এবার বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। সে বললে—কিউয়ে দেখলাম—অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে কিউয়ে দাঁড়িয়েছেন—আপনি গেলেও তো পারতেন। তিন দিন উপোস করে আছেন!

স্থির দৃষ্টিতে নীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন গুণদাবাবুর স্ত্রী; তারপর বললেন—ওরা আমার মত ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। নইলে পেটের দায়ে ছোটলোকের সঙ্গে অমন ক'রে গিয়ে দাঁড়াত না। ভিখিরীর অধম।

নীলা বললে—ভিখিরী! ওদের আপনি এমন ভাবে ঘেন্না করছেন কেন বলুন তো?

তার মুখের দিকে চেয়ে গুণদাবাবুর স্ত্রী হঠাৎ হেসে ফেললেন, বললেন—ও, যারা সবাইকে পৃথিবীতে সমান করতে চায় তাদের দলের বুঝি ?

—হ্যাঁ। তাদেরই দলের আমি। এমন ভাবে কথা বলার আপনার কোন অধিকার নেই। ওরা আপনার চেয়ে ছোট নয়।

—তা বেশ তো। ওদের আমার সঙ্গে সমান করে দাও, আর ছোট বলব না। তবে ওদের সঙ্গে সমান করবার জন্যে আমাকে যদি ভিখিরী হতে বল—তাতে আমি রাজি নই। মরে গেলেও না।

নীলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

—বড়লোক ঢের আছে, গাড়ী ঘোড়া বাড়ী ঢের লোকের আছে; আমি তাঁদেরও সমান হতে চাইনে। ওই ভিখিরী ছোটলোকদের সমানও হ'তে চাইনে। দুনিয়াশুদ্ধ যদি ভিখিরী ছোটলোক করে তুলবে—তবে তো তোমাদের খুব স্বদেশী! খুব স্বাধীনতা!

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কে কাতরে উঠল। ব্যস্ত হয়ে গুণদাবাবুর স্ত্রী বললেন—যাই বাবা! তিনি ব্যস্ত হয়েই চলে গেলেন। নীলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললে—আমি ভেতরে যাব ?

—এস।

নীলা ভিতরে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। গুণদাবাবুর বড় ছেলেটি বিছানায় পড়ে জ্বরে হাঁপাচ্ছে। শীর্ণ হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় অসুখ বেশী। গুণদাবাবুর স্ত্রী মাথায় জলপটি দিচ্ছিলেন। বললেন—জ্বরটা বাড়ছে মনে হচ্ছে। তুমি যখন ডাকলে তখনও বেশ সুস্থ হয়ে ঘুমোচ্ছিল।

নীলা এবার সঙ্কুচিত না হয়ে পারলে না, বললে—জ্বর যে বেশী মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। ডাক্তার বলছেন টাইফয়েডে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে।

—কে দেখছেন ?

—বাবুরই এক ডাক্তার। আমাদের বাড়ীতে বরাবরই দেখেন। বাবুকে খুব ভালবাসেন। তবে মুস্কিল হয়েছে—ওষুধ যে অগ্নিমূল্য, আর দাম দিয়েও তা পাওয়া যাচ্ছে না। আজই ওষুধ কেনবার জন্যে তিরিশ টাকা দিলাম। পাওয়া গেল কিনা কে জানে।

নীলা বললে—কিছু মনে করবেন না, টাকার দরকার থাকলে—

—সে আমি ব'লে পাঠাব। আপিসে চিঠি পাঠিয়েছি। ওই আপিসে বাবু গোড়া থেকে কাজ করছেন। ছোট কাগজ বড় হয়েছে। দেবে না কেন ? আর বিজয়বাবুর কাছেও নিতে আমার লজ্জা নেই। বিজয়বাবু একবার জেলে ছিলেন ; উনি তখন বাইরে—সে সময় বিজয়বাবুর এক ভাই পড়ত, তাকে তিনি মাসে মাসে টাকা দিয়েছেন। এখন দু'গাছা চুড়ি বিক্রী করলাম। টাকা হাতে রয়েছে। কিন্তু তবু খেতে পাচ্ছি না। ওই কিউয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে না-খেয়ে মরা ভাল।

নীলা এবার বললে—দিন আমাকে টাকা দিন। আমি চেষ্টা করে দেখি। আর গিয়েই আমি আমাদের ওখান থেকে—কিছু চাল—কিছু আটা—

—তাড়তাড়ি ক'রো না। এ বেলা আলুতেই চালিয়ে নেব। তোমাদের খাবার চাল পাঠিয়ো না। সে আমি নেব না।

বাসায় নেপী সোরগোল তুলেছে। তার গায়ের জামায় কাপড়ে রক্তের দাগ, সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে জল, ন্যাকড়ার ফালি, টিঞ্চার আয়োডিন নিয়ে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছে। গীতা একটি মেয়ের মুখে জল দিয়ে তাকে হাওয়া করছে। একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তক্তাপোশের উপর। মেয়েটির কপালে ন্যাকড়ার ফালি বাঁধা।

নীলা প্রশ্ন করলে—নেপী ?

—জ্বর গায়েই কিউয়ে এসেছিল চাল নিতে। সকালে এসে অনেক

বেলা হয়ে গেছে কিনা, বেচারা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ফুটপাথের উপর। কপালটা ফেটে গেছে। তাই নিয়ে এলাম ধরাধরি' করে। উঃ ভাগ্যে গীতা এয়েছিল! গীতা এরই মধ্যে খুব এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে।

নীলা গীতার দিকে চেয়ে দেখলে। গীতা হাসলে একটু মৃদু হাসি। সত্যই, গীতা বেশ অচঞ্চল ভাবে মেয়েটির শুশ্রূষা করে চলেছে। ষষ্ঠী এসে নামিয়ে দিলে কেৎলী। কেৎলীর নল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। গরম জল। গীতা বললে—একটা বাটি চাই। বাটিটাকে গরম জলে বেশ করে ধুয়ে দাও। শীগ্‌গির। গীতার কথাবার্ত্তারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। সঙ্কোচ নাই—আড়ষ্টতা নাই—অপরাধবোধের দীনতা নাই। এ যেন আর এক গীতা। গুরুত্ব বুঝিয়ে রূঢ়তা-বর্জ্জিত চমৎকার নির্দ্দেশ দিয়ে কথা ক'টা বললে গীতা, ষষ্ঠীর মত লোকও যা প্রতিপালন করতে দেরি করতে সাহস করলে না! গীতার ভিতরে একটি নতুন মানুষ স্পষ্ট রূপ নিয়ে জেগে উঠছে, পছন্দ হয়তো কেউ না করতে পারে কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করা যায় না; তাকে করুণা করতে গেলে যে করুণা করতে যাবে সে-ই লজ্জা পাবে। নীলা প্রথমেই এতটা বুঝতে পারে নাই। সে ব্যস্ত হয়ে গীতাকে সাহায্য করতে উদ্যত হতেই গীতা মিষ্ট হাসি হেসে বললে—ওকে এখন নাড়াচাড়া করবেন না নীলাদি। ওতে ক্ষতি হবে। আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। দেখুন না আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

নিপুণতার সঙ্গে গীতা গরম জলে টিঞ্চার আয়োডিন মিশিয়ে মেয়েটির ক্ষতস্থান ধুয়ে—বেঁধে দিলে। তারপর গরম জলে পা ডুবিয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া করে তাকে সচেতন করে তুললে। চেতনা পেয়েই মেয়েটি সবিস্ময়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

গীতা বললে—ভয় কি? কাঁদছ কেন? তুমি ভাল জায়গাতেই রয়েছ।

মেয়েটির কান্না তাতে থামল না। কাঁদতে কাঁদতেই সে বললে—আমার চাল?

—চাল? চাল তো তোমার ছিল না।

—ছিল না। চাল যে নিতে এসেছিলাম। চাল যে আর পাব না!

—না পাও। তোমার জ্বর হয়েছে! চাল নিয়ে কি করবে?

—ঘরে আমার বাচ্চা আছে। তিনটি বাচ্চা। তারা—কি খাবে?

—তাদের পাঠালেই তো পারতে! জ্বর নিয়ে কি আসে?

—ছেলেরা ছোট। মেয়েটা সোমত্থ। কাকে পাঠাব?

—মেয়েকে পাঠালেই পারতে!

মেয়েটি ভর্ৎসনার সুরে বললে—আপনারা বড়লোকের মেয়ে গরীবের মেয়ের ললাট জান না। সোমত্থ মেয়ে—কিউয়ে দাঁড়ালে—ভদ্দলোকে ইসারা করে; বদমাইস গুণ্ডারা যা-তা বলে।

গীতা অকস্মাৎ উঠে গেল সেখান থেকে।

নীলার মনে পড়ল গুণদা-দা'র স্ত্রীর কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আচ্ছা আমরা চাল দিচ্ছি তোমাকে। নিয়ে যাও তুমি।

নেপী তাকে রিক্সা ক'রে পৌছে দিতে গেল। যাবার সময় মেয়েটি নীলার দিকে তাকিয়ে বললে—তোমাদের জয়জয়কার হবে মা। তোমার রাজার ঘরে বিয়ে হবে।

নীলা হাসলে।

মেয়েটি সে হাসিতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে—হাসলে কেন মা? তবে কি—

—কি, বল!

—তুমি কি বিধবা?

—না—না। আমার বিয়ে হয়নি। বিয়ে আমি করব না।

মেয়েটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললে—তুমি বুঝি পাস করেছ? ইস্কুলে মাস্টারি কর?

হেসে নীলা বললে,—হ্যাঁ চাকরী করি আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে—ভাল করেছ মা। তাই ভাবি। বিধবা হয়ে ঝি-বিত্তি করছি। ভদ্দলোকের মেয়েই ছিলাম। লেখাপড়া শিখলে—। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে—তোমরা তো অনেক বোঝ, বলতে পার—কত দিনে এ দুর্ভোগের শেষ হবে? কবে যুদ্ধ থামবে? যুদ্ধ শেষ পর্যান্ত আমরা বাঁচব তো?

নীলা স্তব্ধ হয়ে রইল। উত্তর দিতে পারলে না।

ভারাক্রান্ত মনে সে সেদিনের কাগজখানা টেনে নিলে। দিনে চট্টগ্রামের উপর বিমান-আক্রমণ হয়ে গেছে।—"Mid-day air-attack on Chittagong area on Saturday." কিন্তু খবরের কাগজেও তার মন আকৃষ্ট হ'ল না। সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল। হঠাৎ মনে হ'ল গীতার কথা। গীতা কোথায় গেল? সে ডাকলে—গীতা!

গীতা এসে দাঁড়াল। নীলা তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হ'ল। মুছে ফেলা সত্ত্বেও গীতার মুখে চোখে চোখের জলের ইতিহাস সুস্পষ্ট। সে বললে—কি হ'ল গীতা?

—কিছু হয়নি।

—কেঁদেছ কেন?

গীতা হাসলে। বললে—মেয়েটির কথা শুনে। মেয়েটি বড় ভাল। জ্বর হয়েছে তবু নিজে এসেছে। মেয়েকে পাঠায়নি কিউয়ে দাঁড়াতে।

নীলা ব্যস্ত হয়ে উঠল। গুণদা-দা'র স্ত্রীর জন্য চাল আটা চিনির ব্যবস্থা করতে হবে।

গীতা বললে—স্নান করে নিন নীলাদি। খাবার তৈরী। দেখি মাংসটা কত দূর।

—মাংস ?

গীতা লজ্জিত ভাবে বললে—আজ আমি আপনাদের খাওয়াচ্ছি। চাকরী করছি।

নীলার মনে পড়ল—কফিখানায় সে কানাইকে কফি খাইয়েছিল।

গীতা বললে—আজ কানাইদা থাকলে—। কথা সে শেষ করতে পারলে না। অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে গেল। বোধ হয় চোখে জল এসেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর নীলা নেপীকে চাল আটার সন্ধানে পাঠালে। নিজে চিঠি লিখতে বসল—বিজয়দা'কে। গুণদাবাবুর বাড়ীর খবর—গীতার খবর জানিয়ে—সে লিখলে—আপনার জন্যে আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমি স্থির করেছি—আমি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের কাজে যোগ দেব। যুদ্ধ শেষ হোক। চারিদিকের অবস্থা আমার যেন গলা টিপে ধরে শ্বাস রোধ করছে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করব—যুদ্ধ শেষ হোক। তা ছাড়া, জীবনে আমি এই রকম কাজই চাই। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। আমি আমাকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে চাই—কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ-তৎপরতার মধ্যে, মৃত্যুর হানা, হানির মধ্যে। নইলে—আমি আর আমাকে বইতে পারছি না। আপনি ফিরে আসুন। নইলে পত্রেই আপনার সম্মতি পাঠান। ইতি—নীলা।

ফেব্রুয়ারীর চার তারিখে বিজয়দা ফিরলেন। নীলার চিঠির কোন উত্তর তিনি দেন নাই।

নীলা প্রথমেই প্রশ্ন করলে—আমার চিঠি পেয়েছেন ?

নেপী বললে—কি অবস্থা দেখে এলেন বিজয়দা?

বিজয়দা বললেন—তোমার চিঠি পেতে আমার দেরি হয়েছিল। কাজেই উত্তর দিতে পারি নি। আপিসের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কি দেখে এলাম বলবার সময় নেই। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমাকে রওনা হতে হবে আবার।

—কোথায়?

—দিল্লী। দিল্লী থেকে বম্বে। সেখান থেকে আবার দিল্লী যেতে হতে পারে।

নীলা বললে—আমার চিঠির উত্তর দিয়ে যান।

বিজয়দা তার মুখের দিকে চেয়ে, বললেন—কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর।

—কেন? আমার ইচ্ছায় এভাবে আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন?

বিজয়দা বললেন—বাধা দিচ্ছি না। তোমার ইচ্ছা হ'লে তাই করবে তুমি, কিন্তু—

—কিন্তু ক'রবেন না বিজয়দা, আমি শুনব না।

—না শোন, আমি দুঃখ করব না। বারণও আমি করছি না। শুধু বলছি—কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। হয় তো সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে একটা বিপর্য্যয় আসছে। আকস্মিক বিপর্য্যয়। মুখের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থেকো না বোন, কোন কথা আমি বলতে পারব না। সঠিক জানি-ও না। আভাস পাচ্ছি। চলেছি সেই সংবাদের সন্ধানে।

যাবার সময় বললেন—আপিসে শুনে এলাম, গুণদা-দা'র ছেলের অবস্থা ভাল নয়। অসুখ শক্ত দাঁড়িয়েছে। পার তো খোঁজ ক'রো।

নীলার অন্তর বিদ্রোহ করতে চাইলে। কয়েকদিন অপেক্ষাও সে করতে পারবে না, অসুখ অনাহার দুঃখ কষ্টের আবেষ্টনী থেকে সে মুক্তি

চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা তার বের হ'ল না। আজ জেম্‌স এবং হেরল্ডের সঙ্গে কফিখানায় তার দেখা করার কথা। কিন্তু গুণদাবাবুর বাড়ী গিয়ে সে ফিরে আসতে পারলে না। গুণদাবাবুর স্ত্রীকে দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। একা মা বসে আছেন—ছেলের মাথার শিয়রে। আরও লোক অবশ্য আছে—সেই পানওয়ালা—তার স্ত্রী; বাড়ীর ঝি। কিন্তু তারা সেবার কিছু জানে না।

নীলা বললে—আমি রাত্রে থাকব বউদিদি।

বউদিদি আপত্তি করলেন না। বললেন—থাক।

কয়েকদিন পর। এগারোই ফেব্রুয়ারী।

গুণদাবাবুর স্ত্রীর অসীম ধৈর্য্য। নীলা দেখে বিস্মিত হয়েছে। রাত্রে খোকার অসুখ বেড়েছিল। ভোরের দিকে একটু সুস্থ হয়েছে। নীলা ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে উঠে দেখলে বউদিদি স্নান সেরে আসনে বসে জপ করছেন। খোকা তখনও ঘুমুচ্ছে। সামনেই পড়ে রয়েছে খবরের কাগজ। আপিসের পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী এখনও ইংরিজী বাংলা দু'খানা কাগজই আসে। কাগজখানার প্রথম পৃষ্ঠা প্রসারিত হয়ে রয়েছে, বোধ হয় বউদিদিই দেখেছেন; নীলা চমকে উঠল—মোটা মোটা হরফে ছাপা রয়েছে—"Gandhiji undertakes fast of three weeks' duration." দশই দ্বিপ্রহর থেকে তিনি অনশন আরম্ভ করেছেন।

সে এক দৃষ্টিতে কাগজখানার দিকে চেয়ে রইল নিস্পন্দের মত।

বউদিদি আসন থেকে উঠে বললেন—খবর দেখলে ভাই?

নীলা শুধু দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে চাইলে।

বউদিদি বললেন—আজ ভগবানকে প্রণাম করতে গিয়ে খোকার

পরমায়ু চাইতে পারলাম না। বারবার বললাম—মহাত্মাকে দীর্ঘায়ু কর। তাঁকে তুমি রক্ষা কর।

নীলার চোখে জল এল। এ সবে বিশ্বাস তার নাই, তবে যে সংস্কারের মধ্যে সে মানুষ, তার আভাস যায় নাই—ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে সে এখনও আত্মপ্রকাশ করে।

আপনার জীবন দিয়ে নাকি বাবর বাঁচিয়ে তুলেছিলেন হুমায়ুনকে। বাবরের কাছে নিজের প্রাণই ছিল প্রিয়তম বস্তু। এ সংসারে তারও প্রিয়তম বস্তু নিজের প্রাণ। তা ছাড়া কে এবং কি আছে? আজ তার প্রিয়তম জন থাকলে—সেও বউদিদির মত বলতে পারত। সে চমকে উঠল। অকস্মাৎ বারবার তার মনের মধ্যে জেগে উঠছে একজনের ছবি। নিতান্ত রূঢ় ভাবেই সে বলে উঠল—না।

—কি নীলা? বউদিদি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

নীলা তাঁর দিকে চেয়ে বললে—আমি চললাম বউদিদি! আমি যাই।

নীলা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। প্রিয়তম জনের কথা মনে হতেই যার ছবি তার মনে জেগে উঠেছে তাকে সে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু তবু তার ছবি মনের দৃষ্টির আড়ালে সরে যাচ্ছে না। এ যেন তার কাছে একটা আবিষ্কার বলে মনে হ'ল।

এ আবিষ্কারে আপনার কাছে সে যেন সকলের চেয়ে বেশী লজ্জা পেলে।

(ঊনত্রিশ)

কয়েক দিন পর। আজ আটাশে ফেব্রুয়ারী। সমস্ত মহানগরী নিদারুণ উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায় অধীর, কিন্তু তবু স্তব্ধ। বাস্তব জীবনে কল্পনাতীত দুর্যোগের মধ্যে মানুষ তবুও বাঁচবার চেষ্টায় জীবনের প্রেরণায় কতদিন চীৎকার করেছে, আর্ত্তনাদ করেছে, কিন্তু সে চীৎকারও

আর উঠছে না; মনের আকাশে যেন মৃত্যুর মত কালো একখানা মেঘ ঘনায়িত হয়ে উঠেছে; বায়ুস্তর উত্তপ্ত লঘু হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্থির প্রবাহহীন, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বায়ুর মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনের আজ ঊনবিংশ দিবস। আজকের সংবাদপত্রের সংবাদ—"Gandhiji somewhat apathetic and not quite so cheerful. Very little change in condition."

...জলের সঙ্গে যে মিষ্টলেবুর রস সামান্য পরিমাণে পান করছিলেন, সেও পরিত্যাগ করেছেন এবং গতকাল থেকে মহাত্মাজী আরও পরিশ্রান্ত।

তবু মানুষের সকল উৎকণ্ঠাকে অতিক্রম করে মনের মধ্যে এক অসম্ভব প্রত্যাশা জেগে রয়েছে। অবৈজ্ঞানিক, অসম্ভব, অলৌকিক। মৃত্যুগর্ভ কালো মেঘখানার শীর্ষলোকে যেন বর্ণহীন কোন দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে মনে করছে মানুষ। বার বার তারা স্মরণ করছে—বাইশে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রের সংবাদ।

নীলা এবং নেপীর সম্মুখে বাইশে তারিখের কাগজখানাও পড়ে রয়েছে। তাতে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে,—

"Gandhiji too weak, apathetic and at times drowsy. It may be too late to save his life if fast not ended without delay."

সেদিন জলপানের শক্তি পর্যান্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; দেহের স্নায়ু-কোষমণ্ডলী দুর্ব্বলতায় এমন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল যে, চৈতন্য পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। অবিলম্বে অনশন ত্যাগ না করলে জীবনরক্ষা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। এই বিবৃতির নীচে সই করেছিলেন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক-মণ্ডলী।

তবু তিনি সে অবস্থা অতিক্রম করেছেন। দুর্ব্বলতার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই কিন্তু দুর্ব্বলতার আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে চেতনাশক্তি আবার প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে ;—দীর্ঘ অনশনের সকল অবসন্নতা সত্ত্বেও তাঁর মুখ প্রফুল্ল মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কঠোরতম বিজ্ঞানবিশ্বাসীরা ভরসা করে আছেন বিজ্ঞানের **অনাবিষ্কৃত** সূক্ষ্ম-তত্ত্বের উপর। সমগ্র ভারতবর্ষ ঐ ভরসা সম্বল করে স্তব্ধ **উৎকণ্ঠায়** দিনের পর দিন গণনা করে চলেছে। বিজয়দা'র মত মানুষও স্তব্ধ গম্ভীর। তিনি ফিরে এসেছেন মহাত্মার অনশন আরম্ভের পরদিন। তারপর সম্পাদক স্বয়ং গেছেন বম্বে। বিজয়দা পুরোনো খবরের কাগজ খুলে মহাত্মাজীর চিঠিগুলি পড়ছেন। পত্রগুলির ভাষায় ভাবে নিহিত আছে যেন পরমতম আশ্বাস,—গভীরতম শক্তি। কতকগুলি ছত্রের নীচে তিনি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছেন বারবার।

তিনি এখন পড়ছিলেন শেষ পত্রের শেষ প্যারা—

"Despite your description of it as a form of political blackmail, it is on my part meant to be an appeal to the highest tribunal for justice which I have failed to secure from you. If I do not survive the ordeal, I shall go to the judgment seat, with the fullest faith in my innocence."

নেপীর চোখ মধ্যে মধ্যে ঝক্‌মক্ করে উঠছে। তার তরুণ মনে অসম্ভব অবৈজ্ঞানিক প্রত্যাশা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে—ভোরের শুকতারার মত। সে উঠে দাঁড়াল। বিজয়দা শুধু একবার তার দিকে চাইলেন। নেপী কাছে এসে দাঁড়াল, বললে—মহাত্মাজী নিশ্চয় পার হবেন এ পরীক্ষায়! আপনি দেখবেন বিজয়দা।

বিজয়দা আবার একটু হাসলেন। নীলা একটা গভীর **দীর্ঘনিশ্বাস**

ফেললে। নীচে কড়া নড়ে উঠল। নেপী বারান্দায় বেরিয়ে ঝুঁকে দেখে বললে—মিঃ স্টুয়ার্ট আর মিঃ মেকেঞ্জি এসেছেন।

নীলা বিরক্ত হয়ে উঠল। বিজয়দা বললেন,—তুমি নীচে গিয়ে নিয়ে এস ওঁদের।

নেপী চলে গেল। বিজয়দা বললেন—না, না, তুমি বিরক্ত হ'য়ো না নীলা! এঁরা সত্যিই বড় ভাল লোক।

নীলা ক্লান্তস্বরে বললে—আমার কিছু ভাল লাগছে না বিজয়দা।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। বিজয়দা এগিয়ে গেলেন, হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে হাত প্রসারিত করে দিলেন। বললেন—কয়েকদিন ধরেই আমি ব্যস্ত হয়ে আছি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। মিস্ সেন, নীলা, আমার বোন। আমি তার বিজয়দা।

জেম্‌স্ সাগ্রহে এবং সম্ভ্রমভরেই বললে—ও, আপনার কথা অনেক শুনেছি মিস্ সেনের কাছে।

জেম্‌স্ এবং হেরল্ড হেসে করমর্দ্দন ক'রে ঘরে এসে ঢুকল। এবং মাথা নত করে নীলাকে অভিবাদন জানালে। নীলাও অভিবাদন জানিয়ে বললে—বসুন অনুগ্রহ ক'রে।

আসন গ্রহণ ক'রে তারা নীরবেই বসে রইল। বিজয়দা বললেন—আপনারা কয়েকদিন আসেননি।

হেরল্ড বললে—অথচ প্রত্যেক দিন ছুটির সময় ভেবেছি আপনাদের কাছে আসি।

জেম্‌স্ বললে—মিঃ গান্ধী রহস্যময় ব্যক্তি। আমাদের বিজ্ঞানবুদ্ধির অতীত এক শক্তিকে যেন তিনি প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন।

বাইশে তারিখের সংবাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেরল্ড বিজয়দাকে বললে—জানেন মিঃ সরকার—ঐ দিন আমাদের উদ্বেগের সীমা

ছিল না। পরদিন সকালের কাগজ দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

জেম্‌স্ বললে—পৃথিবীর সর্ব্বকালের সর্ব্বোত্তম মানুষের মধ্যে তিনি একজন এ কথা আমি আজ স্বীকার করছি।

বিজয়দা হাসলেন।

হেরল্ড বললে—এ ভীষণ পরীক্ষায় তিনি জয়ী হবেন।

বিজয়দা বললেন—তাঁর এ অনশনকে আপনারা কি মনে করেন?

জেমস্ বললে—তিনি যা বলেছেন—তাই আমরা বিশ্বাস করেছি। অবশ্য প্রথমে—Political blackmailing যে মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু আজ সত্যিই তাঁর কথা বিশ্বাস করি—In a sense it is "Crucifying the flesh by fasting."

নীলা উঠে পড়ল, বললে—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমায় একটু বাইরে যেতে হবে।

নীলা চলে যেতে—জেমস্ বললে—মিস্ সেন কি···? অর্থাৎ অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে হ'ল?

বিজয়দা হেসে বললেন—মহাত্মাজীর অনশনের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন বোধ হয়।

হেরল্ড বললে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

একটু নীরবতার পর জেমস্ বললে—মিঃ সরকার, এইজন্যেই এতদিন আসতে সঙ্কোচ বোধ করেছি আমরা।

বিজয়দা বললেন—না, না, কেন সঙ্কোচ করবেন? রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব মানুষের কাছে মানুষকে পর ক'রে দেবে কেন? আমরা আপনাদের ভালোবাসি, আপনারা আমাদের ভালোবাসেন। মহাত্মাজী লর্ড লিনলিথগোকে বন্ধু মনে করেন—সেটা তাঁর ভাণ নয়।

—নিশ্চয়ই না।

—আমাদের কতকগুলি বইয়ের নাম জানাবেন—যাতে আমরা মিঃ গান্ধীকে ভাল করে জানতে পারি ?

—আনন্দের সঙ্গে।

বইয়ের নাম নিয়ে তারা উঠল। বললে—মিস্ সেনকে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাবেন।

বিজয়দা বললেন—আসবেন আবার।

—নিঃসঙ্কোচে আসব মিঃ সরকার। আপনার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমাদের সকল সঙ্কোচ কেটে গেছে। আচ্ছা—এখন বিদায়!

হেরল্ড বললে—বারবার কামনা করছি—আপনাদের মহাত্মা এ পরীক্ষায় জয়ী হোন। জয়ী তিনি হয়েছেন; তবুও কামনা জানালাম। আজ রাত্রে তার জন্য আমরা উপাসনা করব, মিঃ সরকার।

বিজয়দা অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন।

নীলা চলেছিল—গুণদাবাবুর বাড়ী। গুণদাবাবুর ছেলেটি পরশু মারা গেছে। কাল পর্য্যন্ত সে বউদিদির খোঁজ নিয়েছে। আজ সকাল থেকে মহাত্মার অবস্থা নিয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল; সংবাদ নেওয়ার কথা তার মনে হয় নি। ঠিক মনে হয় নি নয়, মনের মধ্যে যে সচেতনতা যে স্নায়বিক সবলতা থাকলে মানুষ দুর্য্যোগ মাথায় করেও পথ চলতে পারে সেই চেতনা সেই বল যেন এতক্ষণ পায় নাই। জেমস এবং হেরল্ড আসাতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কেন যে সে উত্তেজিত হ'ল তা সে জানে না, বিশ্লেষণ করেও দেখে নাই। বিজয়দা তাকে বলেছিলেন—না, না, তুমি বিরক্ত হ'য়ো না; তবু সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে নাই। বিজয়দা তাদের সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসতেই সে সেই উত্তেজনার বশে বেরিয়ে এল—মনে হ'ল তার গুণদা-দাদার বাড়ীর কথা। বউদিদির খবর নেওয়ার প্রয়োজন।

বউদিদির অসীম ধৈর্য্য। তিনি অবিচলিতই আছেন। তাঁর কাছে সে যায় তাঁকে শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যই নয়, তাঁর ধৈর্য্য তাঁর দৃঢ়তা দেখে সেও নিজে ধীর এবং দৃঢ় চিত্তে নিজের অধীরতাকে জয় করতে চায়। মনের এ অধীরতা আর সে সহ্য করতে পারছে না। যে দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেছে—একটাকে উপলক্ষ্য করেই আর একটা। গান্ধীজীর অনশন উপলক্ষ করেই সে আপন মনের গোপন কথাটি উপলব্ধি করতে পারলে। এই সত্যটাই তার নিজের কাছে বড় লজ্জার কথা। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধটা দেহের বেদীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত এটাকে সে অস্বীকার করে না—কিন্তু অন্য অনেকেরই মত, ঐটাই চরম সত্য এবং এর পর আর কিছুই নাই একথাও সে মানে না। প্রেমকে সে মানে। সত্যকার প্রেম। আকর্ষণ মাত্রেই প্রেম নয় এ কথাও সে জানে—মানে। সে তাকে বারবার ভুলতে চেয়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছে—যার কোন আকর্ষণ নাই তার ওপর, তার প্রতি তার এ আকর্ষণ আত্ম-অবমাননা। কানাই গীতাকে উদ্ধার ক'রে এনেছে—বৃদ্ধের গ্রাস থেকে। শুধু কি তাকে বাঁচাবার জন্যই নিয়ে এসেছে? তা' যদি হয় তবে গীতার মত সামান্য একটি মেয়ের কেমন ক'রে স্পর্দ্ধা হ'ল কানাইয়ের মত লোককে ভালোবাসবার? গীতা যে কানাইকে ভালবাসে এ তো খাঁটি সত্য! কানাইকে সে নিজে বলেছিল—গীতাকে বিয়ে করা আপনার উচিত। কানাইয়ের উত্তর তার মনে আছে। কানাই বলেনি যে, সে গীতাকে ভালবাসে না। বলেছিল—আমার পক্ষে বিবাহ করাই অসম্ভব। আমাদের বংশ পাগলের বংশ! সে কথাও সে নিজেকে বারবার বলেছে। মনের এই লজ্জা এই অশান্তির জন্য আপিস থেকে অসুখের অজুহাতে এক মাসের ছুটি নিয়ে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে—তার জীবন-ধর্ম্মের কর্ম্মের মধ্যে। যে রাজনৈতিক সংঘের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট, সেই

সংঘের উদ্যোগে নানা স্থানে সভার আয়োজন করতে মেতে উঠেছে। মিটিংয়ের পর মিটিংয়ের জন্য প্রাণ দিয়ে সে পরিশ্রম করে চলেছে। নেপীদের সঙ্গে সেও গলা মিলিয়ে চীৎকার করেছে—‘গান্ধীজীর মুক্তি চাই।’ ‘লীগ কংগ্রেস এক হোক।’ মিছিলের আগে সে চলে পতাকা বহন করে। কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে সে জয় করতে চায় তার এই দুর্বলতাকে, নিজের কাছে এই লজ্জা থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। একদিন সে মনে মনে সংকল্প করেছিল—সে ওই বিদেশীয়দের কাউকে জয় করবে। পুরুষ চায় নারীকে জয় করতে; নারীও চায় পুরুষকে জয় করতে। মানব-মানবীর এ চিরন্তন কথা। এ দেশে কন্যা সম্প্রদান করে বাপ। বস্তুর মত গ্রহণ করে বর। সামাজিক বিধি এবং দেশাচার মতেও স্ত্রী হয়তো দাসী। তবুও আছে চিত্তজয়ের আসর, বাসর, অবসর। বিদেশীয়দের জয় করতে সংকল্প ক’রে সে সেদিন লজ্জিত হয়নি। আজ কিন্তু সে কারণেও সে লজ্জা পায়। তবে তো ব্যর্থতার আঘাতেই সে এমন ক’রে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল! সে এই দুর্বলতাটাকেই জয় করতে চায় সম্পূর্ণ ভাবে। তারপর সুস্থ সহজ মন আবার যদি ভবিষ্যতে কাউকে চায় তখন সে মুখ ফেরাবে তার দিকে সহজ হাসি মুখে।

ভাবনায় একেবারে সমাহিত হয়েই সে চলেছিল—কিন্তু সে সমাহিত অবস্থা ভেঙে গেল—পথে নেমেই সে শিউরে উঠল। দিনের পর দিন—প্রায় নিরন্তর দেখেও—মানুষের এ অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সকল স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে—শরীর শিউরে উঠছে! পথের ধারে ধারে কঙ্কালসার মানুষের সারি।

রাস্তায়, গৃহস্থের দরজায় নিরন্ন মানুষের দল।

নীচে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেউ কাতরস্বরে বলছে—মা—মাগো!

চারটি ফেন-ভাত দাও গো মা। তোমার পায়ে পড়ছি গো! মা—মাগো! মা—! মা! মাগো!

নীলা বের হইতেই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল তিনটি কঙ্কালসার ছেলে, নিয়ে একটি মেয়ে।

—মা, দুটি ভাত! আমার ছেলে ক'টাকে দুটো ভাত দেবা মা?

নীলাকে দাঁড়াতে দেখে ওপারের ফুটপাথ থেকে ছুটে আসছিল আরও একটা দল। জন চারেক।

মোটরের হর্ণ শুনে থমকে গেল। দু'জন সার্জেণ্ট মোটর-বাইকে টহল দিয়ে ফিরছে। একজন গাড়ীর গতি মন্থর করে ভিখিরীদের শাসন করে দিলে—এমনভাবে জ্ঞানহীনের মত ছুটলে চাপা পড়ে মরবি। নীলার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। গাড়ী চলে যেতেই তারা ছুটে এল।—দুটো ভাত—একটু ফেন, হেই রাণী মা!

নীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—ভাতের সময় আসতে পার নি? আর তো নেই!

—দুটো এঁটো-কাঁটা দাও মা।

একটা ছেলে ডাস্টবিনের ভেতরে উঁকি মেরে দেখছে।

নীলা ব্যাগ খুলে খুঁজে বের করলে একটি সিকি। চারজনের এর কমে আর হয় না। তা ছাড়া সিকির চেয়ে খুচরো রেজগী আর কিছু নাইও তার কাছে।

সমগ্র দেশে রেজগীর অভাব হয়েছে। পয়সা তো একেবারেই নেই। দোকানে ভাঙানী মেলে না। ট্রামে না, বাসে না। খুচরোর অভাবে গরীবের জিনিস কেনা বন্ধ হয়েছে। গোটা টাকার জিনিস না নিলে খুচরোর অভাবে জিনিস কেনা হয় না! অবশ্য দু-চার পয়সায় জিনিসও কিছু কেনা যায় না। চাল ত্রিশ টাকা। আটা ত্রিশ থেকে ছাড়িয়ে গেছে, তাও মেলে না। চিনি বাজারে নাই। ত্রিশ চল্লিশ টাকার কেরাণীর ঘরে অর্দ্ধাশন

আরম্ভ হয়েছে। চারদিক হতে অনাহারে শীর্ণ নরনারী ছুটে আসছে দলে দলে এই মহানগরীতে দু'মুঠো আহার্য্যের প্রত্যাশায়। দিনে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়—

—চারটী ফেন-ভাত দেবা মা? মা—মাগো!" মা! মাগো!

—দু'টি ভাত দাও মা!

এক মুঠো খেতে দাও মা। মা—মাগো! মা! বাবা গো।

—ভাত! দু'টো ভাত।

অবসর সময়ে ফুটপাথে বসে থাকে সারি দিয়ে। জীর্ণ শতচ্ছিন্ন কাপড়ে প্রায় বিবস্ত্র। কঙ্কালসার চেহারা। তৈলহীন জটাবাঁধা রুক্ষ চুল। কঙ্কালসার দেহের শুষ্ক স্তনে মুখ দিয়ে চীৎকার করছে প্যাকাটির মত ছেলে, পাশে উলঙ্গ কয়েকটা বসে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখছে মহানগরী, বিরাট প্রাসাদগুলির শীর্ষদেশ, চলন্ত মোটরের সারি। বসে আপনাদের মধ্যে ঝগড়া করে, গল্প করে, মানুষ দেখলে ভিক্ষা চায়। সারি সারি মানুষ। শীতের রাত্রে অনাবৃত ফুটপাথের উপর পড়ে থাকে। মোটরের তলায় চাপা পড়ে। দু'একটি অনাহারেও মরতে আরম্ভ করেছে। সেদিন। একটা বাজারে ডাস্টবিনের পাশে একজন পুরুষ মরে পড়ে ছিল—হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে ছিল। কাল একটা ওষুধের দোকানের সামনে—একটা পুরুষ ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে মরেছে। মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে স্থির দৃষ্টি—মুখখানা হাঁ হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। নীলা দূর থেকে প্রথমটা লোকটার সঠিক অবস্থা বুঝতে পারে নাই। হঠাৎ কাছে এসে শিউরে উঠেছিল। লোকটা মরে গেছে। অবস্থা সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে ওঠে, যখন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাত্রে পথচারী হতভাগ্যেরা বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে—চারডি খেতে দাও মা! চারডি এঁটো-কাঁটা! দু'টো ফেন-ভাত!

অন্ধকারের মধ্যে মানুষকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু সকরুণ ক্ষুধার্ত্ত চীৎকার; সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, মনে হয় চীৎকার উঠছে বুঝি মাটি থেকে। মহানগরী যেন চীৎকার করছে—ম্যয় ভূখা হুঁ!—ম্যয় ভূখা হুঁ!

আজ সকালে এই নিয়ে তার তর্ক হয়েছিল বিজয়দার সঙ্গে। তর্কপ্রসঙ্গে সে বজ্রের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল—মজুতদারদের উপর। বিজয়দা হেসে বলেছিলেন—বেচারাদের ওপর একটু করুণা কর ভাই। এতখানি নিষ্ঠুর হ'য়ো না!

—নিষ্ঠুর হব না? আজ রাশিয়া হ'লে—

—থাম নীলা! রাশিয়ায় মজুতদারের অস্তিত্বই নেই। ও দেশটার কথা বাদ দাও।

—ভাল, ইংলণ্ডের কথাই ধরুন।

—ধর ভাই। সেই ধরতেই বলছি। যুদ্ধ তো সে দেশেও চলছে। আমাদের দেশের চেয়ে বেশী দিন ধরে চলছে। সেখানে খোরাকীর খরচ টাকায় চার গুণও বাড়েনি ভাই। কিন্তু হতভাগ্য বাংলাদেশে ধান-চালের দাম বেড়েছে আট দশ গুণ। দুই দেশেই তো একই সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ভাই; মজুতদার সে দেশেও থাকতে আপত্তি নাই; থাকতোও। কিন্তু থাকল না কেন? তবু কেন এমন হ'ল বলতে পার? তারপর হেসে তিনি বলেছিলেন—মনে মনে খোঁজ;—হিসেব করে দেখো, কেন এমন হ'ল! ভেবে দেখো ওদেশের ব্যবস্থার সঙ্গে এদেশের ব্যবস্থার তফাৎ কোথায়। তারা স্বাধীন আমরা পরাধীন। জানো নীলা, আজ যদি আমরা স্বাধীন হতাম তবে আজ impeach of Hastings এর মত নূতন impeachment হ'ত। Burk এর অভাব হ'ত না। বিজয়দা'র চোখ দুটো ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল তখন।—মজুতদার—মজুতদার তৈরী করলে কে? তৈরী হয় কেন?

এ বেলাতেও সেই কথাই নীলা ভাবছিল। বিজয়দা ঠিক কথা বলেছেন। স্বাধীন দেশ আর পরাধীন দেশ—। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর তার কানে এল—

—আপনি আসিয়েছেন মাইজী! আঃ বাঁচলুম।

নীলা চকিত হয়ে দেখলে—সেই হিন্দুস্থানী পানওয়ালাটি।

পানওয়ালা আবার বললে—কালভি মাইজী কুছু খেলেন না।

—খান নি?

গুণদা-দাদার স্ত্রী কাল কিছু খান নাই। পরশু থেকেই তিনি অনাহারে আছেন। পরশু অনুরোধ করতে কেউ সাহস করে নাই। তাঁর সে সময়ের মূর্ত্তির কাছে সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন সে সময় তাদের কাছে পৃথক পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছিলেন—সে পৃথিবী মাটির নয়। মাটির পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে কোন কথা বলতে সাহস করে নাই—যে লোকের মানুষ তিনি হয়ে উঠেছিলেন, সে লোকের কর্ত্তব্য তিনিই সবচেয়ে যেন ভাল জানেন বলে মনে হয়েছিল।

অবিচলিত গুণদা-দাদার-স্ত্রী মৃত সন্তানের মুখ সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে তাকে সাজিয়ে, চিবুক ধরে বলেছিলেন,—তোর সঙ্গে আমি যেতে পারলাম না, রইলাম। খবরটা তোর বাপকে দিতে হবে, তাঁকে সেদিন সান্ত্বনা দিতে হবে। তুই কেমন ভাবে ওষুদ অভাবে মরেছিস,—দোকানে ওষুদ থাকতে পাঁচটাকার ওষুদের দাম পাঁচিশটাকা চেয়ে ওষুদ দেয়নি দোকানদার,—বুড়ো হয়ে সেই কথা বলব ওই ছোটখোকার ছেলেদের, তার ছেলেদের, তাই যেতে পারলাম না তোর সঙ্গে।

তিনি নিজে তুলে দিয়েছিলেন ছেলের শব নেপীর হাতে।

নেপী এবং বিজয়দাদাই তার শেষ-কৃত্য করে এসেছেন।

ওষুধের কথাটা মর্মান্তিক। ডাক্তার একটা ইন্‌জেক্‌শন আনতে পাঠিয়েছেন—শেষের দিকে। বিদেশী ওষুধ। ওষুধটা বাজারে পাওয়া যায় না। একটা নির্দ্দিষ্ট দোকানে কেবল সংগ্রহ আছে। ডাক্তার ঠিকানা দিয়ে পানওয়ালাটিকেই পাঠিয়েছিলেন ওষুধ আনতে। বলেছিলেন—কিছুদিন আগেও পাঁচ টাকায় দিয়েছে। সাধারণ সময়ে দাম ছিল এক টাকা। দশটা টাকা নিয়ে যাক। তার বেশী হবে না।

পানওয়ালা ফিরে এসেছিল—দোকানী পঁচিশ টাকা চেয়েছে!

টাকা নিয়ে আবার গিয়ে ওষুধ এনে দেবার আর সময় হয় নাই।

বাড়ীখানার সম্মুখীন হয়েই নীলার চিন্তায় ছেদ পড়ল। মনে প্রশ্ন হ'ল—আজ বৌদি খেয়েছেন কিনা কে জানে! দ্রুতপদে সে রাস্তা পার হচ্ছিল। কিন্তু দাঁড়াতে হ'ল। এ পথেও চলেচে একটা সার্জ্জেণ্টের মোটরবাইক। টহলের যেন কিছু আধিক্য দেখা যাচ্ছে। চকিতে নীলার মনে ভেসে উঠল উপবাসক্লিষ্ট মহাত্মাজীর ছবি। গুণদা-দাদার বাড়ীর দরজা খুলে গেল, পানওয়ালার বউটি বললে—মাইজী ডাকছেন।

স্থির হয়েই বউদি বসে আছেন। নীলা প্রশ্ন করলে—খেয়েছেন বউদি?

পানওয়ালার বউ বললে—আজও মাইজী কিছু খান নি।

বউদিদি একটু হাসলেন।

নীলা বললে—সে কি বউদি?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন নীলা! তিনি আরও একটু হাসলেন।

—কিন্তু আপনাকে বাঁচতে হবে তো!

—হবে বই কি! বলেছি তো, বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। একালের গল্প বলব নাতি-নাতনীদের, তাদের ছেলেদের।

অকস্মাৎ তাঁর শীর্ণ মুখ উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠল, চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল; বললেন—গলার বাঁধন যদি খোলে তবে চীৎকার করে বলব। যদি না খোলে, দম যদি আরও বন্ধ হয়ে আসে, গোঙাতে গোঙাতে বলব। বাঁচতে আমার হবেই। মরবার জন্যে উপোশ করিনি।

—তবে ?

—খোকার জন্যে আমি উপোস করিনি। খোকার মৃত্যুর দিন কিছু খেতে ভালো লাগেনি; কাল সকালে উঠে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে মনে হ'ল—মহাত্মার অবস্থা কেমন, দু'দিন উপোস ক'রে বুঝে দেখি!

আর সে কোন অনুরোধ করলে না বউদিকে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বউদি ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন মেঝের উপর। নীলা লক্ষ্য করলে—চোখ তাঁর বন্ধ হয়ে আসছে। অনাহারে ক্লান্তি শোকের অবসাদ—তাঁর চেতনাকে বোধ হয় আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে।

নীলা সন্তর্পণে উঠল। আগে থেকেই তার মন তিক্ত জর্জ্জর হয়ে ছিল—বউদির কথায় মন তার প্রখর হয়ে উঠল। গুণদাবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়েও তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। বিজয়দা এখনও বোধ হয় হেরল্ড এবং জেম্‌স্‌কে নিয়ে মহামানবতার উদার আলোচনা করছেন। সে আলোচনা সে কিছুতেই শুনতে পারবে না!

লক্ষ্যহীন ভাবেই সে পথ হাঁটতে শুরু করলে। দুপুরবেলা পথে জনতা বিশেষ নাই। তবুও সে ট্রাম রাস্তা ছেড়ে, ধরলে ট্রাম-রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল একটা জনবিরল পথ। দুপাশে মানুষের বসতবাড়ী; ক্বচিৎ একটা দুটো পানবিড়ির দোকান কি মুদীখানা। বসতবাড়ীগুলির দরজা বন্ধ। ফুটপাতে ঘুরচে কাঙালীর দল—উচ্ছিষ্ট প্রার্থনা করে ফিরছে।

—চারডি ভাত দেবা মা ?

—একটুকুন ফ্যান !

—মা গো ! মা ! দয়া কর মা গো !

হঠাৎ নীলার নজরে পড়ল—একটি তরুণী বধূ একটি দরজা থেকে উঁকি মারছে। একটি থালায় ভাত নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। নীলার মন অকস্মাৎ আবেগে ভরে উঠল। তার নিজের সংসার থাকলে সেও দাঁড়াত এমনিভাবে অন্নপূর্ণার মত। মেসের ভাত নিয়ে সেও দেয় কাঙালীদের, তবু এমন রূপ বোধ হয় হয় না তার।

একটু দূরে একটি ছোট ছেলে অন্য একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল ; তার হাতেও ভাতের বাটি। সে ডাকছে কাঙালীদের।

এবার তার চোখ জলে ভ'রে গেল।

তার মন পূর্ব্বচিন্তার জের টেনে কামনা করলে—তার যদি সন্তান হয়—তবে—।

অকস্মাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল। সামনেই আর একটা বড় রাস্তা ; এ রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে পড়েছে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুয়ে। মিলিটারী লরীর কনভয় চলেছে। সচেতন মন নিয়ে সে পিছন ফিরে আরও একবার দেখলে সেই বধূটিকে—ছেলেটিকে। মনে মনে বললে—জয় হবে, নিশ্চয় জয় হবে।

(ত্রিশ)

দু'দিন পর।

আজ দোসরা মার্চ্চ। মহাত্মার উপবাসের আজ শেষ দিন।

আজকের খবরের কাগজের সংবাদে দেশ আশ্বস্ত হয়েছে। আজকের খবর—অনশনের বিংশতিতম দিনে মহাত্মাজী প্রফুল্ল। গত দু'দিন থেকেই তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে চলেছে। অগ্নিপরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন।

নীলার মন খানিকটা শান্তি পেলে। বউদিদি সেদিন থেকেই কিছু খান নাই। গত সন্ধ্যায় এসে নীলা রাত্রে তাঁর কাছেই ছিল। সকালে উঠে বললে—খবর দেখলেন তো? আজ আপনিও অনশন ভঙ্গ করুন।

বউদিদি হেসে বললেন—হ্যাঁ—আজ খাব। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি আজ আমি খাব।

নীলাও খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল। তবু সে বললে—তা হ'লে আপনি কিছু খান, আমি দেখে যাব।

বউদি বললেন—তুমি যাও, আমি খাব। কথা দিচ্ছি। তোমাকে আর আসতে হবে না।

নীলা বললে—দরকার হ'লে খবর দেবেন যেন

শান্ত মনেই সে বাসায় ফিরল। সত্যই তার মন আজ শান্ত। আজ তার মনের সে অধীর চাঞ্চল্য নাই। কানাইয়ের কথা মনে করেও সে কোন পীড়া বোধ করে নাই। মন তার সহজভাবেই তাকে গ্রহণ করেছে—ভেবেছে অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মত। বিজয়দা'র মত; নেপীর মত। তার সঙ্গে দেখা হ'লে—সে আজ বেশ হাসিমুখেই কথা বলতে পারে পূর্ব্বের মত।

স্নান করে খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল—ষষ্ঠীর ডাকে। একখানা পত্র হাতে ক'রে ষষ্ঠী ডাকছে। খাকী উর্দিপরা একজন পিওন এসে চিঠিখানা দিয়ে গেছে। চিঠিখানা আসছে—যুদ্ধ-বিভাগ থেকে। বিজয়দাদার নামে পত্র। বিজয়দাদা বাসায় নাই। তিনি গেছেন একটা মিটিংয়ে। জরুরী চিঠি। নীলা চিঠিখানা খুললে। চিঠিখানা আসছে গীতা যেখানে ট্রেনিং নিচ্ছে সেখান থেকে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। "গীতা বলে মেয়েটি যাকে আপনি এখানে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন সে অত্যন্ত অসুস্থ। অবিলম্বে আপনার আসার প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরী জানবেন।"

নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলে সে গীতার ব্যাপারে। কিন্তু কে-ই বা যাবে? বিজয়দা নাই, নেপীও নাই। নেপী 'Feed the poor first,' নিরন্নের অন্ন-দাবী অভিযানের আয়োজনে বেরিয়েছে দুপুর থেকে। কখন্ ফিরবে বলা যায় না। বিজয়দাও আজ আপিসে নেই, একটা মিটিং উপলক্ষে বাইরে গেছেন। গীতা যেখানে রয়েছে সেখানে দেখা করবার সময় সন্ধ্যা আটটার মধ্যে। নীলা বিব্রত হয়ে পড়ল।

তিক্ত চিত্তেই সে গীতার খবর নিতে বের হ'ল। সম্মুখে আসন্ন রাত্রি। হয় তো কখন্ সাইরেন বেজে উঠবে। কিন্তু সে উদ্বেগের চেয়েও অধিকতর উদ্বেগে সে পীড়িত হচ্ছিল—কখন্ পথের উপর খবরের কাগজের হকারের চীৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠবে—মহাত্মা গান্ধী—।

ট্রামে কষ্টদায়ক ভিড়। সন্ধ্যার মুখে দলে দলে লোক ঘরে ফিরছে। কিন্তু স্তব্ধ—শান্ত। শান্ত নয়—উদ্বেগে অবসন্ন মানুষের কথা আলোচনা সব ফুরিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে। এখন বোধ হয় সাইরেন বেজে উঠলেও আশ্রয়-সন্ধানে প্রাণভয়ে মানুষ ছুটে বেড়াবে না। ক্লান্ত ধীরপদক্ষেপে যেখানে হোক গিয়ে দাঁড়াবে।

ট্রাম থেকে নেমে খানিকটা হেঁটেই গীতার কর্ম্মস্থল। কর্তৃপক্ষের লিখিত চিঠিখানাই সে আপিসে পাঠিয়ে দিলে। অবিলম্বেই তার ডাক পড়ল। একখানা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিলেন এক প্রৌঢ় ডাক্তার—বাঙালী।

নীলার দিকে চেয়েই—তিনি চিঠির দিকে চেয়ে দেখলেন—তারপর বললেন—আপনি?

নীলা বললে—মিঃ বিজয় সরকারের কাছ থেকেই আমি আসছি। তিনি নিজে আসতে পারেননি—আমায় পাঠিয়েছেন।

তার মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—বসুন।

নীলা বসে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে গীতার ?

বাইরের জানালার দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—কাল হঠাৎ পা-পিছলে সিঁড়ি থেকে সে পরে যায়। পড়ে গিয়ে পেটে আঘাত পায়।

—আঘাত কি খুব বেশী ?

—না বেশী নয়। কিন্তু—।

—কিন্তু কি ?

—কথাটা মিঃ সরকারকে বললেই আমি সুখী হ'তাম। তিনি সেই বাইরের দিকেই চেয়ে ছিলেন।

নীলা বললে—তিনি তো আমাকেই পাঠিয়েছেন।

—পাঠিয়েছেন, কিন্তু তিনি এলেই ভাল হ'ত।

নীলা চুপ করে রইল। ভদ্রলোকও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন—মেয়েটিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

নীলা চমকে উঠল।—সন্তানসম্ভবা ?

—হ্যাঁ। আঘাতের ফলে হেমারেজ হয়েছিল; পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যাপারটা জানা গেল।

উষ্ণ রক্তস্রোত পা থেকে মাথার দিকে উঠছে। দুরন্ত ক্ষোভে, রাগে নীলা অধীর হয়ে উঠেছিল। অধঃপতিত অভিজাত বংশের আদর্শ বিলাসী সন্তানকে তার মুহূর্তে মনে পড়ে গেল।

ডাক্তারটি বললেন—এমনভাবে জরুরী চিঠি লিখবার কারণ আপনি বুঝেছেন ? নার্সদের কোয়ার্টারে ওকে আর আমরা রাখতে পারব না।

নীলা বললে—বেশ, আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই। অবস্থার দিক থেকে—

কথার মধ্যস্থলেই ডাক্তারটি বললেন—না—না। সে ভালই আছে। আঘাত সামান্য। যে অবস্থায় সে রয়েছে, সে অবস্থায়ও কোন ক্ষতি হয়নি।

গীতা আজ আবার সেই পুরোনো ম্লান হাসি হাসলে। নীলার দৃষ্টি স্থির দীপ্ত—ঘৃণায় ক্রোধে ঝকমক করছিল। সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ট্যাক্সিখানা দ্রুত চলেছিল ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার পথে। রশ্মি-দীপ্তিহীন অসংখ্য আলো দ্রুত ধাবমান অতিকায় শ্বাপদের চোখের মত চলে বেড়াচ্ছে।

গীতা বললে—নীলা-দি!

নীলা বললে—চুপ কর। দুর্ব্বল শরীর, কথা ব'লো না।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—বাসার দরজায়। নীলা নেমে—তার হাত প্রসারিত করে দিলে গীতার দিকে। গীতা হেসে বললে—না, আমি বেশ নামতে পারব নীলা-দি।

ট্যাক্সির ভাড়া দিয়ে নীলা সজোরে কড়া নাড়লে—মনে উত্তাপ তার পদক্ষেপ থেকে সর্ব্ব কর্ম্মে ছড়িয়ে পড়ছিল। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল; বোধ হয় বারান্দা থেকে ষষ্ঠী ট্যাক্সি দাঁড়াতে দেখেই নেমে এসেছে। দরজা খুলে গেল। নীলা বললে—সিঁড়ির আলোটা জ্বালো ষষ্ঠী।

আলো জ্বলে উঠল। ষষ্ঠী নয়,—শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কানাই। শীর্ণ দেহ, মাথার চুল কামানো, একটা দীর্ঘ এবং প্রবল অসুস্থতা থেকে বোধ হয় উঠে এসেছে সে। দেখে চেনা যায় না। এ যেন এক নতুন মানুষ।

শ্রান্ত স্বরে সে বললে—ভালো আছেন? গীতা, তোমার অসুখ?

নীলা কোন উত্তর দিলে না। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। গীতা নতমুখে হেসে বললে—অসুখ নয়, পড়ে গিয়েছিলাম। এখন ভাল আছি। সে দু'জনকে অতিক্রম করে আস্তে আস্তে সিঁড়ি উঠতে লাগল।

—ছুটি নিয়ে এলে বুঝি ?

নীলা এবার উত্তর দিলে—না, গীতাকে সেখানে তারা রাখলে না।

—রাখলে না ?

—তার সেখানে থাকা চলে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে নীলা কথা বলছিল।

—কেন ?

—গীতা— ; গীতা মা হ'তে চলেছে !

কানাই চমকে উঠল। গীতাও সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

নীলা বললে—আপনি একটা স্কাউণ্ড্রেল।

কানাই একবার দীপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে, পরমুহূর্ত্তে কিন্তু হেসে স্তব্ধ হয়ে রইল।

—এত বড় একটা পাপ করে আপনি—!

সিঁড়ির মাথা থেকে বাধা দিয়ে গীতা বলে উঠল—না—না—না নীলা-দি !

—তুমি চুপ কর—

—না। দৃঢ়স্বরে গীতা এবার বললে—কা'কে কি বলছেন আপনি ?

কানাই মৃদু হেসে বললে—উপরে চলুন মিস্ সেন। দরজাটা বন্ধ করে দি। সন্ধ্যে বেলা, হয়তো লোক জমে যাবে। কানাইয়ের কথার মধ্যে একটি শান্ত দৃঢ়তা। সে জর্জ্জর তিক্ত তীব্রতার আর একবিন্দু অবশেষ নাই।

নীলার চোখে-মুখে অতি উগ্র ক্ষুব্ধতা ফুটে উঠেছিল। গীতার ঐ প্রতিবাদ তার সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। ঘৃণা ধরে গেছে গীতার ঐ দাসীত্ব-সুলভ ভালবাসার কথা শুনে। সে বললে—কানাইকে বললে—গীতাকে আপনি বিবাহ করুন।

কানাই কিছু বলবার পূর্ব্বেই গীতা তার সামনে এসে দাঁড়াল, বললে—

নীলা-দি, আপনি কি ভেবেছেন আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার ধারণা ভুল। সে হাসলে বিষণ্ণ ম্লান হাসি।

গীতার উপরে আবার নেমে এসেছে পূর্ব্বের বিষণ্ণ ম্লান ছায়া। কিন্তু তবুও এ গীতা সে গীতা নয়। অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নীলার দিকে চেয়ে অকম্পিত কণ্ঠস্বরে সে আপনার দুর্ভোগের কাহিনী বলে গেল। চোখ ভরে জল এল না, একবারও স্বর রুদ্ধ হ'ল না; শুধু পরিশেষে ম্লান হাসি হেসে বললে—কানাইদা আমার বাপ, আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশী, কানাইদা আমার দেবতা। ওঁকে দোষ দেবেন না নীলা-দি।

সমস্ত শুনে নীলা নির্ব্বাক স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বসে রইল। গীতা মৃদুস্বরে বললে—কানাইদা আপনাকে ভালবাসেন নীলা-দি—আমি জানি। নীলা তবু কোন উত্তর দিলে না। গীতা ডাকলে—কানাইদা!

কানাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল—সেখান থেকেই উত্তর দিলে—গীতু ভাই, ডাকছিস্?

—হ্যাঁ।

কানাই ভিতরে এসে দাঁড়াল।

পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে তার দিকে চেয়ে গীতা শিউরে উঠল। যা বলবার জন্যে ডেকেছিল তা তার বলা হ'ল না। তার বদলে সে বলে উঠল—আপনার চেহারা এমন কেন হয়ে গেল কানাইদা? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কানাইয়ের এক একটি পরিবর্ত্তন তার চোখে পড়ছিল।—মাথা কামানো—গোঁফ কামানো!

—কানাইদা?

কানাই ম্লান হাসি হেসে বললে—আমাদের বাড়ীতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে গীতুভাই। এখানে বোমা পড়ে—

—মেজকর্ত্তা, মেজদিদি, বড় খোকা মারা গেছেন—শুনেছি।

কানাই বললে—বুড়ীমাও মারা গেছেন—কিন্তু তাঁর এক টুক্‌রো হাড় পর্য্যন্ত খুঁজে পাইনি।

বুড়ী মা—সুখময় চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী—মেজকর্ত্তার মা—নিকষা! নব্বই বৎসরের দৃষ্টিহীন, বধির, জীর্ণ মাংসপিণ্ড।

গীতার চোখ জলে ভরে গেল। ইলেকট্রিক আলোর দু'টি প্রতিবিম্ব ভেসে উঠল সে জলের উপরে।

কানাই বললে—ওঁদের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে দিতে গেলাম মণিকাকার কাছে। ওঁরা ছাড়া সকলেই আগে পালিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম—আমাদের ছোট খোকার ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে। তাঁরা গিয়েছিলেন কাটোয়ার কাছে একটা গ্রামে। সেখানে গেলাম, দেখলাম খোকা সেরেছে, মেজখোকা টাইফয়েডে পড়েছে।

—মেজখোকা কেমন আছে?

—ভাল হয়েছে। কিন্তু মা মারা গেছেন সাপের কামড়ে।

নীলার সর্ব্বশরীর অবশ—হিম হয়ে আসছে। কোন রকমে একটা কথাও তার গলা দিয়ে বের হচ্ছে না, মুখ ফিরিয়ে সে কানাইয়ের দিকে চাইতে পারছে না। গীতাও নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে, শুধু অজস্র ধারায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

হেসে কানাই এবার বললে—ফাল্গুনের শেষে উমার বিয়ে।

—বিয়ে?

—হ্যাঁ। মা মারা গেছেন ২৪শে মাঘ। উমার বিয়ে ২৮শে ফাল্গুন। আমি আপত্তি করেছিলাম। উমা লুকিয়ে কাঁদে। কিন্তু বাবা দেবেন। ওখানকার এক বড়লোকের ছেলে—উমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। বিনাপণে বিয়ে করবে। বাবা কথা দিয়েছেন। সুতরাং—। কানাই হাসলে।

গীতা চুপ করে রইল। নীলা তেমনি স্থির হয়ে বসে।

কানাই আবার বললে—অমলবাবুর সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই। অমল বাবুর তবু ভদ্রতার মুখোস আছে। এ ছেলেটির তাও নাই। তবে ধানচালের ব্যবসাতে এবার প্রায় দশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। আর বনেদী বড়লোক। মদ খেয়ে রেল-স্টেশনে চীৎকার করতে বাধে না। আমি উমাকে বললাম—আমার সঙ্গে চলে আয় উমা। কিন্তু উমা এল না। বললে—ছি! তারপর বললে—তোমাকে মা কি সাজা দিয়ে গেছেন—তুমি ভাব তো! মা আমাকে বলে গেছেন—যেন বাবাকে কষ্ট না দিই। জান গীতা—মা মরবার সময় বলেছিলেন—কানাই যেন আমার মুখে আগুন না দেয়, সে যেন শ্রাদ্ধ না করে। শ্রাদ্ধ আমি করিনি। তবে অশৌচের শেষ দিনে মাথা কামিয়ে স্নান করে আমি আত্মীয়-বাড়ীঘরের সকল সম্বন্ধ শেষ করে এসেছি।

নীচে কড়া নড়ছে।

কানাই বেরিয়ে গেল।

কড়া নাড়ার সঙ্গে শব্দ উঠল—মা! মাগো! দুটো ভাত দেবেন মা?

কানাই-এর মনে পড়ে গেল—পল্লী-অঞ্চলের ছবি! এই এক ছবি। পথে-পথে দোরে-দোরে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভাত! দুটো ফেনভাত দেবা মা? দুটো ফেনভাত?

মাত্র ফাল্গুন মাস। চাষীদের ঘরে এখনও ধান আছে। এরপর চাষীরাও হয়তো এমনিভাবে ঘুরে বেড়াবে। চাষীর ঘরে ধান থাকবে না। ধানের দর ষোলো—আঠারো—কুড়িতে নামছে উঠছে। ধান হুড় হুড় করে এসে জমা হচ্ছে মহাজনদের গদীতে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে শোনা একটা কথা। কথাটা বলেছিল তার ছাত্র—রায় বাহাদুর বি, মুখাজ্জির ছোট ছেলে। "আমাদের গুদোমের চাবী যদি এক হপ্তা খুঁজে না পাওয়া যায়—তবে কলকাতায়

উনোন জ্বলবে না।" রায় বাহাদুর তাকে বলেছিলেন—চালের ব্যবসা করতে।

দরজার ওপারে লোকটি সমানে চেঁচাচ্ছে—মা—মাগো! মা! মাগো! মাগো! দু'টো ভাত দাও মা!—মা! মাগো!

বিরক্তি আসে; ওই একঘেয়ে ডাকের মধ্যে মানুষকে ত্যক্ত করবার একটা প্রচ্ছন্ন ভঙ্গি আছে; ওদের চেয়ে অন্নে বস্ত্রে আশ্রয়ে সচ্ছল সম্প্রদায়ের কাছে—এর চেয়ে সবলতর দাবী জানাবার পন্থা ওরা জানে না। এক এক সময় নীলার মনে হয় ওদের ডেকে রূঢ়তম তিরস্কার করে বলে—ওরে হতভাগের দল—মৃত্যু তো তোদের অনিবার্য্য। একবার ক্ষেপে ওঠ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। তা না পারিস—তোরা লক্ষ লক্ষ মানুষ একবার চিৎকার করে বল্—নরঘাতক—তোমরা নরঘাতক—তোমরা নরঘাতক! কানাই দরজা খুলে বললে—এখন অপেক্ষা করতে হবে বাপু! ভাত না হ'লে কেমন করে পাবে বল? বস একটু।

ফুটপাথের উপর জুতোর শব্দ এগিয়ে এল। দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন—বিজয়দা।

—বিজয়দা?

—কে? কানাই? বিজয়দা সবিস্ময়ে বললেন।

কানাই? কোথায় ছিলি এতদিন?

—কানাই সিঁড়ির আলোটা জ্বাললে।

বিজয়দা তার চেহারা দেখে শিউরে উঠলেন, তবুও হেসে আপনার স্বভাব অনুযায়ী বললেন—কিরে, তুই কি তপস্যা করতে গিয়েছিলি না কি? মাথা কামিয়ে ফেলেছিস, নাকটা খাঁড়ার মত দাঁড়িয়েছে, মুখে তোর যা কখনও দেখিনি—মিষ্টি হাসি ফুটেছে—চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্যোতি বেরুতে আর দেরি নেই। ব্যাপার কি রে?

কানাই হেসেই বললে—মা মারা গেছেন বিজয়দা!

বিজয়দা একটুও অপ্রস্তুত হলেন না, কিন্তু মুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে বেদনার সঙ্গে বললেন—মারা গেছেন!

—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয়দা বললেন—আয়, ওপরে আয়।

উপরে এসে বিজয়দা গীতাকে দেখে অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন—গীতা!

গীতা ম্লান হাসি হাসলে। নীলা তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

নীলা মৃদু ক্লান্ত স্বরে সমস্ত কথা বললে। বলতে বলতে চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়ল। এটা নীলার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। বার কয়েক চোখ মুছে সে যেন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠল; শেষের অংশটা অনেকটা সহজভাবেই বললে সে।

বিজয়দা নীরবে সিগারেট টানছিলেন, একটার পর আর একটা; চেয়ে ছিলেন স্থির দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের দিকে।

গীতা চুপ করে বসে আছে।

কানাই বাইরে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে। সে চেয়ে ছিল—আকাশের দিকে! যুদ্ধকে বিশ্বব্যাপ্ত ক'রে তুলতে পেরেছে ওই এরোপ্লেন। প্রশান্ত মহাসাগরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে! আটলান্টিকের এক প্রান্তে বসে অপর প্রান্তের রণক্ষেত্রের যুদ্ধ-পরিচালনা সম্ভবপর করে তুলেছে। টনের ওজনে বোমা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে দেশ হ'তে দেশান্তরে উড়ে চলেছে। শত-সহস্র বৎসর ধ'রে মানুষের গড়ে তোলা কত সাধের—কত সাধনার বাড়ীঘর—সংস্কৃতি-কেন্দ্র ভেঙে চুরে গুঁড়ো করে দিয়ে—আগুন জেলে দিয়ে আবার ফিরে আসছে! এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ অথবা পৃথিবীর-ধ্বংসকারী বৃহত্তর যুদ্ধের ভূমিকা কি না কে জানে?

নীচে পথে পথে নারীকণ্ঠে ক্রমাগত চীৎকারধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে—

মা—মাগো ! মা—মাগো ! মা—মাগো ! মা—মাগো ! চারটি ভাত দেবা মা—মাগো ! মা—মাগো ! মা—মাগো ?

দু'চারটি বাড়ীর দোর খুলছে। নিজেদের আহার্য্যের কিছু অংশ নিয়ে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে দিয়েই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এক মুঠো ভাত—নিরন্ন দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে।

সকলের দেবার সামর্থ নাই, প্রত্যাখ্যান করবার ভাষা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না ; নিজেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী পেট পূরে খেয়েছে, তার জন্তে লজ্জার সীমা নাই। মনে মনে অপরাধবোধ মাথা হেঁট করে দিচ্ছে। কতকগুলো দরজা একেবারে বন্ধ। তবু কানাইয়ের মনে হ'ল—মানুষ মহৎ। মহত্ত্বের পবিত্রতম লোকে তার যাত্রা চলেছে ; এ যাত্রায় সে একদিন না একদিন লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুবেই। অমৃতের সন্তানদের সমাজ গড়ে উঠবে সেদিন।

বিজয়দা এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। চমৎকার মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে বাইরে। বিজয়দা হাসলেন। বললেন—মাথার উপরে বমার উড়ছে, নীচে মানুষ চেঁচাচ্ছে ভাতের জন্তে—এর মধ্যে কিন্তু বসন্ত আসতে ভোলেনি ! আজ ফাল্গুনের উনিশে।

কানাইও হাসলে। সেও অনুভব করলে—হ্যাঁ দক্ষিণ দিক থেকেই বাতাস আসছে।

বিজয়দা একটা সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ পর কানাই বললে —বিজয়দা !

—বল।

—শুনলেন গীতার কথা ?

—শুনলাম।

কানাই একটুখানি চুপ করে থেকে বললে—আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম—ভেবেছিলাম, ওকে উদ্ধার করলাম। কিন্তু—। সে চুপ করে গেল।

বিজয়দা কোন উত্তর দিলেন না।

কানাই আবার বললে—দায়িত্ব আমার বিজয়দা। গীতাকে আমি বিয়ে করে—ওকে আমি রক্ষা করতে চাই।

বিজয়দা এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না।

কানাই ডাকলে—বিজয়দা!

—শুনেছি কানাই। কিন্তু তুই একদিন আমাকে বলেছিলি—তুই ওকে বিয়ে করতে পারিস না। ওকে তো তুই ভালোবাসিস্ না!

কানাই মৃদুস্বরে বললে—না। কিন্তু চেষ্টা করব বিজয়দা। একটু থেমে আবার বললে—হয়তো ওকে ভালোবাসা সম্ভবপর হবে না। তবু সুখী করবার চেষ্টার ত্রুটি করবো না আমি।

বিজয়দা হাসলেন। তারপর বললেন—গীতাকে জিজ্ঞাসা কর্।

—সে ভার আমি আপনার ওপর দিচ্ছি।

—না। পিছনে মৃদুস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল—না।

চকিত হয়ে দু'জনেই ফিরে দেখলে—পিছনে বারান্দার দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে গীতা এবং নীলা দু'জনেই। কথা কইতে দেখে দরজা থেকে এগিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু চলে যেতেও পারেনি।

বিজয়দা বললেন—এস এগিয়ে এস, এমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

গীতা হেসে বললে—কানাইদার সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাই।

বিজয়দা বললেন—কানাই তোমাকে বিয়ে করতে চায় গীতা।

গীতা বললে—না।

বিজয়দা কোন কথা বললেন না। কানাইও কোন কথা বলতে পারলে না। নীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। গীতাই আবার বললে—না। লজ্জা আমার হবে না। আমার খেটে খাবার একটা উপায় করে দেবেন। আমার ছেলে হোক—মেয়ে হোক—তাকে আমি মানুষ করে তুলব।

বিজয়দা বললেন—হাসি ভাই—তুমি আমাকে সত্যিই খুশী করেছ।

গীতা মৃদুস্বরে বললে—কানাইদা—নীলাদি—! সে চুপ করে গেল। আর কিছু না বলে ঘরের ভিতর চলে গেল।

রাত্রি গভীর হয়েছে। বারান্দায় কানাই এখনও বসে আছে এবং বিজয়দা শুয়ে আছেন—জেগেই রয়েছেন। ঘরের মধ্যে থেকে গীতার দু'একটা মৃদুস্বরের কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে। নীলাও তা হ'লে জেগে আছে। নইলে—গীতা কথা বলছে কা'কে?

বিজয়দা উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন—বোম্বাইয়ের আগা খাঁ প্রাসাদের সংবাদের জন্য। আজ সকালে আটটার পর মহাত্মাজীর অনশন উদ্‌যাপনের কথা। বিশ দিন চলে গেছে। শেষের দিকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়ে এসেছে; তিনি জয়ী হয়েছেন—এতে সন্দেহের কিছু নেই। তবু সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠার শেষ নাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিজয়দা অকস্মাৎ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন—তুই কি করবি কানাই?

—কি করব?

হেসে বিজয়দা বললেন—ভারত উদ্ধার করবি, না—শান্তশিষ্ট হয়ে কাজ-কর্ম্ম করবি, ঘরসংসার করবি?

হেসে কানাই উত্তর দিলে—দুই-ই করব। আপনাদের কাল চলে গেছে। সন্ন্যাসী ফৌজ দিয়ে ভারত-উদ্ধার করার কল্পনা আমাদের নেই।

বিজয়দা হাসলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন—নীলাকে তুই ভালোবাসিস্ কানু?

কানাই চুপ করে রইল।

বিজয়দা বললেন—রক্তটা তুই পরীক্ষা করিয়ে নে।

—রক্ত-পরীক্ষা আমি করিয়েছি বিজয়দা। একটু থেমে সে বললে

—আমার দেহে চক্রবর্ত্তীদের পবিত্রতম রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছিলাম—ফল দেখলাম—নির্দোষ। আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম

সেই ভয়াবহ রাত্রের কথা সমস্ত বলে, সে বললে—মেজদাদু বেঁচে ছিলেন। তিনি হাসপাতালে আশীর্ব্বাদ করে আমাকে বললেন—আমার সৎকার তুমি করবে—এ ভেবেও আমি আনন্দ পাচ্ছি। শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম—আমার কি সে অধিকার আছে? আমার রক্তে চক্রবর্ত্তীদের সঞ্চয় করা বিষ নেই কেন? তিনি আমায় বললেন—তোমার মধ্যেই চক্রবর্ত্তীদের পবিত্রতম রক্তের ধারাটুকু অবশিষ্ট আছে। সুখময় চক্রবর্ত্তী যখন কর্ম্মী, চরিত্রবান্, তখন জন্মেছিলেন আমার পিতামহ। তাঁর জীবনের পবিত্রতম সময়ে—তাঁর রক্ত দেহে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন আমার বাবা, আমার যখন জন্ম হয় তখন তিনিও ছিলেন চরিত্রবান্ আদর্শনিষ্ঠ তরুণ।

বিজয়দা অনেকক্ষণ পর বললেন—আমি সবচেয়ে খুশী হয়েছি কানাই—তুই সুস্থ হয়েছিস দেখে।

কানাই বললে—হ্যাঁ, জরগ্রস্তের মত মন আমার সর্ব্বদা যেন জর্জ্জর হয়ে থাকত। সে আমিও বুঝতে পারছি বিজয়দা। সবচেয়ে আমার বড় ভাগ্য চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অভিশাপ থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। আমি মুক্ত—পৃথিবীর মানুষ আজ।

বিজয়দা উঠে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—শুয়ে পড়। খবরের জন্যে আমি জেগে রইলাম।

—ঘুম আসছে না বিজয়দা।

ঘরের দিকে তাকিয়ে বিজয়দা বললেন—যাক্ এরা এইবার ঘুমিয়েছে যেন। আর কথা শোনা যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে গীতা উত্তর দিলে—না বিজয়দা,

আমরাও জেগে আছি। গীতা দরজা খুলে বাইরে এল। বললে—নীলাদির সঙ্গে গল্প করে সুখ পেলাম না। একটা কথাও বলেননি। চুপ করে আপনাদের কথা শুনছিলাম।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটে বাজল।

—চারটে।

আধঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কলকাতার পথে পথে খবরের কাগজের হকারেরা ছুটে চলবে। সাইকেলে—পায়ে হেঁটে শহরময় সংবাদ পরিবেষণ করে বেড়াবে। সে কি সংবাদ? সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ শেষ রাত্রি। পূর্ব্ব আকাশে শুকতারা ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে জ্বলছে। ঘরের মধ্যে ঘড়িটা চলছে টক্‌টক্‌ করে।

সহসা নীচের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে সজোরে কড়া নাড়ছে অধীর আগ্রহে।

—বিজয়দা! বিজয়দা!

—কে?

—আমি।

—কে নেপী?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজ এনেছি।

নীলা এবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

—নেপী?

—মহাত্মাজী অনশন ভেঙেছেন। ভাল আছেন।

"পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে; বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মির মত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহা-সমারোহ ঘটে গেল। সত্য হ'ল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা

তাকে দাহন করে নাই, সে শিখা তার দীপ্তিতে জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে। সেই দীপ্তি-প্রভায় কৌটিল্য-ছলনা আজ নগ্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে; স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ-শতাব্দীর কৌটিল্য-ছলনা তাতে অবশ্য লজ্জিত হবার নয়। উগ্রতায় অতিমাত্রায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তা হোক। সত্য তাতে শঙ্কিত নয়। ভয় মিথ্যা, মিথ্যার বিলুপ্তিতেই সত্যের প্রকাশ; ভয়কে সে জয় করেছে চিরদিনের মত। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা—তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতের সত্যধর্মের প্রতীক তুমি।

"মহা দুর্যোগে পৃথিবী আজ আচ্ছন্ন। দুর্যোগের অবসানে সত্যসূর্যের আলোকে আলোকিত দিনের প্রত্যাশা করে রয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মানুষের সমাজে মহা-মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে ওই পুণ্যফল আমাদের সর্বোত্তম ভরসা। আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ঐ পুণ্যে।"

বিজয়দা লিখে যাচ্ছিলেন—

"সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ যুদ্ধ করে এসেছে ব্যক্তিগত যুদ্ধ; গোষ্ঠীগত, জ্ঞাতিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত থেকে আজ যুদ্ধ হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ। হত্যাকাণ্ডের অতি নিষ্ঠুর নৃশংসতা চলেছে বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরলোকেও চলেছে নিষ্ঠুরতম দ্বন্দ্ব। জৈব প্রবৃত্তির সঙ্গে মানবচেতনার সংগ্রাম। ক্ষুদ্র আমির সঙ্গে মহত্তর আমির সংঘর্ষ। কিন্তু আজও মানুষ কোনমতেই জয় করতে পারেনি তার ক্ষুদ্র আমিকে—জৈবপ্রবৃত্তিকে—স্বার্থবুদ্ধিকে। তাকে সে বারবার পদানত করে নতুন থেকে নবতর আদর্শের সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তির স্বার্থবুদ্ধি সরীসৃপের মত সে আদর্শের মধ্যে বৈষম্যের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে। তাকে কীটগ্রস্ত ফলের মত অন্তঃসারশূন্য নিষ্ফলতায় পরিণত করেছে। শুধু নিষ্ফলতাই যে তাকে করে তুলেছে বিষগ্রস্ত;

যার ফলে এক যুদ্ধের সমাপ্তি রচনা করেছে—পরবর্ত্তী যুদ্ধের ভূমিকা।"

সকাল হয়ে আসছে। পূবের আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

গীতা চা করতে ব্যস্ত।

কানাই প্রশ্ন করলে—কাল রাত্রে কোথায় ছিলে নেপী ?

নেপী এতক্ষণে নীচে থেকে বের করে নিয়ে এল একটা পিচবোর্ডের টুকরো, একটা তুলি—একটা কালির টিন। পিচবোর্ডটার ভিতরে কেটে কেটে কিছু লেখা আছে। ওটা রেখে কালির তুলি বুলিয়ে দিলেই লেখা হয়ে যায়। নেপী বললে—দেওয়ালে সারারাত্রি লিখেছি।

বিজয়দা মুখ তুলে একটু হাসলেন। তাঁর লেখা তখনও শেষ হয় নাই। তিনি আবার লিখে চললেন—"প্রতি যুদ্ধের মধ্যেই মানুষ তবু কামনা করে মানুষের মুক্তি; তার জন্তেই দেয় আত্মাহুতি; দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করে সকল দুঃখ; মহারণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মধ্যেও তারা ওই আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, যুদ্ধের সমাপ্তিতে আসবে মুক্তি—সকল অন্যায়ের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি, সকল বৈষম্য থেকে মুক্তি। এই মুক্তির কল্যাণেই দেহবন্ধনের মধ্যে মানবাত্মা লাভ করবে পরম বিকাশের মহাসার্থকতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ওই আশ্বাসে প্রাণ দিয়েছিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, যুদ্ধের পরে ওই আশ্বাসেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নারী-বৈধব্যের দুঃখ মাথা পেতে নিয়েছিল। ভেবেছিল পাপের বিনাশ হ'ল, অধর্ম্মের উচ্ছেদ হল; প্রতিষ্ঠিত হ'ল ধর্ম্ম; গীতা সার্থক হ'ল।

"কিন্তু তা হয়নি। কারণ কুরুক্ষেত্রের নরমেধের চরু জনগণের করতল-গত হয়নি। পুরোধা পঞ্চপাণ্ডব সে চরু গ্রহণ করলেন তৎকালীন বিধান-অনুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে। তাই মানুষের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা হ'ল পাণ্ডবের। যার জন্য অশ্বমেধে আবার হ'ল বৈষম্যের সৃষ্টি। মানুষের মুক্তি হ'ল না।

"গত মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠিত হ'ল, অস্ত্রত্যাগের

সংকল্প হ'ল: কিন্তু মানুষের মুক্তি হ'ল না; সমাপ্তির পূর্ব্বেই যুদ্ধে পড়ল ছেদ। তাই আজ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ। প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছি, এবার হবে যুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তি। আবার যেন অর্দ্ধপথে যুদ্ধের ছেদ না পড়ে। যদি পড়ে তবে সে হবে আবার নবযুদ্ধের ভূমিকা। চলুক যুদ্ধ সমাপ্তি পর্য্যন্ত। দুঃখকষ্ট আরও কঠিন হোক, কঠোর হোক, মানুষ তা সহ্য করবে। আমার মৃত্যু হয় হোক। দুর্য্যোগের মধ্যে মানুষই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমি বেঁচে থাকি আমি আত্মনিয়োগ করব সেই কাজে। বেঁচে থাকব মানুষের মুক্তি-প্রত্যাশায়।

"মহাযজ্ঞ আবার হবে। যজ্ঞশেষে উঠবে মানুষের মুক্তি-চরু। বিশ্বযুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তিতে আসবে নববিধান।

"সে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে যে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র তাতে কেউ আনবে বৈষম্যমুক্ত সমাজ রচনার সূত্র, কেউ আনবে জড়-বিজ্ঞানের মহাজ্ঞান, বিশ্বরূপের পরিচয়-কথা—কতজন আনবে কত বাণী! ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী—হে মহাত্মা, যা মূর্ত্ত হয়েছে তোমার মধ্যে সেই চিরন্তনরূপে নবকালের পটভূমিকায়, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পসঙ্গীতের সুরমাধুর্য্যে। অন্তরলোকের বিজ্ঞান: জীবনের প্রতি প্রেম, জীবকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি, মিথ্যার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা। চিরন্তন ভারতের বাণী বিশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত হবে। অমৃতময় মানব-সমাজ রচনা সার্থক হবে।"

নেপী পিচবোর্ডের উপর তুলি বুলিয়ে ঘরের দেওয়ালেই "নিরন্নকে অন্ন দাও" এঁকে লিখে চলেছে। নীলা হাসলে। কানাইও হাসলে।

এই আনন্দের মধ্যে নীলা কখন ভুলে গেছে সকল সঙ্কোচ, সমস্ত অপরাধের গ্লানি; সে অসঙ্কোচে কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে,

সঙ্গে সঙ্গে চোখে তার জলও এল, তাও সে গোপন করলে না। কানাইও হাসিমুখে এগিয়ে কাছে এসে নীলার হাতখানি টেনে নিলে নিজের মুঠোর মধ্যে—এক মুহূর্ত্তে যেন সকল বোমাপেড়া তাদের হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বললে—কমরেড! নীলা আবার হাসলে। হাত টেনে নিলে না। হাতে হাত রেখেই তারা দাঁড়িয়ে রইল।

আকাশের দূর প্রান্তে প্লেনের শব্দ উঠছে। মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই ঠিক মাথার উপর দিয়ে ভীষণ কঠিন কর্কশ গর্জ্জন তুলে উড়ে গেল একসঙ্গে দশখানা প্লেন। সকলে চাইলে আকাশের দিকে।

নীচে পথের উপর থেকে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে ডাক উঠল—ভাত দাও মা চারডি, বাসি ভাত!

নীলা এবং কানাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এ মন্বন্তর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাসাটা তাদের কাছে অপরাধ বলে মনে হ'ল।

বিজয়দা লেখা সমাপ্ত ক'রে বললেন—কানাই ভাই, এইবার কাজে নেমে পড়। নীলা ভাই, কম্‌রেডের সঙ্গে তুমিও লেগে পড়।

কানাই বললে—মন্বন্তরের প্রথমেই আমি মুক্তি পেয়েছি! কাজ করবার জন্যেই তো এসেছি। বল কি করতে হবে।

বিজয়দা তার দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে বললেন—তোর শরীরটা বড় দুর্ব্বল কিন্তু।

কানাই হাসলে—শরীরের দুর্ব্বলতা আমার মন পূরণ করবে বিজয়দা। তা ছাড়া আমি তো একা নই। কম্‌রেড থাকবে আমার সঙ্গে।

নীলা এবার বললে—বলুন কি করব? কাজ বলে দিন।

—কাজ অনেক। মানুষকে এ মন্বন্তরের দুর্যোগ পার ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

বিজয়দা আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিলেন। দিনের আলো জেগে উঠেছে। আরক্ত আলোকছটা। মুহূর্ত্তের জন্য নীলার কানাইয়ের মনে

াত যেন সকল দিনের প্রভাত থেকে ভিন্ন।
বলেন সূর্য্যোদয়কে—ভারতের সত্যব্রতের জয়ের
কামনা বলেন—সূচনা করে—নূতন কালের—